"মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া"

একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা

মাওলানা সাইফুল্লাহ খালেদ

“মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া”

একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা

মাওলানা সাইফুল্লাহ খালেদ
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ
পরিচালক, জাবালে নূর ফাউন্ডেশন, তেজগাঁও, ঢাকা
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল কারীম আলইসলামিয়া
ওয়ারলেস, মগবাজার, ঢাকা

আল হিকমাহ
ওয়ারলেস, মগবাজার, ঢাকা

❑ "মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া"
একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা
❑ মাওলানা সাইফুল্লাহ খালেদ
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ
পরিচালক, জাবালে নূর ফাউন্ডেশন, তেজগাঁও, ঢাকা
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল কারীম আলইসলামিয়া ওয়ারলেস,
মগবাজার, ঢাকা
❑ প্রকাশক: আজিজুল বারী কাউসার
আল হিকমাহ, ওয়ারলেস, মগবাজার, ঢাকা
❑ প্রথম প্রকাশ: শাবান ১৪৩৮ হি. মে ২০১৭ ঈ.

❑ মূল্য : ৪০০ (চারশত টাকা মাত্র)

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

‘সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া’ নামে এক লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত একটি লেখা তৈরি হয়েছে আজ এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এক লক্ষ স্বাক্ষরের মাধ্যমে মূলত ইসলামের একটি অকাট্য ও সর্বস্বীকৃত রুকনের উপর এক লক্ষ কুঠারাঘাত করা হয়েছে। **কোন জাতি সম্মিলিতভাবে নিজের পায়ে এভাবে কুঠারাঘাত করেছে এমন নজির সৃষ্টি করতে পৃথিবী ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে পারবে বলেও কোন সম্ভাবনা নেই।**

এ ফতওয়া প্রকাশিত হয়ে তার বিষফল পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে চলেছে। দেশী ও আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির পক্ষ থেকে তার প্রচার চলছে। বিশ্ব শয়তানী শক্তির স্বাক্ষর ও সাধুবাদ নিয়ে এ লেখা ও অপকর্মটি পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করে চলেছে। দেশের সাধারণ মুসলমান, সাধারণ তালিবুল ইলম ও সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী সে অপকর্মের শিকার হয়ে তাদের দ্বীন ও ঈমানকে হারাতে বসেছে। একদল অন্ধ মানুষ তার পিছনে ছুটে চলেছে।

কিন্তু দ্বীনের কর্ণধার হওয়ার দাবিদারগণের সর্বোচ্চ আসনে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাদের অনেকে আজও তার খবরও পাননি। দ্বিতীয় সিঁড়ির কর্ণধারগণ দু’চার দিন আগে খবর পেয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তৃতীয় সিঁড়ির কর্ণধারগণ খবর পেয়েছেন, তবে বিষয়টিকে একটি কলাগাছের সঙ্গে তুলনা করে ক্ষান্ত হয়েছেন, যা এমনি এমনি শেষ হয়ে যাবে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্ণধারগণ গবেষণার টেবিলে বসা আছেন, ভাবছেন কি করা যায়। এরই মধ্যে একটি বছর পার হয়ে গেছে। পঞ্চম শ্রেণীর কর্ণধারগণ হেকমতপূর্ণ ভাষার গাঁথুনী তৈরি করে চলেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর কর্ণধারগণ শতভাগ নির্ভুল কথা বলার জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে চলেছেন। এভাবে আরো কতো শ্রেণীর গবেষক কতো প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন তার কোন শেষ নেই।

এমতাবস্থায় কোন শ্রেণীতেই পড়েন না এমন কিছু লোক বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। কাঁচা পাকা কিছু একটা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। মুসলমানদের ঈমান বাঁচানোর তাগিদে যতটুকু না করলেই নয়, ততটুকু করে তা উপস্থাপন করেছেন। এ আশা নিয়ে যে, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এবার যদি এর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করেন। কমপক্ষে এ বিশ্লেষণের ভুল ধরার তাগিদেও যদি কলমটা একটু হাতে নেন। অন্যায়ের ভুল না ধরে কমপক্ষে ভুল ধরার ভুল ধরতে গিয়েও যদি একটু নড়ে চড়ে বসেন তবু আশা করি জাতি উপকৃত হবে।

লেখাটির মুদ্রিত কপির উপর টীকা নম্বর বসিয়ে টীকানম্বরসহ মূল লেখার ফটোকপি শেষে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যাতে খেয়ানতের কোন অভিযোগ না আসে। এছাড়া পাঠক মূল কপিটি দেখলেই সঠিক অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করছি। যুক্তির দাবি অনুযায়ী এক লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত লেখাটি এ বইয়ের শুরুতেই দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু আত্মমর্যাবোধের সামান্য একটু লাজ আছে বলে তা পারিনি। এমনিভাবে লেখাটিকে টীকার উপরে স্থান দিতেও মন সায় দেয়নি। আবার মূল কপি উল্লেখ না করেও হচ্ছে না। তাই টীকা লেখা হয়েছে আগে আর মূল লেখাটি উল্লেখ করা হয়েছে পরে। পাঠক একটু কষ্ট করে মূল লেখাটি দেখে সে অনুযায়ী টীকাগুলো দেখবেন। বাড়তি কষ্ট দিলাম, ক্ষমা করবেন।

আর এ কাজটি করতে এক বছর অপেক্ষা করে যে অন্যায় করেছি তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

-প্রকাশক

নিবেদন

এ ভূমিকায় আমার নিজের পক্ষ থেকে বলার মত কিছু নেই। কাউকে নসীহত করব, কারো কাছে কোন আবদার করব, কোন হুকুম করব, বা ধমক দেব কোন কিছুই করার মত মনের শক্তি নেই। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন নিথর হয়ে যাই। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। কি হওয়ার ছিল, কি হল? কাদের কাছে কি পাওয়ার ছিল, কি পেলাম? যাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, দেখাতাম– তাদেরকে আজ ভুলে যেতে খুব ইচ্ছা করছে। আজ আমার নিজস্ব কোন আবেদন নিবেদন নেই। সবার সকল বিপদ আপদে সব সময় যিনি একমাত্র ভরসা তাঁর কালামে পাক থেকে একটি অংশ এখানে তুলে ধরতে চাই। তাঁর চাইতে সুন্দর করে আমরা বলতে পারব না। তুলে ধরতে চাই আমার জন্য, সবার জন্য। কুরআনের এ অংশটুকু আমি অনুবাদসহ উল্লেখ করব। পাঠক যেন তা পড়েন, ভেবে ভেবে বার বার পড়েন। এটাই আমার নিবেদন। এটাই আমার আকুতি। আমার ফরিয়াদ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে খুব মুহাব্বত ও ভালোবাসার সাথে সম্বোধন করে বলেন-

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (١٠٧)

আর শত্রু সম্প্রদায় অনুসন্ধানে তোমরা দুর্বল হয়ো না। তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাদেরও তো তোমাদের মতই কষ্ট হচ্ছে। আর তোমরা

আল্লাহর নিকট থেকে এমন জিনিষের আশা কর যার আশা তারা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১০৪) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহকারে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যেভাবে আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। **আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।** (১০৫) এবং তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১০৬) **আর যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনও খিয়ানতকারী পাপিষ্ঠকে পসন্দ করেন না।** (১০৭)

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٩)

তারা মানুষ থেকে তো লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা করে না, অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন বিষয়ের পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। (১০৮) হে, তোমরাই তো তারা, যারা দুনিয়ার জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করেছ। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে কে বিতর্ক করবে? কিংবা কে হবে তাদের তত্ত্বাবধায়ক? (১০৯)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (١١٢) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣)

যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে ফেলে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করে বসে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১০) যে ব্যক্তি কোন গুনাহ কামায়, সেতো তা দ্বারা নিজেরই শুধু ক্ষতি সাধন করে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১১১) আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা

আরোপ করে, তাহলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করল। (১১২) তোমার উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হত তবে তাদের মধ্য থেকে একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল! পকৃতপক্ষে তারা নিজদের ছাড়া কাউকে পথভ্রষ্ট করে না এবং তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (১১৩)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোন কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সদাকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব। (১১৪) যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যে পথ সে অবলম্বন করেছে, এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। (১১৫)

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (١٢١).

নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে তবে এর নিচের যেকোন গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল। (১১৬) আল্লাহ ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কেবল কতিপয় নারী। আর তারা যাকে ডাকে সেতো অবাধ্য শয়তান ছাড়া কেউ নয়- (১১৭) যার প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং সে আল্লাহকে বলেছিল, 'অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) নিয়ে নেব'। (১১৮) আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে'। আর যে অল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, সে তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (১১৯) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়। (১২০) এদের সকলেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে পালাবার জায়গা পাবে না। (১২১)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٢٢) سورة النساء.

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? (১২২) -সূরা নিসা ১০৪-১২২

-সাইফুল্লাহ খালেদ

এক লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত ফতওয়া ও তার উপর কৃত টীকাসমূহ

اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة

১.'ইসলাম শান্তিবাদী'

এর অর্থ কী? ইসলাম গ্রহণকারীকে ইসলাম শান্তি দেবে নাকি যে ইসলামকে অস্বীকার করবে তাকেও শান্তি দেবে? এ শান্তি আল্লাহর বন্ধুদের জন্য নাকি আল্লাহর শত্রুদের জন্য? কুরআন কী বলে দেখা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। অতএব তোমরা যদি পদস্খলিত হও, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। -সূরা বাকারা ২০৮-২০৯

ইসলাম ছাড়া বাকি সকল পথ যদি প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার কী ব্যবস্থা? দলিল-প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও যারা তা গ্রহণ করেনি তাদের জন্য তো আল্লাহ তাআলা তাঁর পরাক্রমশালী গুণটি ব্যবহার করেছেন। সারা পৃথিবীর জন্য ইসলাম শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। সে বার্তা গ্রহণ না করেও কি শান্তির অধিকারী হওয়া যাবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সাতাশটি যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ, অসংখ্য যুদ্ধের কাফেলা প্রেরণ, খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে শত শত যুদ্ধের কাফেলা প্রেরণ এবং সারা পৃথিবীর দিগন্তে দিগন্তে ইসলামকে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যে হাজার হাজার কাফেরদের হত্যা করতে হয়েছে, আরো হাজার হাজারকে ক্রিতদাস বানাতে হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ কাফেরকে কর দিয়ে হীনতার সাথে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে -এগুলো কি শান্তির পরিপন্থী কোন বিষয়? না শান্তির জন্য এ বিষয়গুলো অনিবার্য ছিল? বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহলে শান্তিবাদী বলে আমরা কী বোঝাতে চাই? ইসলাম শান্তিবাদী হওয়ার সাথে জিহাদের কাফেলাগুলোর বৈপরীত্ব কোথায়? জিহাদের কর্মকাণ্ডের বৈপরীত্ব কোথায়?

যদি বৈপরীত্ব না থাকে তাহলে প্রচলিত জিহাদী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে ইসলাম শান্তিবাদী বলার উদ্দেশ্য কী?

জিহাদের কর্মকাণ্ডে ভুল থাকলে শরীয়তের আলোকে সে ভুলগুলো চিহ্নিত করা হবে, শুধরানোর চেষ্টা হবে, শুধরানো না গেলে কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেরা সহীহ তরীকায় জিহাদ শুরু করবে। বড় জিহাদের বাহানায় জিহাদকে অস্বীকার করা, কুফরী শক্তির সহায়তা নিয়ে মুসলমানদের জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া, কুফরী শক্তির বাহিনী মারা গেলে তাকে শহীদ বলা এবং ইসলামের নামে মারা গেলে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া -এগুলোর সঙ্গে ইসলাম শান্তিবাদী ধর্ম হওয়ার কী সম্পর্ক? জিহাদের কর্মকাণ্ডকে ভুল প্রমাণ করার জন্য ইসলাম শান্তিবাদী ধর্ম এ প্রসঙ্গ নিয়ে আসা মানে তো লক্ষণ খারাপ। মনে হয় এর দ্বারা জিহাদ ও শান্তিবাদী বিপরীত বিষয় এ কথা সারা বিশ্বের মানুষের মনে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা চলছে।

২. 'উদার'

এর কোন সীমারেখা আছে কী না? এর একটি সীমারেখা পৃথিবী দিয়েছে, আরেকটি সীমারেখা ইসলাম দিয়েছে। এখানে আমরা ইসলামকে উদারতার কোন সীমারেখায় আটকাবো? পৃথিবীতো বলছে, এ দেশ, এ পৃথিবী

উদারনীতিতে বিশ্বাসী। অতএব দূর্গাপূজায় হিন্দু মুসলমান সবার অংশগ্রহণ করা চাই। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে গালি দিলে তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়া চাই। ধর্মের বিরুদ্ধে যেকোন কথা বলার উদারতা চাই। এসব শুনেও একজন মুসলমান মনে কোন কষ্ট না পাওয়ার মত প্রসস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া চাই। যে কোন দোয়ার জন্য শুধু মসজিদে দোয়া করানোর সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে গির্জা, মন্দির সব জায়গায় দোয়া করানোর মত মানসিক উদারতা চাই। যৌনাচারে মানুষ-কুকুর-ঘোড়া এসব ভেদাভেদ তুলে যাওয়া চাই। সব নারী সব পুরুষের যৌনসঙ্গী হওয়ার অধিকার থাকা চাই। বৈবাহিক বন্ধনের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসা চাই। উদারভাবে সবাই সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া চাই। এ হচ্ছে এক উদারতা।

অপরদিকে ইসলামে উদারতার যে সীমারেখা আমরা পাই তা হচ্ছে-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শির্ক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে"। -সূরা লোকমান ১৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা

তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না''। -সূরা তাওবা ২৩-২৪

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

"আর বড় হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও"। -সূরা তাওবা ৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়"। -সূরা তাওবা ২৮

এছাড়া প্রত্যেকটি অঙ্গনে উদারতার সীমারেখা শরীয়ত বাতলে দিয়েছে। একজন মানুষ যদি ইসলামের সত্যতাকে স্বীকার করে মুসলমান দাবি করে থাকে তাহলে এ সীমারেখা তাকে অবশ্যই শরীয়ত থেকেই নিতে হবে। পৃথিবীর মানবতা ধ্বংসকারী সংগঠন মানবাধিকার ব্যুরো থেকে নেয়া যাবে না। যারা ইসলামকে মানবতাবিরোধী মনে করে তাদের কাছ থেকে উদারতার সবক নেয়া যাবে না। আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে উদারতা দেখিয়ে আল্লাহর

সঙ্গে ভালোবাসার দাবি করা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য অবিষ্কার!

৩.'সহিষ্ণু'

কার প্রতি কখন? একজন মুসলমানের ব্যক্তিস্বার্থ্যের উপর আঘাত আসলে ধৈর্য্য ধরবে এ শিক্ষাই ইসলামে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর মনোনীত ধর্মের উপর যদি আঘাত আসে তাহলে আঘাতকারীর প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের কোন পদ্ধতি শেখানো হয়েছে? আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি"। -সূরা আহযাব ৫৭

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

"যদি মুনাফিকরা, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা এবং শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে ক্ষমতাবান করে দেব। অতঃপর তারা সেখানে তোমার সাথে অল্প সময়ই অবস্থান করতে পারবে- অভিশপ্ত অবস্থায়। অতঃপর তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। ইতঃপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না"।

-সূরা আহযাব ৬০-৬২

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

"তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও

কর এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। এবং তাদের কাউকে অভিভাবকরূপে এবং সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করো না"। -সূরা নিসা ৮৯

এগুলো কি সহিষ্ণুতা পরিপন্থী কোন হুকুম? তাহলে এখন যে সহিষ্ণুতার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তা কোন কাফেরের প্রতি না মুসলমানের প্রতি? যদি কুরআনের অনুসরণ করতে চাই তাহলে কুরআনে স্পষ্ট বলে দিয়েছে কার প্রতি সহিষ্ণুতা হবে, আর কার সাথে কঠোরতা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যে পরিচয় আল্লাহ তাআলা কুরআনে দিয়েছেন আমরা কি সে মাপকাঠির সহিষ্ণুতাই প্রদর্শন করব না নিজেরা কোন একটা তৈরি করব। আল্লাহ তাআলা বলছেন-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে ও ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত। একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন"। -সূরা ফাতহ ২৯

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান"। -সূরা তাওবা ৭৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"। -সূরা তাওবা ১২৩

সব সহিষ্ণুতা কাফেরদের জন্য বা মুরতাদদের জন্য বরাদ্দ হয়ে গেল কেন? আল্লাহর পথে যারা জিহাদ করে চলেছে তাদের ভাগে এ সহিষ্ণুতার কিছুমাত্রও আসলো না কেন? কী বুঝা যায়, এক লক্ষ মুফতী (?) তাদের ফতোয়ার মাধ্যমে কি এ আয়াতগুলো বাস্তবায়েনের পথই সুগম করছেন? মুজাহিদদের উপর আপত্তি তারা এ আয়াতগুলো অপব্যাখ্যা করছে, বিকৃত করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কী? নতুন কোন ব্যাখ্যা না কি তাফসীরের কিতাবাদিতে যে ব্যাখ্যা আছে সেটাই? একটু কিতাবের পাতা উল্টে দেখার আবদার রইল।

৪. 'অসাম্প্রদায়িক'

অবশ্যই ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। এ ধর্মে গোষ্ঠীগত কোন ভেদাভেদ নেই। অর্থাৎ আউস-খাযরাজের ব্যবধান নেই, চৌধুরী-পাটোয়ারীর ব্যবধান নেই, আরব-অনারবের কোন ব্যবধান নেই, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর কোন ব্যবধান নেই, ভাষার জন্য লড়াই নেই, গোষ্ঠীর জন্য লড়াই নেই, জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসকে ইসলাম পদতলে মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ যারা এ সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসগুলোকেই লালন করছে তাদের পক্ষ নিয়ে 'আমরা মুসলিম জাতি' এ পরিচয় না দিয়ে আমারা বাঙ্গালী জাতি পরিচয় দিতে বেশি গর্ব অনুভব হচ্ছে। **যেন এক লক্ষ বলতে চান**, জাতীয়তাবাদের জন্য লড়াই সাম্প্রদায়িকতা নয়, ভাষার জন্য লড়াই সাম্প্রদায়িকতা নয়, বাঙ্গালী জাতির জন্য লড়াই সাম্প্রদায়িকতা নয়, চৌধুরী-পাটোয়ারীর লড়াই সাম্প্রদায়িকতা নয়, আউস-খাযরাজের লড়াই সাম্প্রদয়িকতার লড়াই নয়। **ধর্মের জন্য লড়াই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার লড়াই।**

এক লক্ষের কাছে আজ প্রশ্ন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরাম যে লড়াই করে গেছেন তা ধর্মের জন্য লড়াই ছিল, নাকি আরব-অনারবের লড়াই ছিল? একজন মুসলমান হিসাবে আপনাদের কী বিশ্বাস? যদি তাঁদের সেসব লড়াই ধর্মের জন্য হয়ে থাকে তাহলে আজ ধর্মের জন্য লড়াই কেন সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল, আর আরব-অনারবের যুদ্ধ ও বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর যুদ্ধ কেন অধিকার আদায়ের পবিত্র যুদ্ধ হয়ে গেল? আল্লাহ-আল্লাহর রাসূল বিভক্তির সীমারেখা দিয়েছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে। আজ আপনারা কেন বিভক্তির সীমারেখা দিচ্ছেন সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে? ইসলামের সোনালী যুগে ধর্মের ভিত্তিতে অর্ধ পৃথিবীকে এক ছাউনীতে আনা হয়েছিল? নাকি জাতি সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে অর্ধ পৃথিবীকে হাজার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল? একটু ইনসাফ করুন! ইসলামটাকে আবার পড়ুন। একজন মুমিন হিসাবে ধোঁকা খাওয়ারও কোন সুযোগ নেই, ধোঁকা দেয়ারও কোন সুযোগ নেই।

৫. 'ভারসাম্যপূর্ণ'

শব্দটি যদি 'ইতিদাল' ও 'মুতাদিল' শব্দের অনুবাদ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর কোন ধর্মই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। আর ধর্ম যদি ভারসাম্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা ধর্মই নয়। কারণ ধর্ম হয় আল্লাহ প্রদত্ত, যিনি ইনসাফের উৎস। যে ধর্ম আল্লাহ দেননি তা কোন ধর্ম নয়। আল্লাহর দেয়া ধর্মের মধ্যে যারা হেরফের করে ফেলেছে সেগুলোও কোন ধর্ম নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে ধর্ম বলে স্বীকৃতিই দেননি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর

বিদ্বেষবশত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, (তার স্বরণ রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত''।- সূরা আলে ইমরান ১৯
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে''। -সূরা আলে ইমরান ৮৫

অতএব এ পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত কোন ধর্মই ধর্মের মর্যাদা পাবে না। আর এ কারণেই সকল ধর্ম ছেড়ে সকল মানুষকে ইসলামের ছায়াতলেই আসতে হবে। আসতে না চাইলে কমপক্ষে তার আধিপত্য মেনে নিতে হবে। রিবয়ী ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু রুস্তমকে এ কথাই বলেছিলেন-

قال: الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسَلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، **ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.**

قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا! قال: نعم، كم أحب إليكم؟ أيوما أو يومين؟

قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا وأراد مقاربته ومدافعته، فقال: إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمل به أئتمنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا، ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاثا، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل. (تاريخ الطبري ٣\٥٢٠ دار المعارف بمصر)

-দেখুন তারীখে তাবারী ও আলবিদায়া ওয়াননিহায়াসহ তারীখের যে কোন কিতাব

সাহাবায়ে কেরাম এ মূলনীতির উপরই অর্ধ পৃথিবী জয় করেছিলেন। তাই এ কথাই সত্য যে, ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম।

কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ যদি হয় ধর্মে ধর্মে কম্প্রোমাইজ বা যৌথ মহড়া, তাহলে এ ভারসাম্য ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারসাম্য অর্থ যদি হয়, ইসলামের উপর এমনভাবে চলা যার দ্বারা পৃথিবীর কোন ধর্মের অনুসারীরা মনে কষ্ট পাবে না, তাহলে এ ভারসাম্যকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ভারসাম্যের জন্য আজকের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পক্ষ থেকে নতুন করে প্রস্তাব দেয়ার কী প্রয়োজন? এ প্রস্তাব তো মক্কার মুশরিকরাই দিয়েছিল এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তা স্পষ্ট করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল ।

ইসলামের অনুসারী হওয়ার জন্য শুধু আল্লাহর উপর বিশ্বাস যথেষ্ট নয়; বরং অন্য সকল শয়তানী বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ বলছেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ** وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। -সূরা বাকারা ২৫৬

মক্কার মুশরিকরা প্রস্তাব দিয়েছিল, আপনি এক বছর আমাদের মূর্তির ইবাদত করুন, তাহলে আমরা এক বছর আপনার ধর্ম মেনে চলব। মোটামুটি সবার ধর্ম সবাই কিছু কিছু মেনে ধর্মের বিষয়ে নিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র গঠন করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। আপনারাও আমাদের দুর্গাপূজায় আসবেন, আমরাও আপনাদের ঈদুল আযহায় অংশগ্রহণ করব। আল্লাহ তাআলা সূরা নাযিল করে দিয়েছেন। ধর্ম আর অধর্ম কখনো যৌথ অবস্থানে আসতে পারে না-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

"বল, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না। এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন"। -সূরা কাফিরূন ১-৬

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরআনের সে ঘোষণাকে তার বিপরীতে ব্যবহারের অপচেষ্টা চলছে। এ সূরা দিয়েই আজ শত ধর্ম-অধর্মের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা চলছে। আলেমও তা করছে জাহেলও তা করছে। ইসলামের দাবিদাররাও করছে কুফরী শক্তিও করছে। তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুফর ও শিরকের যৌথ মহড়া হতেই পারে না -এ বিষয়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা এ বিষয়েও একমত যে, শিরক ও কুফরী ধর্মের উপর চলতে দেয়ার এ হুকুমও জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ-রহিত হয়ে গেছে। এক লক্ষ মুফতী সাহেব যে সকল তাফসীরের কিতাব পড়েছেন সেসব কিতাবেই এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সজাগ মানুষকে ঘুম থেকে জাগানো তো বড় কঠিন ব্যাপার!

৬. 'নবীজী সারা আলমের প্রতিটি বস্তুর জন্য রহমত ও করুণার আধার'

নবীজী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ রহমতগুণ ও করুণাগুণের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে করেছিলেন? এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী ছিল? বিষয়টিকে ধোঁয়াটে না করে এবং কোন প্রকার ধুম্রজাল সৃষ্টি না করে একদম খোলামেলা কথা হওয়া দরকার। এ রহমত ও করুণার আধারের নির্দেশনায়, নেতৃত্বে এবং তাঁর হাতেই যখন হাজার হাজার আল্লাহর দুশমন ইহুদী-খৃস্টান-মুশরিককে হত্যা করা হয়েছে, অপরাধীদের দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, মুরতাদদেরকে হত্যা করা হয়েছে, কাবার গিলাফ আঁকড়ে ধরা ব্যক্তিকেও হত্যা করা হয়েছে, নবীকে যে গালি দিয়েছে তাকে হত্যা করা হয়েছে, সবার সামনে জীবন্ত মানুষকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। এ

বিষয়গুলো সত্য ইতিহাস। এখন দ্বীনের একজন যিম্মাদার আল্লাহর নবীকে রহমতের নবী বলে এ সত্যগুলোকে অস্বীকার করবে? না কি এ সত্য ইতিহাসের কারণে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) নবীকে রহমতের নবী মনে করবে না? না কি রহমতের দাবিতেই নবীকে এ কাজগুলো করতে হয়েছে -এ কথা বিশ্বাস করবে?

বলার অপেক্ষা রাখে না, নবীর চাইতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেক বেশি দয়ালু, মাখলুকের দয়ার সঙ্গে যার কোন তুলনা চলে না। তিনি নিজে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দয়া ও মায়াইতো সবচাইতে বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু সে দয়াবান আল্লাহ যখন রহমতের নবীকে অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে আদেশ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান"। -সূরা তাওবা ৭৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"। -সূরা তাওবা ১২৩

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ **وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا** إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

"এটা এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দেখা দেয় **এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায়** এবং শত্রুদেরকে তারা যে ক্ষতিসাধন করে, তার বিনিময়ে

তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না"। -সূরা তাওবা ১২০

তখন এর বিপরীতে তাদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনের কী অধিকার নবীর জন্য থাকতে পারে? আর কী অধিকার উম্মতের জন্য থাকতে পারে? যদি বিষয়টি এমন হয় এবং বিষয়টি এমনই যে, এ কুফরী শক্তির সঙ্গে যদি কঠিন আচরণ করা হয় তাহলেই সারা আলম শান্তি পাবে, তবেই তো রহমতের নবী রহমতের নবী হিসাবে প্রমাণিত হবেন। নবীতো তাই প্রমাণ করে গেছেন। আল্লাহর হাজার হাজার দুশমনকে হত্যা করে পৃথিবীকে দুষ্ট শক্তি মুক্ত করে দিয়ে গেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত কুফরী শক্তি, দুষ্ট শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে সেসকল দুষ্ট শক্তির টুঁটি চেপে ধরে কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষদের শান্তি বিধান করার জন্য রাসূলই আদেশ দিয়ে গেছেন এবং এ আদেশের মাধ্যমেই তিনি রহমতের নবী হওয়ার পূর্ণ হক আদায় করে গেছেন। তিনি বলে গেছেন-

جابر بن عبد الله، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»، قال: "فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة".

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থেকে লড়াই-জঙ্গ চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, অতপর ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর বলবেন, আসুন! আপনি আমাদের ইমামতি করুন। তিনি বলবেন, না! আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সম্মানার্থে তোমারাই একে অপরের আমীর"। -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭

٢٣٤٩٢- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال قال حذيفة بينما أنا أمشي في طريق المدينة قال: إذا رسول الله صلى الله عليه و

سلم يمشي فسمعته يقول أنا محمد وأنا أحمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمقفى **ونبي الملاحم**. (مسند أحمد). تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

٣٦٨- حدثنا محمد بن طريف الكوفي، ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم، عن ابي وائل، عن حذيفة قال: لقيت النبي في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد، وأنا احمد، وأنا نبي الرحمة، ونبي التوبة، وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. (**الشمائل المحمدية للترمذي**).

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি রহমত ও তাওবার নবী, আমার পাদদেশে হাশরের ময়দানে সবাইকে একত্রিত করা হবে, আমি সর্বশেষ নবী এবং আমি রক্তপাত-যুদ্ধের নবী''। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৪৯২, শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৮

٥١١٥- حدثنا أبو النصر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري**، ومن تشبه بقوم فهو منهم. (**مسند أحمد، قال احمد شاكر: اسناده صحيح**).

١٠- عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى بعثني بالسيف بين يدى الساعة، وجعل رزقي تحت رمحي أو ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم". (**كتاب السير للإمام محمد**، مقدمة الشارح، باب فَضِيلَة الرِّبَاط).

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে কিয়ামতের আগ মুহূর্তে তরবারী দিয়ে পাঠানো হয়েছে। যাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যার কোন শরীক নেই। আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়ার

নিচে। হীনতা ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য যারা আমার হুকুমের অবাধ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত''।- মুসনাদে আহমাদ, ৭/১২২ হাদীস নং ৫১১৫, দারুল মাআরিফ মিসর, কিতাবুস সিয়ার, ইমাম মুহাম্মাদ, অধ্যায় ফযীলাতুর রিবাত ১/১৬

والمراد بقوله: بعثني بالسيف أي بعثني بالقتال في سبيل الله كما قال عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"، ولأن القتال في حق غيره من الانبياء لم يكن مأمورا به وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، **وصفته في التوراة: نبى الملحمة عيناه حمراوان من شدة القتال. وفى صفة أمته: أناجيلهم في صدورهم، وسيوفهم على عواتقهم.** وإليه أشار في قوله عليه السلام: "السيوف أردية الغزاة". (**شرح كتاب السير للسرخسي**، مقدمة الشارح).

অতএব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমত ও করুণার নবী -এ বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে তাঁর কঠোর আচরণের কোন বৈপরীত্য নেই। এখন তো আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করে, নবীজীর আদর্শকে উপেক্ষা করে আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে ভালোবাসা-সম্প্রীতি-উদারতা-সৌহার্দ্যের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। আল্লাহর শত্রুকে যদি কেউ বন্ধু মনে করে তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের দাবি করে কীভাবে? রাসূলের শত্রুদের সঙ্গে যারা ভালোবাসা রাখার দাওয়াত দেয় তারা রাসূলের বন্ধু হয় কীভাবে? আমরা পৃথিবীর এ কেমন আজব চেহারা দেখতে পাচ্ছি।

৭.'তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণের জীবনে মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান'

এ কল্যাণকামিতা পূর্বোল্লিখিত রিবয়ী ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথায়ও ফুটে উঠেছে। আর কল্যাণকামিতার এ দৃষ্টান্তই মূলত মুসলমানদের আদর্শ। তিনি ইরানের অগ্নিপূজারীদের অধিপতিকে বলেছিলেন-

الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، **ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.**

"আমরা তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। মানুষদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নেয়ার জন্য। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে ডাকার জন্য। আর সকল ধর্মের জুলুম অত্যাচার থেকে ইসলামের ইনসাফের পথে আনার জন্য"।

বলাবাহুল্য, এ মুজাহিদ সাহাবীর প্রত্যেকটি কথাই কল্যাণকামিতার। স্বাধীনতার নামে মানুষ মানুষেরই দাসত্ব করে চলেছে। সে অনুভূতি তার নেই। তাই এ দাসত্ব থেকে পরিত্রাণেরও কোন চিন্তা তার নেই। মানুষ সংকীর্ণ এ পৃথিবীর ঘূর্ণিপাকে নিজেকে হারিয়ে প্রশস্ত আখেরাতের কথা ভুলে গেছে। ধর্মের নামে হাজারো অধর্মের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মুক্তিদাতার দেখা সে পাচ্ছে না। এ তিন ধরণের অকল্যাণকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য মরুর দূত এসে হাজির হয়েছেন অবুঝ অগ্নিপূজারীদের দরবারে।

কিন্তু যে এ কল্যাণের আহবানকে পায়ে ঠেলে দেবে তার জন্য এ কল্যাণকামী সাহাবীর কাছে কী ব্যবস্থা ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে, রাসূলের পক্ষ থেকে এবং রাসূলের খলিফার পক্ষ থেকে তা ইসলামের ধারক-বাহকরা ভুলে গেছে। এ কল্যাণকামী সাহাবী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে গেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে এ দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে এর দিকে ডাকার জন্য। ডাকার পর যে আমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে আমরা তার এ গ্রহণ করাকে মেনে নেব এবং ফিরে যাব। তার ভূমির উপর সেই আধিপত্য করবে, আমরা নই। আর যে আমাদের এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করব, লড়াই করব, জঙ্গ করব, জিহাদ করব এবং করতেই থাকব। এর কোন বিকল্প নেই। বিকল্প থাকলে আছে এতটুকু, কেউ যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে আরোপ করা সকল শর্ত মেনে নিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে, হীনতার

৮

সাথে মুসলমানদেরকে কর দিয়ে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে মুসলমান না হয়েও বেঁচে থাকতে পারবে। আর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর কেউ মুসলমানদের হাতে নিহত হবে, কেউ তাদের হাতে বন্দি হয়ে গোলাম হিসাবে বেঁচে থাকবে। কুরআন, হাদীস ও ফিকহে শরীয়তের এ বিধানগুলো এভাবে এসেছে।

এখন কোন মুসলমান যদি এ বিধানগুলোর মাঝে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও হিংস্রতা দেখতে পায় তাহলে এ মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, নতুন করে মুসলমান হওয়া। জঙ্গ ও জিহাদের আদেশ হবে, কাফেরদের হত্যা করার ফরয হুকুম করা হবে, কিন্তু সেখানে কোন কঠোরতা হবে না এর কী ব্যবস্থা? উদারতা ও ভালোবাসার সাথে হত্যা করার পদ্ধতি কি? واغلظ عليهم এবং وليجدوا فيكم غلظة কখন কার সঙ্গে হবে? أشداء على الكفار رحماء بينهم এ- গুণের বাস্তবায়ন কীভাবে হয়েছে? এবং কীভাবে হবে?

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কল্যাণকামিতার দাওয়াত গ্রহণ না করলে এ কঠোরতা কেন হবে? এর প্রথম ও আসল জবাব হচ্ছে, সৃষ্টির মালিক তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দেবেন সে সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার আমাদেরকে কে দিয়েছে?! এ প্রশ্নতো সৃষ্টিকর্তার উপর আপত্তি! যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে তার সকল গুণাবলীসহ বিশ্বাস করে সে অবশ্যই একথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণেই এ বিধানগুলো দিয়েছেন। রহমতের নবী মানব জাতির কল্যাণেই এ বিধানগুলোর উপর আমল করে গেছেন এবং উম্মতকে আমল করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। একজন মুসলমানতো অবশ্যই, আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে এমন ব্যক্তিমাত্রই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য।

তবে আল্লাহ তাআলা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, শিরক কুফরের মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটি অবস্থা, আর এর কারণে তাকে হত্যা করা হচ্ছে আরেকটি অবস্থা। দু'টিই জটিল বিষয়। এখন যদি এমন হয় যে, শিরক-কুফর থেকে বিরত রাখার জন্য হত্যার কোন বিকল্প

না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হত্যা করে শিরক-কুফর বন্ধ করা হবে, না কি হত্যা না করে শিরক কুফর করতে দেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

"তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল। **আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর,** এবং তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান। তবে যদি তারা বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই"। -সূরা বাকারা ১৯১-১৯৩

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: "والفتنة أشد من القتل"، والشرك بالله أشدُّ من القتل. (تفسير الطبري تحت هذه الآية).

عَنْ مُجَاهِدٍ: [وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ] ﴿البقرة: ١٩١﴾، قَالَ: «يَقُولُ ارْتِدَادُ الْمُؤْمِنِ إِلَى الْوَثَنِ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُقْتَلَ مُحِقًّا» (تفسير مجاهد تحت هذه الآية).

﴿والفتنة أشد من القتل﴾ روي عن جماعة من السلف أن المراد بالفتنة ها هنا الكفر. (أحكام القرآن تحت هذه الآية).

وقال أبو العالية، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع ابن أنس في قوله: [والفتنة أشد من القتل] يقول: الشرك أشد من القتل. (تفسير ابن كثير تحت هذه الآية).

حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: "ولا تقاتلوهم عندَ المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه" كانوا لا يُقاتلون فيه حتى يُبدأوا بالقتال، ثم نسخ بعد ذلك فقال: "وَقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" = حتى لا يكون شركٌ = "ويكون الدين لله" = أن يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل نبيُّ الله، وإليها دعا. (تفسير الطبري تحت هذه الآية).

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. (١٩٣). وقوله تعالى ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله﴾ يوجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس: الفتنة هاهنا الشرك، وقيل إنما سمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما يؤدي إليه الفتنة. (أحكام القرآن تحت هذه الآية).

وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ شرك وَيَكُونَ الدِّينُ للهِّ خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. (تفسير البيضاوي تحت هذه الآية).

[وَالْفِتْنَة] الشِّرْك مِنْهُمْ [أَشَدّ] أَعْظَم [مِنْ الْقَتْل] لَهُمْ فِي الْحَرَم أَوْ الْإِحْرَام الَّذِي اسْتَعْظَمْتُمُوه. (تفسير الجلالين تحت هذه الآية).

والمراد من «الفتنة» الشرك على ما هو المأثور عن قتادة والسدي وغيرهما، ويؤيده أن

مشركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴿الفتح: ١٦﴾ (روح المعاني تحت هذه الآية).

[والفتنة أَشَدُّ مِنَ القتل] أي شركهم بالله أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم. (تفسير النسفي تحت هذه الآية).

বলাবাহুল্য, أَشَدُّ অর্থ বেশি জঘন্য। অর্থাৎ বেশি ক্ষতিকর। পৃথিবীতে শিরক-কুফরের অস্তিত্ব মানব জাতির জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। আর তা এত বেশি ক্ষতিকর যার জন্য হত্যার মত একটি জঘন্য বিষয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। শুধু অনুমতি নয়, আদেশ করা হয়েছে, ফরয করে দেয়া হয়েছে। খুবই যুক্তিসংঙ্গত বিষয়।

৮. 'কতিপয় দুষ্কৃতিকারী নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে'

ইসলামের পক্ষে জিহাদের শিরোনামে যারা আল্লাহর দুশমনদের উপর হামলা করছে তাদেরকে দুষ্কৃতিকারী বলে গালি দেয়া হল। যারা আল্লাহর দুশমন কাফের-মুশরিক তারা তো এ গালি দেয়ারই কথা। কিন্তু একজন মুসলমান এ গালি দেয়ার আগে যে কাজগুলো করতে হবে তা হচ্ছে: ১) এ হামলাকারীরা কারা তা স্পষ্ট করে জানতে হবে। ২) হামলা কেন করা হয়েছে তা হামলাকারীদের কাছ থেকেই জানতে হবে। ৩) যাদের উপর হামলা করা হয়েছে তারা কারা? শরীয়তের বিচারে তাদের কী হুকুম তা স্পষ্ট করে জানতে হবে। ৪) বর্তমান পৃথিবীতে জিহাদের হুকুম কী এবং জিহাদের পদ্ধতি কী তা পরিষ্কার করে জানতে হবে। ৫) ইসলামের পক্ষ থেকে জিহাদকে যে পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন করা হোক কাফের শক্তি তা মেনে নেবে না এবং প্রতিরোধ করবেই -একজন মুসলমান এ বিশ্বাস রাখতে হবে। ৬) আর মনে রাখতে হবে জিহাদের যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হবে তা কঠিন। মুহাব্বত-ভালোবাসার সাথে কারো গর্দানে ছুরি চালানো সম্ভব নয়।

অতএব এ বিষয়গুলোকে বিবেচনা না করে যদি কেউ কাফের-মুশরিকদের সুরে সুর মিলিয়ে ইসলামের পক্ষে জিহাদের শিরোনামে আল্লাহর দুশমনদের উপর হামলাকারীদেরকে দুষ্কৃতকারী বলে গালি দেয় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর এ গালিদাতাদের সুরে সুর মিলিয়ে ইসলামের পক্ষে জিহাদকারীদেরকে দুষ্কৃতিকারী বলে দাবিদারদের খাতায় যারা স্বাক্ষর করেছে তারা অজ্ঞতার ওজরে সাময়িকভাবে বেঁচে গেলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ওজর মনে হয় বেশিক্ষণ টিকে থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে নতুন করে ঈমান আনার প্রশ্ন আসবে। যা কোনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

মনে রাখতে হবে, এ ফতোয়ায় দুষ্কৃতিকারী বলা হয়েছে সারা বিশ্বের চলমান প্রত্যেকটি জিহাদী কাফেলাকে। দুষ্কর্ম বলা হয়েছে সারা বিশ্বের চলমান জিহাদী প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে। এর বিপরীতে জিহাদের ফরয দায়িত্ব বাস্তবায়নের কোন পদ্ধতি দেয়া হয়নি। এরপর বলা হয়েছে, 'এ ফতোয়া জিহাদের বিরুদ্ধে নয়'। এর দ্বারা ধোঁকার মাত্রা বেড়েছে না কমেছে? যে ফতোয়ায় দুষ্কৃতিকারী ও মুজাহিদকে আলাদা করে দেখানো হয়নি সে ফতোয়া জিহাদের বিরুদ্ধে নয় বলার সুযোগ কোথায়?

নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে'

সারা বিশ্বে যারা ইসলামের পক্ষে জিহাদের নামে আল্লাহর দুশমনদের উপর হামলা করে চলেছে তাদের হীন স্বার্থগুলো কী কী?

ক). শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ সহ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার আরবের আদরের দুলাল জীবনের কোন্ হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ভূ-স্বর্গকে ত্যাগ করে ভূ-গর্ভকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছিলেন?

খ). যে সকল নওজোয়ান আজীবন শত্রুর আগুনের কারাগারে কাটাতে হবে জেনেও ইসলামের পক্ষে জিহাদের নামে আল্লাহর দুশমনদের উপর হামলা করে চলেছে তাদের জীবনের হীন স্বার্থগুলো কী কী?

গ). যে মানুষগুলো পৃথিবীর সকল বন্ধনকে ছিন্ন করে ধন-সম্পদ, জীবন, মায়া-ভালোবাসা, আত্মীয়-স্বজন, সব কিছুকে পেছনে ফেলে নিশ্চিতভাবে জেনে-শুনে এ পথে পা বাড়াল, নিজেকে কুরবান করে দিল তাদের হীন স্বার্থগুলো কী?

ঘ). একজন মুসলমান যদি বেহেশত, বেহেশতের নাজ-নেয়ামত, বেহেশতের হুর গেলমানের আশায় এবং জাহান্নাম, জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির ভয়ে এ কাজগুলো করে তাহলে এ স্বার্থ কি কোন হীন স্বার্থ? হুর-গেলমানের আশায় কেউ জীবন বিলিন করলে এ বিষয়টিকে ব্যঙ্গাত্বক ভাষায় ব্যক্ত করা কি ঈমান পরিপন্থী বিষয় নয়? দলিলের আলোকে চলার পরও পদ্ধতিগত ভুলের কারণে কি একজন মুসলমানের জন্য জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করছে বলা যায়?

ঙ). সারা বিশ্বে যারা ইসলামের পক্ষে জিহাদের নামে আল্লাহর দুশমনদের উপর হামলা করে চলেছে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতাতো এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা ইসলামের নাম না নিলে সারা বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর গডফাদার হতে পারতেন। তাদের আরো অতিরিক্ত সুবিধাগুলো ছিল, কোন অমুসলিমের কোপানলে তারা পড়তেন না, খোদ মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিত না এবং মানব বন্ধন করতো না। (কারণ পৃথিবীর কোন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কখনো ফতোয়া দেয়া হয়নি, মানব বন্ধন হয়নি, চাই সে সন্ত্রাসী আমেরিকা হোক বা বৃটিশ হোক, ভারত হোক বা জাতিসংঘ হোক, ন্যাটো হোক বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হোক, কালা জাহাঙ্গির হোক বা পিচ্চি হান্নান হোক, মুরগি মিলন হোক বা সুইডেন আসলাম হোক, শামীম ওসমান বা জয়নাল হাজারী হোক, তাহের ও তাহেরপুত্র হোক বা এরশাদ শিকদার হোক, প্রকাশ-বিকাশ হোক বা ডিপজল আর শহিদ কমিশনার হোক, যে কোন ছোট বড় পাতি সন্ত্রাসীই হোক কারো বিরুদ্ধেই কখনো ফতোয়া বা মানববববন্ধন হয়নি)। শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল গবেষণা করে এ সকল কার্মকাণ্ড চালানোর প্রয়োজন হত না, সর্বোপরি তারা মুসলমান কর্তৃক নিগৃহীত হত না। তাহলে ইসলামের নামে এ জিহাদ করে যাওয়ার পেছনে তাদের হীন স্বার্থগুলো কী?

বলা হতে পারে, ইসলামের নাম নেয়ার দ্বারা সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়া সহজ। কিন্তু ইসলামের নাম নেয়ার দ্বারা যে ইসলামী জিহাদের সকল শত্রু সতর্ক হয়ে যাবে এ কথা জিহাদের পক্ষশক্তিও জানে বিপক্ষশক্তিও জানে, যার বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইসলামী জিহাদের পক্ষশক্তি এ কথা জানে যে, এ শিরোনামের কারণে পৃথিবীর সকল কুফরী শক্তির পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা হবে, প্রতিরোধ হবে। কুরআন এর পক্ষে সাক্ষী, হাদীস এর পক্ষে সাক্ষী, সীরাত এর পক্ষে সাক্ষী, ইতিহাস এর পক্ষে সাক্ষী, বর্তমন বাস্তব চিত্র এর পক্ষে সাক্ষী।

ইসলামী জিহাদের পক্ষ শক্তি এ কথাও জানে যে, খোদ মুসলমানদের খানকাহ থেকে এর বিরোধিতা করা হবে, তাবলীগের জামাআতের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হবে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হবে, তালীমের দরসগাহ থেকে বিরোধিতা করা হবে, বিলাসী মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হবে, কুফরী শক্তির বন্ধুদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হবে।

তাহলে ইসলামের শিরোনাম নেয়ার দ্বারা শতকরা কত ভাগকে ধোঁকা দেয়া যাবে আর এ শিরোনাম না নেয়ার দ্বারা শতকরা কত ভাগকে ধোঁকা দেয়া যাবে? অতএব এ শিরোনাম গ্রহণ করার পেছনে হীন স্বার্থগুলো কী?

চ). সারা বিশ্বে যারা ইসলামী জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা খানকার পীর, তাবলীগের যিম্মাদার, মাদরাসার মুহতামিম, রাজনৈতিক নেতা, সরকারের দালালগোষ্ঠীর তুলনায় অতিরিক্ত কী কী সুবিধা ভোগ করছেন যা তাঁদের হীন স্বার্থের তালিকায় আসতে পারে? স্বাভাবিক জীবন যাপনের পরিবর্তে প্রতিটি মুহূর্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলার পেছনে কোন কোন হীন স্বার্থ কাজ করছে? এ কাজে নিবেদিতপ্রাণ প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুযায়ী বিচার করলে এ পথ ছাড়া অন্য পথে কি তারা এর চাইতে বেশি হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারত না?

৯. ‘কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে’

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআনের কোন কোন আয়াতের এবং কোন কোন হাদীসের অপব্যাখ্যা করলে জিহাদের ফরয হুকুম প্রমাণিত হয়?! আর কোন কোন আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা করলে আল্লাহর দুশমনদেরকে হত্যা করা বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বলে প্রমাণিত হয়?!

ইসলামী জিহাদের শিরোনামে যারা সারা বিশ্বে লড়াই করে চলেছে তারা তো নিম্নোক্ত আয়াত, তাফসীর বিশারদগণের তাফসীর, হাদীস, মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক প্রদত্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এবং মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতেহাদ ও ফতোয়ার আলোকে করছেন। এখন এসকল আয়াতের আলোকে ইসলামের পক্ষে লড়াই করা যদি আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা হয় তাহলে এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কি? ধারাবাহিক কিছু আয়াত ও হাদীস ব্যাখ্যা ও মাসআলাসহ দেখা যেতে পারে-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

“আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই”। -সূরা বাকারা ১৯৩

وقَوْله تَعَالَى [وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ] **يُوجِبُ فَرْضَ قِتَالَ الْكُفَّارِ حَتَّى يَتْرُكُوا الْكُفْرَ.** قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالرَّبِيعُ بْنُ أنس: **الفتنة هاهنا الشِّرْكُ،** وَقِيلَ إنَّمَا سُمِّيَ الْكُفْرُ فِتْنَةً لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ كَمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ الْفِتْنَةُ. (**أحكام القرآن للجصاص تحت هذه الآية ١\٣٢٤** دار احياء التراث العربي).

ثم أمر تعالى بقتال الكفّار: {حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي: شرك. قاله ابن عباس، وأبو العالية، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والربيع، ومقاتل بن حيان، والسُّدي، وزيد بن أسلم.{وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} أي: يكونَ دينُ الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين: عن أبي موسى الأشعري قال: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل

يُقاتل شجاعة، ويقاتل حَمِيَّة، ويقاتل رياء، أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". وفي الصحيحين: "أمِرْتُ أنْ أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" وقوله: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ} يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك، وقتال المؤمنين، فكُفُّوا عنهم. (**تفسير ابن كثير** تحت هذه الآية)

(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ.

١٩٣) فيه مسألتان: الأولى - قوله تعالى: " وقاتلوهم " أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع، على من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: " فإن قاتلوكم " والاول أظهر، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى: " ويكون الدين لله "، وقال عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله). فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، لأنه قال: " حتى لا تكون فتنة " أي كفر، فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. (**تفسير القرطبي** تحت هذه الآية).

{وقاتلوهم حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي شِرْكٌ {وَيَكُونَ الدين للَّهِ} خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب {فَإِنِ انْتَهَوْاْ} بعد مقاتَلتِكم عن الشِّرك {فَلاَ عدوان إِلاَّ عَلَى الظالمين} أي فلا تعتَدوا عليهم. (**تفسير أبي السعود** تحت هذه الآية).

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون} تُوجَد {فِتْنَة} شِرْك {وَيَكُون الدِّين} الْعِبَادَة {لِلَّهِ} وَحْده لَا يُعْبَد سِوَاهُ {فَإِنْ انْتَهَوْا} عَنْ الشِّرْك فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ. (**تفسير الجلالين** تحت هذه الآية).

"إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ".

"স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে অনড় রাখ। অচিরেই আমি ভীতি ঢেলে দেব তাদের হৃদয়ে যারা কুফরী করেছে। অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের গিরায় গিরায়"। -সূরা আনফাল ১২

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.

"অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয় (বন্ধ হয়ে যায়)। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। অচিরেই তিনি তাদেরকে হিদায়াত দিবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন। আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য

রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন"। -সূরা মুহাম্মাদ ৪-৮

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয়"। -সূরা তাওবা ২৯

قال (وقتال الكفار) الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء الجزية (واجب وإن لم يبدءوا بالقتال للعمومات) الواردة في ذلك كقوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، كتب عليكم القتال وغيرها .

فإن قيل العمومات معارضة بقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإنه يدل على أن قتال الكفار إنما يجب إذا بدءوا بالقتال. **أجيب بأنه منسوخ**، وبيانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الابتداء مأمورا بالصفح والإعراض عن المشركين بقوله فاصفح الصفح الجميل، وأعرض عن المشركين، ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة والمجادلة بالأحسن بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، الآية. ثم أذن بالقتال إذا كانت البداءة منهم بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون، الآية، وبقوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض الأزمان بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية. ثم أمر بالبداءة بالقتال مطلقا في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها فقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. (**العناية شرح الهداية مع فتح القدير**، كتاب السير٥\٤٢٥ -٤٢٦ دار الكتب العلمية).

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

"আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেও প্রতি যুলম করা হবে না"। -সূরা আনফাল ৬০

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে যুদ্ধের আগেই অস্ত্রের প্রস্তুতি নিতে আদেশ করেছেন, শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য এবং কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করার জন্য কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য। জাসসাস রহ. এর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

وقوله تعالى:"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل "**أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال إرهابا للعدو، والتقدم في ارتباط الخيل استعدادا لقتال المشركين، وقد روي في القوة إنها الرمي.**

حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ... عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.

وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال ...... عن عمرو عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وكل لهو المؤمن باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق.

وحدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال ... عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ليس من اللهو ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها.

وحدثنا عبدالباقي قال ... عن أبي رافع قال قال رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلم: **من حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي.**

ومعنى قوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلم ألا إن القوة الرمي، أنه من معظم ما يجب إعداده من القوة على قتال العدو، ولم ينف به أن يكون غيره من القوة، بل عموم اللفظ الشامل لجميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب.

وقد حدثنا عبدالباقي قال ... عن الحكم بن عمير قال أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلم، **أن لا نحفي الأظفار في الجهاد. وقال: إن القوة في الأظفار**. وهذا يدل على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور باستعداده. وقال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو. **(أحكام القرآن للجصاص ٤\٢٥٢-٢٥٣ دار احياء التراث العربي)**.

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

"পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদেরকে বল, 'এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে শীঘ্রই তোমাদেরকে ডাকা হবে; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর তোমরা যদি আনুগত্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর পূর্বে তোমরা যেমন ফিরে

গিয়েছিলে তেমনি যদি ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন"। -সূরা ফাতহ ১৬

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» (**صحيح البخاري**، رقم الحديث ٢٥).

باب فرض الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال أبو بكر: لم تختلف الأمة أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وقوله: فاعف عنهم واصفح، وقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.

وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف وأصحابا له كانت أموالهم بمكة فقالوا يا رسول الله! كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم). فلما حوله إلى المدينة أمروا بالقتال فكفوا، فأنزل الله (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس).

وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: لست عليهم بمصيطر، وقوله: وما أنت عليهم بجبار، وقوله: فاعف عنهم واصفح، وقوله: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قال: نسخ هذا كله قوله

تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله صاغرون.

وقد اختلف السلف في أول آية نزلت في القتال، فروي عن الربيع بن أنس وغيره أن قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أول آية نزلت. وروي عن جماعة آخرين منهم أبو بكر الصديق والزهري وسعيد بن جبير أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية. وجائز أن يكون وقاتلوا في سبيل الله أول آية نزلت في إباحة قتال من قاتلهم، والثانية في الإذن في القتال عامة لمن قاتلهم ومن لم يقاتلهم من المشركين.

وقد اختلف في معنى قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فقال الربيع بن أنس: هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقاتل من قاتله من المشركين ويكف عمن كف عنه إلى أن أمر بقتال الجميع.

قال أبو بكر: وهو عنده بمنزلة قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال محمد بن جعفر بن الزبير: أمر أبو بكر بقتال الشمامسة لأنهم يشهدون القتال، وأن الرهبان من رأيهم أن لا يقاتلوا، فأمر أبو بكر رضى الله عنه بأن لا يقاتلوا وقد قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فكانت الآية على تأويله ثابتة الحكم ليس فيها نسخ.

وعلى قول الربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا مأمورين بعد نزول الآية بقتال من قاتل، دون من كف، سواء كان ممن يتدين بالقتال أو لا يتدين. وروي عن عمر بن عبد العزيز في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أنه في النساء والذرية ومن لم في آثار شائعة النهي عن قتل النساء والولدان. وروي عنه أيضا النهي عن قتل أصحاب الصوامع. رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان معنى الآية على ما قال الربيع بن أنس أنه أمر فيها بقتال من قاتل والكف عمن

لا يقاتل فإن قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ناسخ لمن يلي وحكم الآية كان باقيا فيمن لا يلينا منهم.

ثم لما نزل قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم- إلى قوله- ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فكان ذلك أعم من الأول الذي فيه الأمر بقتال من يلينا دون من لا يلينا، إلا أن فيه ضربا من التخصيص بحظره القتال عند المسجد الحرام إلا على شرط أن يقاتلونا فيه بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ثم نزل الله فرض قتال المشركين كافة بقوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.

فمن الناس من يقول إن قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومنهم من يقول هذا الحكم ثابت لا يقاتل في الحرم إلا من قاتل. ويؤيد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة (إن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السموات والأرض فإن ترخص مترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فإنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة).

فدل ذلك على أن حكم الآية باق غير منسوخ، وأنه لا يحل أن نبتدئ فيها بالقتال لمن لم يقاتل، وقد كان القتال محظورا في الشهر الحرام بقوله يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد ثم نسخ بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن الناس من يقول هو غير منسوخ والحظر باق.

وأما قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقاتلنا بعد أن يكونوا من أهل القتال، لأنه لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظورا، وقد نهى عنه النبي

صلى الله عليه وسلم وعن قتل أهل الصوامع. فإن كان المراد بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الأمر بقتال من قاتلنا ممن هو أهل القتال دون من كف عنا منهم وكان قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نهى عن قتال من لم يقاتلنا فهي لا محالة منسوخة بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم لإيجابه قتل من حظر قتله في الآية الأولى بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إذ كان الاعتداء في هذا الموضع هو قتال من لم يقاتل. (**أحكام القرآن للجصاص ١\٣١٩-٣٢٢** دار احياء التراث العربي).

(**كِتَابُ السِّيَرِ**) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابُ السِّيَرِ. قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي- رحمه الله تعالى- اعلم أن السير جمع سيرة وبه سمي هذا الكتاب، لأنه بين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب، ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة، ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار، ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين وإن كانوا جاهلين وفي التأويل مبطلين.

فأما بيان المعاملة مع المشركين، فنقول: الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتال الممتنعين منهم من الإجابة. لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبها كانوا خير الأمم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس (آل عمران : ١١٠) الآية.

ورأس المعروف الإيمان بالله تعالى، فعلى كل مؤمن أن يكون آمرا به داعيا إليه. وأصل المنكر الشرك، فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد لما فيه من إنكار الحق من غير تأويل، فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر عليه.

وقد كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين. قال الله تعالى فاصفح الصفح الجميل (الحجر : ٨٥) وقال تعالى وأعرض عن

المشركين (الحجر : ٩٤). ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالأحسن، فقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن (النحل : ١٢٥). ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا (البقرة: ١٩١) أي أذن لهم في الدفع، وقال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم (البقرة: ١٩١) وقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها (الأنفال: ٦١). ثم أمر بالبداية بالقتال، فقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة (البقرة: ١٩٧) وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (التوبة: ٥) وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين. وهو فرض قائم إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه و سلم (الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال). وقال صلى الله عليه و سلم (بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي والذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم). وتفسيره منقول عن سفيان بن عيينة – رحمه الله تعالى قال: بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه و سلم بأربعة سيوف، سيف قاتل به بنفسه عبدة الأوثان، وسيف قاتل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أهل الردة، قال الله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون (الفتح : ١٦). وسيف قاتل به عمر رضي الله تعالى عنه المجوس وأهل الكتاب، قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (التوبة: ٢٩) الآية. وسيف قاتل به علي رضي الله تعالى عنه المارقين والناكثين والقاسطين، وهكذا روي عنه قال: أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين، قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله (الحجرات: ٩).

ثم فريضة الجهاد على نوعين:

أحدهما: عين على كل من يقوى عليه بقدر طاقته، وهو ما إذا كان النفير عاما. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا (التوبة : ٤١) وقال تعالى ما لكم إذا قيل انفروا في سبيل الله

اثاقلتم إلى الأرض (التوبة:٣٨) إلى قوله يعذبكم عذابا أليما (التوبة:٣٨) ونوع هو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين. لأنه لو جعل فرضا في كل وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض، والمقصود أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الكل بالجهاد لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم، فلذلك قلنا إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم تارة يخرج وتارة يبعث غيره حتى قال (وددت أن لا تخرج سرية أو جيش إلا وأنا معهم ولكن لا أجد ما أحملهم ولا تطيب أنفسهم بالتخلف عني ولوددت أن أقاتل في سبيل الله تعالى حتى أقتل ثم أحي ثم أقتل) . ففي هذا دليل على أن الجهاد وصفة الشهادة في الفضيلة بأعلى النهاية حتى تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم مع درجة الرسالة . وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم (قال المجاهد في سبيل الله كالصائم القائم الراكع الساجد الشاهد) وفي حديث الحسن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (غدوة أو روحة في سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما فيها) والآثار في فضيلة الجهاد كثيرة، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم سنام الدين . وعلى إمام المسلمين في كل وقت أن يبذل مجهوده في الخروج بنفسه أو يبعث الجيوش والسرايا من المسلمين ثم يثق بجميل وعد الله تعالى في نصرته بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم (محمد: ٧).

(**المبسوط للسرخسي، كتاب السير** ١٠\\١-٤ دار المعرفة، بيروت لبنان).

সারা বিশ্বের জিহাদী কাফেলাগুলো কী কী করছে? কখনো তারা আল্লাহর দুশমন কাফের মুশরিকদের উপর আক্রমণ করছে, কখনো কোন মুরতাদের উপর আক্রমণ করছে, আবার কখনো আল্লাহর দুশমনদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করছে, কখনো চূড়ান্ত জিহাদের প্রস্তুতি হিসাবে পরীক্ষামূলক অক্রমণ করছে। কখনো সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে, আবার কখনো গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। কখনো যুদ্ধে অবতীর্ণ শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে, কখনো শত্রুর চরের উপর আক্রমণ করছে, কখনো

শত্রুর আর্থিক যোগানদাতার উপর আক্রমণ করছে, কখনো শত্রুর সহযোগীর উপর আক্রমণ করছে। এ সবই তো হচ্ছে আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যার আলোকে, ফিকহের মাসআলার আলোকে। কিতাবাদিতে তো এগুলোকে সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। কোন আয়াত হাদীসকে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে তা আসলে পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছে। প্রমাণ দেখানোর জন্য তো পুরো গ্রন্থাগার সামনে আনতে হবে। উদ্ধৃতি আর কত উল্লেখ করা যাবে। এর বিপরীত কোন কথা তো নেই-ই।

১০. 'ইসলামকে একটা বর্বর, নিষ্ঠুর ও সন্ত্রাসী ধর্মরূপে চিত্রিত করছে'

এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, কুরআনের কোন কোন আয়াত ও কোন কোন হাদীসের অপব্যাখ্যা করলে ইসলাম একটি বর্বর, নিষ্ঠুর ও সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে রূপায়িত হয়?!

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইসলামের শত্রুপক্ষ চাই তারা ইহুদী হোক বা খৃস্টান, মুশরিক হোক বা হিন্দু, বৌদ্ধ হোক বা নাস্তিক যেই হোক তারা ইসলামকে বর্বর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রমাণ করার জন্য ইসলামের আনেকগুলো আহকামকে বেছে নিয়েছে। এক. জিহাদের আয়াত ও হাদীসগুলো। দুই. যুদ্ধের ঘটনাগুলো। তিন. দণ্ডবিধিসমূহ। চার. কুরবানীর পশু জবাই। পাঁচ. যে কোন প্রকারের জীব হত্যা। ছয়. বাল্য বিবাহ। সাত. বহু বিবাহ। আট. দাসপ্রথার অনুমোদন। নয়. যুদ্ধে বন্দি নারীদেরকে দাসী বানিয়ে তাদের সঙ্গে যৌন আচরণের বৈধতা।

ইসলামের শত্রুপক্ষ ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের সামনে এ কথাগুলো প্রচার করে আসছে। নবীগণ যখন পৃথিবীর নষ্ট মানুষগুলোকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন তখন তারা তাদের শিরকের দুর্বলতাকে স্বীকার না করে, বলতে লাগলো এরা আমাদের মাবুদদের সমালোচনা করে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বাবাও ইবরাহীমকে এ বদনাম দিয়েছিল। আবু জাহালও আমাদের নবীকে এ বদনাম দিয়েছে। যুগে

যুগে ইস্তেশরাকের ফিতনা -ইহুদী-খৃস্টানদের ভয়ংকর একটি দুষ্টচক্র- যারা কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে করে আল্লাহপ্রদত্ত এ বিধানগুলোকে মানবতাবিরোধী বলে প্রচার করার নিরবচ্ছিন্ন অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলামের উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি বিধানকে তারা তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। তাদের সেসব অপপ্রচারের সামান্য কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেই আমরা এ টীকার মূল আলোচনায় ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ-

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ.

“এবং কাফিররা বলে, এ তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো এক আশ্চর্য বিষয়! আর তাদের প্রধানরা চলে গেল একথা বলে যে, যাও এবং তোমাদের উপাস্যগুলোর উপর অবিচল থাক। নিশ্চয় এ বিষয়টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত”।

-সূরা সোয়াদ ৪-৬

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.

“আর ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে। মূসা বলল, আমি আমার রব ও তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক অহঙ্কারী থেকে, যে বিচার দিনের প্রতি ঈমান রাখে না”। -সূরা মুমিন ২৬-২৭

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.

“অতঃপর ফিরআউন নগরে– নগরে একত্রকারীদেরকে পাঠাল। ‘নিশ্চয়ই এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল। আর এরা অবশ্যই আমাদের ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়েছে।” -সূরা শুআরা ৫৩-৫৫

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى.

"তারা বলল, এ দু'জন অবশ্যই যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করে দিতে"। -সূরা ত্বহা ৬৩

فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: يا معشر قريش! إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله أو كما قال، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامض لما تريد. (**الروض الأنف**).

قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. (**الروض الأنف**).

فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم، وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك معه ثأرنا بمن أصاب منا. (**الروض الأنف**).

এবার এ টীকার মূল আলোচনায় আসা যায়। ইসলামের যে বিধানগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন হলেই শত্রুপক্ষ মানুষের সামনে ইসলামকে একটি বর্বর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র ধর্ম হিসাবে প্রচার করবে। কারণ সে ইসলামের শত্রু, সে ইসলামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব বিধান জানে না, সে এ বিধানগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে অবগত নয়, সর্বোপরি সে এ বিধাগুলোর দাতা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস রাখে না। সারা পৃথিবীর মানুষ যখন জঙ্গ ও জিহাদের বিরুদ্ধে এভাবে লেগে যায়নি তখনও এ বিধানগুলোকে পুঁজি করে ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে

অপপ্রচার চালিয়েছে। ইসলামকে মানুষের সামনে একটি বর্বর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র ধর্ম হিসাবে রূপায়িত করেছে।

বর্তমানে যখন সারা পৃথিবী জঙ্গ ও জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তখন ইসলামের নাদান বন্ধুরা ইসলামের শত্রুদের কাছে কাবু হয়ে গিয়ে ইসলামের এ স্বীকৃত বিধানগুলোকে অস্বীকার করাকেই সহজ মনে করেছে। এ বিধানগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে শত্রুর মুখে থু থু মারার জন্য যে পরিমাণ নির্লোভ রসনা, সাহসী বুকের পাঠা, যোগ্য মাথা ও ইসলাম-মুসলমানের প্রতি দরদী প্রাণের প্রয়োজন তার উপস্থিতি শূণ্যের কোঠায়। এর বিপরীত মাল ও ইজ্জতের লোভ, শত্রুর হুংকারের ভয়, প্রথাগত কিছু ধ্যানধারণা আওড়ানোর বদ অভ্যাস এবং ইহুদী-খৃস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ ও নাস্তিক-মুরতাদরে প্রতি ভালোবাসা-সৌহার্দ্য রয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। যারফলে শত্রুদের তিরস্কারমূলক ফালতু প্রশ্নের জবাবে সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত মুখের উপর বলে দিতে পারে না-

أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»

عن سلمان، قال: قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة).

শত্রুর মুখে ইসলামকে সন্ত্রাসী ও বর্বর ধর্ম হিসাবে প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছে ঐ নাদান গোষ্ঠী যারা যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম জিহাদের আমলী রূপ-রেখা উম্মতের সামনে তুলে ধরেনি। জিহাদের হাজারো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরও বিভিন্ন অজুহাতে একে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দাওয়াতকে জিহাদ বলা হয়েছে, তাযকিয়াকে জিহাদ বলা হয়েছে, কুফরী

গণতন্ত্রকে জিহাদ বলা হয়েছে। এভাবে বলতে বলতে আজ জিহাদের নাম হয়ে গেছে সন্ত্রাস, বর্বরতা ও হিংস্রতা। জিহাদকে মুমিনের অন্তর থেকে এমনভাবে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, একজন মুখলিস মুমিনও জিহাদের আয়াতগুলো শুনলে আঁতকে ওঠে, মুসলমানদের জিহাদের কাহিনীগুলো শুনলে আঁতকে ওঠে। দু'কূলের কোন এক কূল ধরে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। প্রথমত অবিশ্বাস করার চেষ্টা করে, দ্বিতীয়ত এমন কোন ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করে যার দ্বারা জিহাদের অস্তিত্ব থাকুক না থাকুক নিজের পিঠ যেন বেঁচে যায়, নিজের ঈমান যেন বেঁচে যায়। আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত বোকামীর স্তরে যারা পৌঁছে গেছে তারা আল্লাহর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করে বসে। আর যারা এখনো সে স্তরে পৌঁছেনি তারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে যে অভিযোগটা আল্লাহর বিরুদ্ধে করতে চাচ্ছিল সে অভিযোগটা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে করে দেয় যে আল্লাহর বাণীটি, হুকুমটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পড়ে শুনিয়ে দেয় বা আল্লাহর বিধানটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। আল্লাহ হেফাযত করুন! কখনো কখনো তাদের আচরণে এমনও মনে হয় যে তারা যেন বলতে চায়,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم، قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا باليوم الآخر...
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَة....

ইত্যাদি আয়াত যদি না থাকতো তাহলে খুব ভাল হত।

এ পরিস্থিতিতে বিচার্য বিষয় হলো, খোদ কুরআন, হাদীস ও সীরাতে এ বিধানগুলোর যে বাস্তব চিত্র রয়েছে তার ভিত্তিতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত ইসলামের শত্রুপক্ষ ইসলামকে মানুষের সামনে একটি বর্বর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র ধর্ম হিসাবে প্রচার করে আসছে এবং এরকম তারা করতেই থাকবে - এটাই স্বাভাবিক। এখন বর্তমানে যারা বিশ্বব্যাপী জিহাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তাদের কারো কারো পদ্ধতিগত কিছু ভুল, ইখলাসের দুর্বলতা, নেতৃত্বের দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে ইসলামের এ ভুল রূপায়ণের মাত্রা কতটুকু বাড়বে?

উদাহরণস্বরূপ, বনু কুরাইযার ইহুদীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হত্যা করেছিলেন সে দৃশ্যটি সামনে এনে ইসলামের যে কোন শত্রু ইসলাম ধর্মকে বর্বর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র ধর্ম বলে প্রচার করার অপচেষ্টা করতেই পারে। কিন্তু একজন মুসলমানতো ইহুদী-খৃস্টানদের সঙ্গে আচরণের সুন্নত-অনুসৃত পদ্ধতি এ ঘটনা থেকেই গ্রহণ করবে।

এখন মুজাহিদদের কোন কাফেলা যদি ইহুদী-খৃস্টানদের কোন দলকে একই কারণে বা একই ধরনের কোন কারণে হাত-পা বেঁধে এভাবে হত্যা করে দেয়, আর অমুসলিমদের সাথে সাথে মুসলামানদের ধারক-বাহক হওয়ার দাবিদাররাও একে ইসলামের বর্বর, নিষ্ঠুর ও হিংস্র রূপ হিসাবে আখ্যায়িত করে তাহলে আজ হোক কাল হোক ইসলামের শত্রুপক্ষ এ কথা বলতে পারবে কি না যে, এটা যদি বর্বর হয় তাহলে সেটা কেন বর্বর নয়?

বনু কুরাইযার ইহুদীদেরকে হত্যা করার সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা এখানে তুলে ধরছি-

مقتل بَنِي قُرَيْظَةَ. قال ابن إسحاق : ثم استنزلوا، فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب، وكعب بن أسد رأس القوم، وهم ست مائة أو سبع مائة، والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة والتسع مائة.

وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع وأنه من ذهب به منكم لا يرجع! هو والله القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. (**الروض الأنف، باب مقتل بَنِي قُرَيْظَةَ**).

مَقْتَلُ حيي ابْن أَخطب وَشعر ابْن جوال فِيهِ.

وأتي بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة له فقاحية – قال ابن هشام: فقاحية ضرب من الوشي– قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل لما أقبل على الناس فقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه. (**الروض الأنف، باب مقتل بَنِي قُرَيْظَةَ، وكذا عند ابن اسحاق وابن هشام وغيرهم**).

এমন পরিস্থিতিতে আসলে একজন মুসলমানের দায়িত্ব কী? আজ তোতার মত শত্রুর সুরে সুর মিলিয়ে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতার বুলি নিজে আওড়াচ্ছি এবং প্রত্যেকটি মানুষের মনে তা গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করছি, কাল যদি শত্রু সীরাতের পৃষ্ঠা উল্টে, কুরআনের আয়াত দেখিয়ে এবং হাদীসের পাতা পড়ে শুনায় এবং বলে, তোমরা যাকে বর্বরতা-নিষ্ঠুরতা বলেছ সেটাইতো (নাউযুবিল্লাহ) সীরাতের পাতায় পাতায় দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, শত্রুপক্ষ -যারা ইসলামের অপপ্রচারে লিপ্ত তারা বর্তমানে প্রচলিত জিহাদী কাফেলাগুলোর কাছে কী কী অতিরিক্ত উপাদান পাবে যার দ্বারা তারা নতুনভাবে ইসলামকে বদনাম করতে পারবে?! আমরা কি সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত বলতে পারি না যে, হ্যাঁ! এটাই করতে হবে। আল্লাহর দুশমন আল্লাহর যমিনে বেঁচে থাকার কোন অধিকার রাখে না। তারা মানুষ নয়। পশু। পশুর চাইতেও অধম। এটা কুরআনের ঘোষণা।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এবং মনে না চাইলেও স্বীকার করতে হবে যে, আমরা যারা ভুল ধরছি তারা কিন্তু জিহাদের ময়দানের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচিত নই। যুদ্ধের কলা-কৌশল এবং শত্রুর অবস্থা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 'অ' 'আ' পরিমাণ জ্ঞান রাখি না। বুঝ হওয়ার পর থেকেই আমরা কেউ জিহাদ করছি খানকাহের ভিতরে দরজা ও চোখ বন্ধ করে চাদরে মাথা ঢেকে, কেউ জিহাদ করছি একজন মুসলমান ভাইকে একটি ফরয আমল আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ

করে, কেউ জিহাদ করছি গণতন্ত্রের কুফরী পদ্ধতিতে দু'চারটি চোরাগলিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্যের সতর্ক উচ্চারণের মাধ্যমে, কেউ জিহাদ করছি কুরবানীর দিনে গরুর রক্ত গায়ে মাখিয়ে, কেউ জিহাদ করছি মাহফিলের জন্য মরিচ-পিয়াজ-ডিম-বাঁশ চাঁদা করে। মোটকথা জিহাদ ব্যতীত অন্য যে কোন নেক আমল করেই জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। আবার কেউ জিহাদ করছি ফেরাউনের পক্ষ নিয়ে মূসার উম্মতের উপর হামলা করে এবং দলিল হিসাবে ফেরাউনের সে উক্তিটিই ব্যবহার করছি–

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (٦٣) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (٦٤)

যে বিষয়টি ইমান কুফরের সে বিষয়টিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চলছে বাঙ্গালী সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে, বাঙ্গালী জাতির দোহাই দিয়ে, ভাষার দোহাই দিয়ে।

"আয়াত ও হাদীসের এ বিষয়ক হুকুমগুলোকে এড়িয়ে গিয়েছি ফিকহের কিতাবাদির উদ্ধৃতি দিয়ে, আর ফিকহের কিতাবাদীতে অর্ধশতাব্দীকালের বেশি সময় থেকে এ বিষয়ক অধ্যায়গুলোর উপর পিন মেরে দিয়েছি। সহজ সমাধান পেয়েছি এ হুকুমগুলো এক সময় ছিল, এখন নেই। আবার কখনো আসলে তখন দেখা যাবে। এখন নেসাব শেষ করতে হবে। জরুরি মাসআলা শেষ করতে হবে। ঐ মাসআলাগুলোই এখন আবার পড়ে শেষ করতে হবে যে মাসআলাগুলো নূরানী মক্তব থেকে পড়া শুরু করেছি এবং শিক্ষকতা জীবনের শেষ পর্যন্তও পড়তে থাকব।"

বড়রা এত বড় যে, তাঁদেরকে জিজ্ঞের করে এসব বিষয়ে জানতে চাওয়াও বেয়াদবী। এসব বিষয়ে যারা জানতে চাইবে তারা এত ছোট যে, তারা এসব বিষয়ে ভাবাটাই বেয়াদবী। যারাই এ বিষয়ে ভাববে তারা সবাই আদা ব্যাপারী। আর এ বিষয় থেকে যারা সবচাইতে দূরে তারা সবাই জাহাজের নাবিক।

পরিস্থিতি যখন এই, তখন বিশ্বব্যাপী যারা জিহাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করার আগে নিজের থলিটা একটু নেড়েচেড়ে দেখা জরুরী। বিশ্বব্যাপী যারা জিহাদ পরিচালনা করে চলেছে তাদের ইখলাস ও নিষ্ঠার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে, ইখলাস থাকুক বা না থাকুক ফরয আমল করতেই হবে। বদর যুদ্ধের সাহাবীদের মত ইখলাস ওয়ালা মুমিন তৈরি হওয়ার পর জিহাদ করা হবে -এটা কোন যিন্দিকের কথা হতে পারে যে, তার বিলাসিতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে জিহাদী জীবন গ্রহণ করতে চায় না। কারণ, যে এ দাবি করছে সে নিশ্চিত জানে, বদর যুদ্ধের সাহাবীদের মত ইখলাসওয়ালা মুমিন এ পৃথিবীতে আর কখনো আসবে না। সে জিহাদকে অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে সাহস পায় না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কার ইখলাস আছে কার নেই এ বিষয়ে সনদ দেয়ার যিম্মাদারী কাকে দেয়া হয়েছে? ইখলাসের সনদ নেয়ার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে? মুসলমান ও মুসলমানদের জিহাদের বিরুদ্ধে তৈরি ফাতওয়াতে স্বাক্ষর ও সমর্থন করার জন্য তো পোপ, দালাইলামা, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকান কংগ্রেস, হাউজ অব কমেন্স লন্ডন তথা জিহাদী কাফেলাগুলো ব্যতীত পৃথিবীর সকল ফেরকা ও ধর্মের লোকেরা আছে। কিন্তু ইখলাসের সনদ কে দেবে? এরাই? নাকি বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। যে বিষয়গুলো একান্ত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত সেগুলোর ব্যাপারে আমরা নাক গলানোর চেষ্টা করছি কেন?

এরপর আপত্তি করার চেষ্টা চলছে, জিহাদের নেতৃত্ব দুর্বল। এ আপত্তি করার আগে একটুও চিন্তা করার প্রয়োজন হয়নি যে, সবল নেতারা যখন জিহাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া তৈরিতে ব্যস্ত এবং কুফরী শক্তির দরবারে দৌড়ঝাঁপ করতে করতে ঘর্মাক্ত তখন এ দায়িত্ব দুর্বল নেতারা না নিলে কে নেবে? দায়িত্বটা যে ফরয!

আমি আবারো অনুরোধ করছি, বর্তমান জিহাদের কিছু খণ্ডচিত্রকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা বলে প্রচার করার আগে দয়া করে একটু বনু কুরাইজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের বর্ণনাগুলো একটু বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন, যে ঘটনায় একই দিনে শত শত ইহুদীকে হাত-পা বেঁধে জবাই করে করে গর্তে ফেলা হয়েছে। মায়েযে আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাটি আবার অধ্যয়ন করুন। তিনি একজন মুমিন ছিলেন। রাসূলে পাকের সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি একজন খাঁটি মুমিন ছিলেন। কিন্তু একটি যিনার অপারাধে তাঁকে দিন-দুপুরে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে পাথর মেরে মেরে হত্যা করে দেয়া হয়েছে। আজকের পৃথিবী এগুলোকে কি বলবে?! এখন পৃথিবী যদি এসব ঘটনাকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা বলে আখ্যায়িত করে তাহলে একজন মুমিন হিসাবে আমরা তাদের সুরে সুর মিলাব? নাকি এর যথোপযুক্ততা প্রমাণ করে মানুষদেরকে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেব। আমরা কেন বুঝতে চাই না যে, কঠোরতা ব্যতীত জিহাদের অস্তিত্ব আসতে পারে না। এ কঠোরতার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। এ কঠোরতাকে মুমিনের সিফাত বলা হয়েছে। আর নবীর উম্মত ও ওয়ারিস হিসাবে নবীর অনুসৃত এ পথের পথিকদেরক ভিন্নভাবে বিচার করার আধিকার আমরা কীভাবে পাই? আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

১১. 'এই উগ্রজঙ্গিবাদিরা মূলত ইসলাম ও মুসলমানদেরই শত্রু নয়, মানবতার শত্রু'

দু'টি বিষয় এখানে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এক. এখানে চারটি দল যথা: উগ্রজঙ্গিবাদি, জঙ্গিবাদী, মুসলমান ও মানবতাবাদি। জনাব একলক্ষ সাহেবের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে এখানে চারটি প্রকারই হবে। তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষের বিচারে এ চারটি নাম একই দলের বিভিন্ন পরিচয়। আমাদের মতে পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম আছে যা ইসলাম, আর তার ছায়াতলে যারা এসেছে তারা মুসলমান। মানবতার সকল গুণাগুণ যেহেতু আল্লাহ তাআলা এ ধর্মের মধ্যেই রেখেছেন তাই এ ধর্মের অনুসারীরাই মানবতাবাদি। এ গুণের দাবি করার মত পৃথিবীতে মুসলমান ছাড়া আর কেউ নেই। যারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকেই সৃষ্টিকর্তার হুকুম অনুযায়ী মানে না তারা

আবার মানুষ হয় কীভাবে এবং মানবতাবাদি হওয়া তাদের দ্বারা কীভাবে সম্ভব? এ মুসলমান ও মানবতাবাদি যখন জিহাদে অবতীর্ণ তখন সে জঙ্গিবাদী-জিহাদী। আর এ জঙ্গি ও জিহাদীই যখন আল্লাহর দুশমনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ভয়ংকররূপে সামনে আসে তখন সে উগ্রজঙ্গিবাদি। কুরআনে উল্লিখিত أشداء শব্দের অর্থ এভাবে না করলে এর হক আদায় হয় না।

এরই বিপরীত একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে এখানে চারটি দল রয়েছে। ১. জঙ্গিবাদি, যারা পৃথিবীব্যাপী জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২. উগ্রজঙ্গিবাদি, একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে এরা হচ্ছে বিশেষভাবে শায়খ হাসানুল বান্না রাহিমাহুল্লাহর হাতে প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। ৩. মুসলমান। ৪. মানবতা।

একলক্ষ সাহেব জঙ্গিবাদি ও উগ্রজঙ্গিবাদি বলে মূলত পৃথিবীতে চলমান প্রত্যেক স্তরের জিহাদের কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদেরকে গালি দিয়েছে। এ ফাতওয়া এবং এর মত আরো যত লেখা রয়েছে সর্ব ক্ষেত্রে বার বার একথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামের পক্ষ থেকে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীর যেখানে যত রকমের প্রতিরোধ চলছে প্রত্যেকটিই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। মোটকথা কুফরীশক্তি শাসিত এ পৃথিবীতে কোন মুসলমানের হাতে অস্ত্র দেখা যাওয়া মানেই সে সন্ত্রাসী। এ ফাতওয়ার পর যদি কাউকে মুজাহিদ বলতে হয় তাহলে তা হবে জাতিসংঘ, ন্যাটো ও ক্রসেডারদের মাধ্যমে যেসব যুদ্ধ পরিচালিত হবে সেগুলোতে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকেই মুজাহিদ বলা হবে। ইতিমধ্যে বলা শুরুও হয়ে গেছে।

এ জঙ্গিবাদি ও উগ্রজঙ্গিবাদিদেরকে বলা হয়েছে শুধু মুসলমানের শত্রু নয়, মানবতারও শত্রু। একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে মানবতা এমন এক বিষয় যা ইসলাম ও মুসলমানদের বাইরে পাওয়া যায়। নাস্তিক্যবাদের পক্ষ থেকে বর্তমানে যে শ্লোগানটি সবচাইতে বেশী মুখরোচক তা হচ্ছে মানবতার শ্লোগান। এ শ্লোগানে বার বারই বোঝানো হয় যে, ধর্ম বড় নয়, মানবতাই বড়। আরো বলা হয়, মানবতার জন্য ধর্ম, নাকি ধর্মের জন্য মানবতা?

আমাদের জানামতে ইসলামের বাইরে মানবতার কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ যারা ইসলামকে প্রত্যাখান করেছে তারা মানুষ নয়। এমতাবস্থায় কোন একটি গোষ্ঠী যদি মুসলমানের শত্রু হয় তাহলে সে আলাদা করে মানবতার শত্রু হওয়ার কোন অর্থ দাঁড়ায় না। মানবতার আলাদা অর্থ দাঁড়াবে ঐ বিশ্বাসের

ভিত্তিতে যে বিশ্বাসে ধর্মের চাইতে মানবতা অনেক ঊর্ধ্বে আর এ বিশ্বাস কোন মুসলমানের নয়।

নাস্তিকরা তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাদের সাজানো মানবতাবিরোধী প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে প্রচার করে চলেছে। কুফরীশক্তির সকল কর্মকাণ্ডকে মানবতার পক্ষে লড়াই বলে এর বিপরীত সকল প্রতিরোধকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিচ্ছে। আর এ বিশ্বাস থেকে প্রশ্নের পরবর্তী অংশটির জন্ম।

১২. 'ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, অফ্রিকার দেশসমূহ কিভাবে ছারখার হয়ে যাচ্ছে'

এ দেশগুলোতে লড়াই চলছে। সব ছারখার হয়ে যাচ্ছে। লড়াই চলছে কুফরীশক্তি ও ইসলামীশক্তির মাঝে। একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে এসব কিছুর জন্য দায়ী যারা ইসলামের নামে লড়াই করছে। কারণ তারা ইসলামের নামে করছে। আফগানিস্তানের মুজাহিদরা যদি আজ তাদের ভূখন্ড বা ভাষার জন্য লড়াই করত তাহলে তারা হত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষাশহীদ। আজ ইসলামের জন্য, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার কারণে তারা সন্ত্রাসী।

পৃথিবীর কুফরীশক্তির এমন দাবি খুবই স্বাভাবিক। আবু জাহাল-আবু লাহব থেকে বুশ-উবামা পর্যন্ত সবাই একই সুরে কথা বলবে -এতে অবাক হওয়ার কেনা কারণ নেই। এমনিভাবে যারা কুফরীশক্তির এজেন্ট হয়ে এমন প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও অবাক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু একলক্ষের কী আশা? কী ভরসা? কী লক্ষ্য? কী ভবিষ্যত?

পৃথিবীর দজ্জাল বাহিনী ইসলাম ধর্মের সুশৃংখল জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে ভূখণ্ডের দোহাই দিয়ে, ভাষার দোহাই দিয়ে, দেশীয় সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাও যদি সেটাই চায় তাহলে নিজেকে ইসলাম ধর্মের খোলসে আটকে রাখার কসরত করার কী প্রয়োজন?! নাকি তারা বলতে চায়, কুফরীশক্তি যেভাবে চায় সেভাবে করে যাক। আমাদের দায়িত্ব তাদের জন্য ফটক খুলে দিয়ে শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানানো। ইসলামের নামে প্রতিরোধ করলে এর নাম হয়ে যাবে সন্ত্রাসী। এরই বিপরীতে কেউ যদি ইসলামের নামে হামলা করত, আর আমরা ভূখণ্ড ও

ভাষার নামে তার প্রতিরোধ করতাম তাহলে আমরা হয়ে যেতাম বীর। আসলে আমরা ইসলামের শিরোনামে সংশয়মুক্ত, ঝুঁকিমুক্ত, ঝামেলামুক্ত একটি বিলাসী জীবন চাই। এ বিলাসী জীবনে যেই ব্যাঘাত ঘটাবে তারই মাথা থেতলে দেয়া চাই।

১৩. 'এই সন্ত্রাসীরা তো ধর্মের নামে আত্মদানে প্রস্তুত'

এটাই কি তাদের অপরাধ?! এরা সন্ত্রাসী হওয়ার কারণে আত্মদানে প্রস্তুত, নাকি আত্মদানে প্রস্তুত হওয়ার কারণে এরা সন্ত্রাসী? সন্ত্রাসীরা তো কখনো আত্মদানে প্রস্তুত থাকে না; বরং অপরের আত্মা হননে তারা সদা প্রস্তুত থাকে। আর যারা আত্মদানে প্রস্তুত থাকে তাদেরকে তো কেউ কখনো সন্ত্রাসী বলতে শোনা যায় না। তাহলে আমরা কি নতুন কোন পৃথিবীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি যে পৃথিবীতে এ ধরণের বিপরীত ব্যাপারগুলো ঘটতে থাকবে। সন্ত্রাসীরা নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে যাবে, যার বিনিময়ে দুনিয়াতে তাদের পাওয়ার কিছু নেই, কোন দাবি নেই। তাহলে এরা কেমন সন্ত্রাসী?

জানি না একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে এসব সন্ত্রাসী কারা। তবে পবিত্র কুরআন মাজীদে এমন কিছু আতঙ্কসৃষ্টিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায় যারা কিছু মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে, আবার তারা আত্মদানেও প্রস্তুত থাকবে, আবার তাদের জন্য জান্নাতেরও ওয়াদা আছে। তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করবে আল্লাহর দুশমনদের মনে, যারা এ আতঙ্ক সৃষ্টি করবে তারা হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ যারা জঙ্গ ও জিহাদে এবং তার প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকবে। এরা এ আতঙ্ক সৃষ্টি করবে আল্লাহরই আদেশে।

আল্লাহ তাআলা আদেশসূচক শব্দে হুকুম করছেন-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

"আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা

তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদের প্রতি যুলম করা হবে না"। -সূরা আনফাল ৬০

এ প্রস্তুতি দ্বারা ভয় পাবে আল্লাহর দুশমন শায়তানী কুফরী শক্তি। অস্ত্রে সজ্জিত প্রহরীকে দেখেতো কখনো মালিক পক্ষ ভয় পেতে পারে না। চাই তার হাতে যত ভারী অস্ত্রই থাকুক। তাকে দেখেতো ভয় পাবে চোর, ডাকাত, বদমাশ, লম্পট, বাটপার, কাফের, মুশরিক, মুরতাদ, নাস্তিক, মুনাফিক, দুনিয়ালোভী, দরবারের চাটুকার ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা এখানে শব্দ ব্যবহার করেছেন تُرْهِبُونَ যার মাসদার হচ্ছে الإرهاب, আর এ থেকেই আজ মুসলামানদেরকে গালি দেয়া হচ্ছে الإرهابيون। বা আতঙ্কবাদি বলে; অথচ এটাই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ফরয দায়িত্ব। অতএব আত্মদানে প্রস্তুত যেসব সন্ত্রাসী (?) তাদের চেতনাকে যদি বাস্তবিকভাবে কুরআনের আলোকেই জাগিয়ে তোলা হয় তাহলে তারা আরো অনেক সচেতন হয়ে উঠবে। ফরয দায়িত্ব পালনে আরো বেশি তৎপর হয়ে উঠবে। কারণ ধর্মের নামে আত্মদানের জন্য এর চাইতে উত্তম ক্ষেত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল আর কোথাও রাখেননি। আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জন্য আত্মবিসর্জনের জযবা যুবকদেরকে আরো বাড়িয়ে দিন। যদিও এর কারণে কুফরীশক্তি আরো রেগে যাবে-

كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

"একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন"। -সূরা ফাতহ ২৯

শত্রুদের দেয়া এসব গালি খেয়ে কাবু না হয়ে শরীয়তের আলোকে দায়িত্ব কি তা বুঝে নেয়াই একজন বুদ্ধিমান মুসলমানের কাজ হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মিলে যখন শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে তখন কুফরীশক্তি এ নিয়ে বহু ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। তাই বলে কি রাসূলের নির্দেশিত এ ওয়াজিব আমল আমরা ছেড়ে দেব? হাজারে আসওয়াদের মত একটি নিথর পাথরকে চুম্বন

করার জন্য যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে তখন বস্তুবাদী নাস্তিকরা যদি এ নিয়ে যুক্তিবাদী মন্তব্য শুরু করে তখন কি আমরা ঘাবড়ে যাব? কুরবানীর দিন লক্ষ লক্ষ পশু জবাইয়ের দৃশ্য দেখে যখন আল্লাহর দুশমনরা চোখে পিঁয়াজের রস লাগিয়ে কান্না শুরু করে তখন কি আমরা তাদের সঙ্গে কাঁদতে শুরু করব? একজন যিনাকার ও লম্পটের উপর শাস্তি বিধান করতে গেলে যদি আল্লাহর কোন দুশমনের মানবতাবোধ জেগে উঠে তাহলে কি আমরা তার এ অভিনয়ে গলে যাব?

এভাবে আল্লাহর প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রেই একজন মুসলমান তার কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি করবে শরীয়তের নির্দেশনা আনুযায়ী। জগতের মানুষ কি বলছে, কি ভাবছে তার প্রতি কতক্ষণ খেয়াল রাখা যাবে? মানুষ মনে কষ্ট নেবে, খারাপ ধারণা করবে, বদনাম দেবে এসব ভেবে যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত শুরু করতেন এবং প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন শুরু করতেন তাহলে কি তা কখনো সম্ভব হত? আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে"। -সূরা নূর ২

১৪. 'ইসলামের সঠিক ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা তুলে ধরে'

সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরলে কি প্রমাণিত হবে?

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

(তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। সূরা বাকারা ২১৬)।

আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা করলে কি জিহাদ করা হারাম প্রমাণিত হবে? মুজাহিদরা জঙ্গি, আর জঙ্গিরা সন্ত্রাসী প্রমাণিত হবে? বর্তমানে কারো উপর জিহাদ করা ফরয নয় প্রমাণিত হবে? জিহাদ এক সময় ফরয ছিল পরে তা মানসূখ-রহিত হয়ে গেছে প্রমাণিত হবে?

হাদীসে পাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যতো একেবারে সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, "আমার উম্মতের একটি কাফেলা কেয়ামত পর্যন্ত বরাবর সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করে যাবে এক পর্যায়ে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন"। বিভিন্ন বর্ণনায় হাদীসের বিস্তারিত বক্তব্য নিম্নরূপ-

أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. (صحيح مسلم، النسخة الهندية ١/ ٨٧).

وأخرج الإمام مسلم أيضا عن يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان ذكر حديثا رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم -لم أسمعه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة». (٢/ ١٤٤،١٤٣).

وأخرج أيضا عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ». (صحيح مسلم ١/ ٨٧).

وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لايضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك". (صحيح مسلم -النسخة الهندية- ٢/ ١٤٤).

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله عز وجل هذه الأمة". (مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث ١٥١٢٧، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم").

وأخرج أيضا عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة" (مسند أحمد بن حنبل ٢٨/ ٦٢ رقم الحديث ١٦٨٤٩، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم").

وأخرج الإمام النسائي عن سلمة بن نفيل الكندي قال: "كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح، وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله". (سنن النسائي -النسخة الهندية- ٢/ ١٠٤).

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ» (سنن أبي داوُد، باب دوام الجهاد).

হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীসবিদগণের বক্তব্যও স্পষ্ট। ইমাম বুখারী, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম তীবী, মোল্লা আলি কারী, আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুমুল্লাহসহ প্রায় সকল মুহাদ্দিসের অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে, এ হাদীস থেকে বোঝা যায় জিহাদ কখনো বন্ধ হবে না। তাঁদের বক্তব্যগুলো তাদের ইবারতে বিস্তারিত দেখুন-

أقوال العلماء في شرح هذه الأحاديث

قال العلامة الخطابي: قلت: فيه بيان أن الجهاد لا تنقطع أبدا. (معالم السنن، ٢/ ٢٣٦، كتاب الجهاد، باب دوام الجهاد. طبعة راغب الطباخ ٣/ ١٠، دار إبن حزم).

قال العلامة الطيبي: "((يقاتل عليه)) جملة مستأنفة بيانا للجملة الأولي، وعداه بـ ((على)) لتضمينه معنى يظاهر، أي يظاهرون بالمقاتلة على أعداء الدين، يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة. وما أظن هذه العصابة إلا الفئة المنصورة بالشام والمغرب. ((مح)): ورد في الحديث: ((لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)) قيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك، وفيه معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله تعالى". (الكاشف عن حقائق السنن، كتاب الجهاد، ص: ٢٦٣٢، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة).

وقال أيضا قوله: "((يقاتل آخرهم المسيح الدجال)) أي لا تنقطع تلك الطائفة المنصورة، بل تبقى إلي أن يقاتل آخرهم الدجال. أي إلي قيام الساعة؛ فإن خروج

الدجال من أشراط الساعة. ويمكن أن يراد بالآخر عيسى بن مريم ومن تابعه؛ فإنه عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهزودتين، ((فيطلبه)) أي الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله". (الكاشف عن حقائق السنن، كتاب الجهاد، ص: ٢٦٤٤، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة).

قال الإمام البخاري (باب الجهاد ماض مع البر والفاجر) (لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود إلخ)

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث "وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون وهو مثل الحديث الآخر "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق" الحديث. (فتح الباري ٦/ ٥٦، المكتبة السلفية ودار المعرفة بيروت، لبنان).

قال العلامة المناوي في شرح حديث لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ "(يقاتل عليه) جملة مستأنفة بيانا للجملة الأولى وعداه بعلى لتضمنه معنى يظاهر (عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة) يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة وفيه بشارة بظهور أمر هذه الأمة على سائر الأمم إلى قيام الساعة". (فيض القدير ٥/ ٣٠١، دار المعرفة بيروت، لبنان).

قال العلامة الملا علي القاري في شرح هذا الحديث "لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه بفتح فضم قال قال رسول الله لن يبرح أي لا يزال هذا الدين قائما يقاتل بالتذكير ويجوز تأنيثه أي يجاهد عليه أي على الدين عصابة بكسر أوله أي جماعة من المسلمين والمعنى لا يخلو وجه الأرض من الجهاد إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى حتى

تقوم الساعة أي يقرب قيامها". (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٧/ ٣٣٤، كتاب الجهاد، رقم الحديث: ٣٨٠١).

قال العلامة أنور شاه الكشميري في شرح حديث البخاري "لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق": (ولن تزال ... إلخ) واختلف في تعيين مصداقه، وكلٌّ ادّعى بما بدا له. قلت: كيف مع أنه منصوصٌ في الحديث، وهم المجاهدون في سبيل الله؟ وقال أيضا بعد سطور ومعنى قوله: (ولن تزال): أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق لا أنهم يكثرون في كل زمان". (فيض الباري ١/ ١٧٢،١٧١ المكتبة الأشرفية بديوبند).

وقال أيضا: وقد مرَّ في العِلْم: أن الطائفةَ التي تبقى ظاهرةً على الحقِّ إلى يوم القيامة، هي طائفةُ المجاهدين، حتى يَنْزِلَ المسيحُ ابنُ مريم، فيجاهد في سبيلِ الله. (فيض الباري ٣/ ٤٣٠، المكتبة الأشرفية بديوبند).

প্রশ্ন হচ্ছে মুহাদ্দিসীনের কেরামতো হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন। এখন এ এক লক্ষ সাহেবদের মতে এ হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা করলে কী প্রমাণিত হবে? পৃথিবীতে যতগুলো জিহাদী কাফেলা কাজ করছে তারা সবাই ইসলামের শত্রু হিসাবে প্রমাণিত হবে? যে কাফেলাটি সর্বদা হকের পক্ষে যুদ্ধ করে যাবে বলে হাদীসে রয়েছে সে কাফেলাটি পৃথিবীর কোথাও নেই প্রমাণিত হবে? সে কাফেলাটি খুঁজে বের করা আমাদের দায়িত্ব নয় প্রমাণিত হবে? নাকি এরকম কোন কাফেলা না থাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি (নাউযুবিল্লাহ) অবাস্তব প্রমাণিত হবে? এ হাদীসের সাঠিক ব্যাখ্যা করলে কি এ কথা প্রমাণিত হবে যে, এ কাফেলাটি কে এবং এ দায়িত্ব কার তা আমাদের ভাবার বিষয় নয়?

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. (١٩٣)

"আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই"। -সূরা বাকারা ১৯৩

এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করলে কী প্রমাণিত হবে? সকল মুফাসসির বলেছেন এখানে 'ফিতনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শিরক'। 'শিরকের অপনোদন পর্যন্ত জিহাদ করার হুকুম রয়েছে' বললে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হবে? নাকি 'শিরক-কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদ করলে ফিতনা হবে' বললে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হবে?

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয়"। -সূরা তাওবা ২৯

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি বলা হয়, ইসলাম যারা গ্রহণ করবে না তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গ-জিহাদ চলতেই থাকবে যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়তো নিজেদের হীনতার স্বীকৃতির সাথে অমুসলিম হওয়ার অপরাধে মুসলমানদেরকে কর দিয়ে চলবে। -এ ব্যাখ্যা সঠিক হবে? নাকি যদি বলা হয়, অমুসলিমদের সঙ্গে সাম্যের গান গেয়ে সমঅধিকারের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এ ব্যাখ্যা সঠিক হবে? তাফসীরবিদগণ কি বলেন এবং মুজতাহিদগণ কি বলেন?

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন"। -সূরা ফাতহ ২৯

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

(سورة التوبة ٨٤)

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান"। -সূরা তাওবা ৭৩ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. (سورة التوبة ١٢٣).

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"। -সূরা তাওবা ১২৩

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, তোমাদের সাথে এবং

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন"। -সূরা মুমতাহিনাহ ৪

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. (١١٤)

"নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল"। -সূরা তাওবা ১১৪

এ আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা করলে কী অর্থ দাঁড়াবে? সঠিক ব্যাখ্যা করে কি এ কথা প্রমাণ করা যাবে যে, ইহুদী-খৃস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-নাস্তিক-মুরতাদ সবার সঙ্গে মুহাব্বত-ভালোবাসা-সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সম্পর্ক রাখতে হবে? আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে শত্রুতা-কঠোরতা-বিদ্বেষ থাকতে হবে -এ কথা কি আয়াতগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করলে প্রমাণিত হয়?!

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. (٤)

"অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়[১]। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা

---

[১] অর্থ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া।

আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না"। -সূরা মুহাম্মদ ৪

সঠিক ব্যাখ্যা করলে এ আয়াত থেকে কী হুকুম বের হয়?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. (سورة التوبة ٢٣-٢٤).

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না"। -সূরা তাওবা ২৩-২৪

এ আয়াতদু'টির সঠিক ব্যাখ্যা কি?
তাফসীর ও ফিকহের কিতাবাদিতে এগুলোর ব্যাখ্যা কি এসেছে?
ঈমানের জন্য সব কিছুকে কুরবান করতে বলা হয়েছে?
নাকি সব কিছুর জন্য ঈমানকে কুরবান করতে বলা হয়েছে? সব কিছুর জন্য জিহাদকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে না কি জিহাদের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে?

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (٢٢)

"যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে তুমি পাবে না এমন জাতিকে তাদেরকে পাবে না এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বন্ধু হিসাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে, যদি সেই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয় তবুও। এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরা হল আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফল কাম''। -সূরা মুজাদালাহ ২২

এ আয়াতের সাঠিক ব্যাখ্যা কী? আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঈমানের পরিচায়ক? নাকি তার সঙ্গে শত্রুতা ঈমানের পরিচায়ক? আল্লাহর দুশমন কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-সম্প্রীতি ঈমানের পরিচায়ক? নাকি তাদের সঙ্গে বিদ্বেষ ঈমানের পরিচায়ক? আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করলে আমাদেরকে কী করতে বলা হবে?

আমাদের অনুরোধ, ইসলামের সঠিক ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা তুলে ধরুন। শরীয়তের উসূলের আলোকে তুলে ধরুন। আয়াত ও হাদীসের সঠিক অনুবাদটা তুলে ধরুন। তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যা মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে গ্রহণ করুন। ফিকহে হানাফীর একজন মুকাল্লিদ হিসাবে ফিকহে হানাফীর কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরুন।

ব্যক্তিবিশেষের বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে উসূলে শরীয়তের কথা মনে রাখুন। পরিবেশ পরিস্থিতি দিয়ে শ্রোতাদেরকে ঘাবড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সীরাত ও তারীখের পৃষ্ঠাগুলো স্মরণ করুন। ইজমা ও ঐক্যমতের দাবি করার সময় সারা বিশ্বের কথা সামনে রাখুন। একটি আমল দিয়ে আরেকটি ফরয আমলের দায়িত্ব সেরে ফেলার ভয়ংকর ভুল থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। ইট দিয়ে বালুর কাজ, বালু দিয়ে সিমেন্টের কাজ, সিমেন্ট দিয়ে রঙের কাজ সেরে ফেলার পথ পরিহার করুন। ভাল কোন কাজ করতে সাহস না হলে নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য ঐ কাজের বিরোধিতা করাকে জরুরী মনে করা থেকে বিরত থাকুন।

ইসলামের পক্ষে জিহাদের নামে যারা লড়ে যাচ্ছেন তাঁরা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে প্রমাণ করতে গিয়ে আয়াত ও হাদীসের যেসব ভয়ংকর সঠিক ব্যাখ্যাগুলো (?) সামনে আসছে সেগুলোর বিষয়ে প্রস্তুত থাকুন। ইতিমধ্যে হাদীসের বিভিন্ন দরসগাহ থেকে, তাফসীরের দরসগাহ থেকে, খানকাহের ইসলাহী বয়ান থেকে, তাবলীগের জরুরী জরুরী বয়ান থেকে যেসব সঠিক? ব্যাখ্যা প্রচারিত হচ্ছে তার কিছু নমুনা এখানে তুলে দিলে আশা করি ভাবতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। **সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একটি বইয়ে উল্লেখিত কিছু সঠিক ব্যাখ্যার (?) নমুনা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-**

?- **الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ** এর সঠিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এখানে **السُّيُوفِ** অর্থ ঢাল, আর ঢাল দ্বারা উদ্দেশ্য প্রতিরোধ। এ প্রতিরোধ দাওয়াত, তাবলীগ, তাযকিয়া দ্বারাও হতে পারে। তালেবুল ইলমারা প্রশ্ন করল, **السُّيُوفِ** এর অর্থ ঢাল হবে কেন? ঢালের জন্য তো হাদীসে ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তর দেয়া হয়েছে, গর্ধভ কাঁহিকে! হাকীকত-মাজায বোঝ না? আরবী ভাষায় হাকীকত মাজাযের ব্যবহার খুব ব্যাপক।

?- মেশকাতের কিতাবুল জিহাদ পড়াবেন। পৃষ্ঠা খুলে কিতাবুল জিহাদের শত শত হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করে তাকরীর শুরু করেছেন এভাবে- এখানে জিহাদ সম্পর্কিত যত হাদীস পড়বে এসব হচ্ছে ছোট জিহাদ। বড় জিহাদ হচ্ছে মনের জিহাদ। আমাদের বড় জিহাদেরই খবর নেই, আমরা ছোট জিহাদ নিয়ে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছি।

?- **لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة** হাদীসের উপর তাকরীর করতে গিয়ে মুহাদ্দিস সাহেব বলেছেন, এখানে 'কিতাল' 'জিহাদ' এর অর্থে। আর জিহাদ ব্যাপক বিষয়, তাই এখানে কিতাল দ্বারা দাওয়াত, তাবলীগ, তাযকিয়া, তালীম উদ্দেশ্য হবে।

?- وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) সম্পর্কে আলোচনা আসলে মুহাদ্দিস সাহেব বলেন, এখন কেউ জিহাদের প্রস্তুতি নিলে শিরকী গুনাহ হবে। মাত্রা একটু

কমিয়ে বললেন, কবীরা গুনাহ হবে। তালিবুল ইলমরা জিজ্ঞেস করল, কিতাবুল্লাহর আদেশমূলক হুকুমের উপর আমল করলে শিরকী গুনাহ বা কবীরা গুনাহ হবে কেন? উত্তরে বলা হয়েছে, এ প্রস্তুতি তাওয়াক্কুলের খেলাফ।

?- এক শায়খুল কুল ফিল কুল উপরোল্লিখিত আয়াতের উপর আমলের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে জিহাদ করতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের মত জান-মাল কুরবান করে দিতে হবে। কিন্তু এখন যেহেতু আমাদের শক্তি নেই তাই আমাদেরকে এখন প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি কিভাবে নেব? দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া বাড়িয়ে দিতে হবে। তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধায় পেঁচানো মুহুর্মুহু সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে, খেয়াল করারই সুযোগ পাননি আয়াতে সে প্রস্তুতির বিবরণ দেয়া আছে। বলা হয়েছে مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ যা দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়ার বিষয় নয়। হাদীসে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

(١٩١٧) حدثنا هارون بن معروف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي علي ثمامة بن شفي، أنه سمع عقبة بن عامر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يقول: "[وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة] ﴿الأنفال: ٦٠﴾، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي". (صحيح مسلم).

কিন্তু এর বিচার করবে কে? বিচারকরা তো অপরাধ করার দায়িত্বে আছেন। দয়া করে সঠিক ব্যাখ্যা দিন। সঠিক ব্যাখ্যা দিলে যদি এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে এখন থেকে আর কখনো জিহাদ হবে না। জিহাদের নামে যা কিছু হবে সবই সন্ত্রাস হবে এবং কুরআনে, হাদীসে, সীরাতে, ইতিহাসে যত জিহাদের কথা আছে তার সবই হচ্ছে মূলত দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া যার মধ্যে কোন মারামারি নেই, রক্তপাত নেই, কঠোরতা নেই। যদি এমনই হয় সঠিক ব্যাখ্যা তাহলে লুকোচুরি না খেলে বলে দিলেই হয়। একলক্ষ সাহেবের প্রধানমন্ত্রী তো আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না (?!), একলক্ষ সাহেব কেন মানুষকে ভয় পাচ্ছে।

১৫. 'মুসলিম সমাজে ফাতওয়া অর্থাৎ'

ইসলামের ইতিহাসে এ সর্বপ্রথম ফাতওয়া পরিভাষাটি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল। যে ফাতওয়ার পক্ষে সমর্থন দিয়েছে বিশ্ব খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান পোপ, ইহুদী-খৃস্টান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংগঠন জাতিসংঘ, আমেরিকান কংগ্রেস, হাউস অব কমেন্স লন্ডন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ বিশ্বের প্রায় সকল কুফরিশক্তি এবং কুফরীশক্তির দালাল ও এজেন্ট হিসাবে প্রসিদ্ধ সকল দল ও গোষ্ঠী।

পৃথিবীর সকল কুফরী শক্তি যে ফাতওয়ার পক্ষে সে ফাতওয়া মুসলিম সমাজের ফাতওয়া হওয়ার যৌক্তিক কারণ কী? যে ফাতওয়ার প্রস্তাবক কুফরীশক্তি, পরামর্শদাতা কুফরীশক্তি, সহযোগিতা দানকারী কুফরীশক্তি সে ফাতওয়া কেন মুসলিম সমাজের ফাতওয়া? যে ফাতওয়ায় ইসলামের একটি স্বীকৃত মৌলিক বিধানের প্রয়োগকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করা হয়েছে সে ফাতওয়া কীভাবে মুসলিম সমাজের ফাতওয়া হতে পারে?

যে ফাতওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছরের ধারাবাহিক জিহাদী জীবনকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, খোলাফায়ে রাশেদীনের পৃথিবী বিজয়ের হাজার হাজার জিহাদী কর্মকাণ্ডকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যে ফাতওয়ায় ইসলামের ইতিহাসের হাজার হাজার জিহাদী কাফেলার কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হয়েছে সে ফাতওয়া কেন মুসলিম সমাজের ফাতওয়া হয়ে গেল? সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসের এ জিহাদের অভিযানগুলো কি মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি? আর সে অভিযানগুলো কি এ জন্যই হয়নি যে, তারা অমুসলিম ছিল? জিহাদের সে অভিযানগুলো কঠোরতার সাথে হয়েছিল? নাকি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সাথে হয়েছিল? অমুসলিমদেরকে হত্যা না করে সীরাত ও ইতিহাসে কোন্ কোন্ জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল?

প্রকাশ্য হামলার পরিবর্তে অতর্কিত হামলার ঘটনা কি জিহাদের ইতিহাসে নেই? ইসলামের কোন শত্রুকে এককভাবে হত্যা করার ইতিহাস কি জিহাদের ইতিহাসে নেই? যে সব হামলায় হামলাকারীর মৃত্যু নিশ্চিত এমন হামলা করার ঘটনা কি জিহাদের ইতিহাসে নেই? জান্নাতের হুর-গেলমানের আশায়

আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার আগ্রহ নিয়ে যুবকরা দুশমনের উপর হামলা করেছে -এমন ঘটনা কি ইসলামী জিহাদের ইতিহাসে নেই? দুশমনকে হত্যা করতে গিয়ে নিরীহ মানুষও হত্যার শিকার হয়েছে এমন ঘটনা জিহাদের ইতিহাসে নেই? দুশমন যদি কোন মুসলমানকে ঢাল বানিয়ে সামনে বাড়ে তখন নিরুপায় হলে সে মুসলমান মারা যাওয়ার প্রবল ধারণা থাকলেও দুশমনের উপর হামলা করার অনুমতি কি ফিকহের কিতাবাদিতে দেয়া হয়নি?

তাহলে আজ যখন পৃথিবীর সকল জিহাদী কাফেলাগুলোর বিরুদ্ধে ফাতওয়া দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে বর্বর, নিষ্ঠুর, হিংস্র বলা হচ্ছে তখন তাদের এ কর্মকাণ্ডগুলোকে জিহাদের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কি কোন প্রয়োজন নেই? যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে এ ফাতওয়া জিহাদের বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে এ কথা বললে, এ কথার ভুল অংশটি কোনটি? আর মিলিয়ে দেখার পর যদি জিহাদের ইতিহাসের সঙ্গে তা মিলে যায় তাহলে এ ফাতওয়ার মাধ্যমে জিহাদকে অস্বীকার করা হয়েছে এ কথা কেন বলা হবে না? আর যদি মিলিয়ে দেখার পর দু'চারটি বিষয়ে ব্যতিক্রম মনে হয়, একজন মুসলমান হিসাবে আমরা এর বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব? না কি ইসলামের অন্যান্য বিভাগে যেমন আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে ঠিক এ বিভাগেও কর্মীদের কিছু ভুল থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুপরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু তা না করে যদি ইসলামের একটি মুহকাম বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া হয় এবং ফাতওয়ার মাধ্যমে এ ফরয আমল থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় এবং সে ক্ষেত্রে আল্লাহর দুশমনদের সহযোগিতা নেয়া হয় তাহলে একে মুসলিম সমাজের ফাতওয়া বলা এবং জিহাদ বিরোধী না বলার কি সুযোগ থাকতে পারে? এ ফাতওয়ার আয়োজকরা এ ফাতওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, ইসলামী জিহাদের নামে পৃথিবীতে যা কিছু চলছে সব সন্ত্রাস। বর্তমান পৃথিবীতে জিহাদের কোন ক্ষেত্র নেই। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যত রকমের হামলা চলছে সেসকল হামলাকে সহযোগিতা করা এবং দলিল-প্রমাণ দিয়ে শক্তিশালী করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। বর্তমানে জিহাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের অবস্থান গ্রহণ করা হচ্ছে ইবাদত। এমতাবস্থায় এ ফাতওয়া জিহাদ বিরোধী ফাতওয়া নয় বলার ব্যবস্থা কি?

১৬. 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিমদের কঠিন অবস্থান'

সন্ত্রাসের বিরদ্ধে অবস্থানের আগে সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটি সামনে আসা দরকার। এমনিভাবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার আগে জঙ্গিবাদেরও সংজ্ঞা সামনে আসা দরকার। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যত মানুষ সোচ্চার তাদের কারো কাছেই সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটি স্পষ্ট হওয়া দরকার যাতে করে এর বিরুদ্ধে ইসলাম সুস্পষ্টভাবে দলিলভিত্তিক অবস্থান গ্রহণ করতে পারে।

সন্ত্রাস

মালিকের বা স্বত্বাধিকারীর মালিকানাধীন সম্পদ যদি মালিকের কোন গোলাম/দাস চুরি করতে আসে, ডাকাতি করে নিয়ে যেতে আসে, জবরদখল করতে আসে, আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, মালিককে ব্যবহার করতে বাধা দেয়, মালিকের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, মালিকের অধিকারকে খর্ব করতে চায়, মালিকের সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজের আইন চাপিয়ে দিতে চায়, মালিকের হুকুমকে অমান্য করে চলে এবং অমান্য করার সকল আয়োজন করে চলে সে অবাধ্য চোর, ডাকাত, লম্পট, গুন্ডা, বদমাশ গোলামকে বলা হয় সন্ত্রাসী এবং তার সকল কর্মকাণ্ডকে বলা হয় সন্ত্রাস।

আজকের পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর পরিচয় যখন অস্পষ্ট তখন আমরা এর পরিচয়ের জন্য অন্তত একটি বিষয়ের উপর একমত হতে পারি যে, মানুষ ও এ পৃথিবীসহ পুরা বিশ্বজগতের প্রতিটি অনু পরমানুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ملكا وخلقا وعبيدا وحكما সৃষ্টি তাঁর, মালিকানা তঁর, হুকুম তাঁর এবং সবাই তাঁর গোলাম। অতএব তাঁর আদেশ-নিষেধের সীমানা থেকে যে যত ডিগ্রি দূরত্বে অবস্থান করবে সে তত ডিগ্রি অনুপাতে সন্ত্রাসী।

এতটুকু বিষয়ে যখন আমরা একমত হলাম এবং একমত না হওয়ার কোন সুযোগও নেই তখন সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর প্রয়োগক্ষেত্র খুঁজে পেতে আশা করি বেগ পেতে হবে না। আমরা অনায়াসেই বলতে পারি ধারা পরাম্পরায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে সন্ত্রাসীর তালিকায় স্থান পাবে যথাক্রমে: ১. নাস্তিক যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। ২. যারা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিটি মানুষকে শরিক করে যেমন গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী। ৩. যারা প্রতিটি

উপকারী বস্তুকে ভগবান বলতে আনন্দ পায় যেমন হিন্দু ও তাদের মত বিভিন্ন গোষ্ঠী। ৪. যারা আল্লাহর সঙ্গে তেত্রিশ কোটিকে শরিক করে যেমন হিন্দু মুশরিক গোষ্ঠী। ৫. যারা আল্লাহর সঙ্গে তিন শত ষাট মূর্তিকে শরিক করে যেমন আদি মুশরিক গোষ্ঠী। ৬. যারা আল্লাহর সঙ্গে এক দু'জনকে শরিক করে যেমন ইহুদী-খৃস্টান। ৭. যারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের পথে বাধা যেমন নির্বাহী শক্তি। ৮. যারা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মত কুফরী মতবাদের প্রহরী যেমন আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনী। ৯. যারা তাগুতী শক্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগী যেমন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরক্ষতাবাদে সমর্থনকারী জনগণ। ১০. কোন না কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘনকারী এবং তার পক্ষোবলম্ভনকারী। অন্য শব্দে বলা যায় ইসলাম ও ইসলামের যে কোন বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী, যে কোন পর্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী হল সন্ত্রাসী।

এ সংজ্ঞা হিসাবে একজন মুসলমান ইসলামের নামে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যে জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করবে? নাকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফরী শক্তির পক্ষ থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করবে? কুফরী শক্তির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কী করণীয় সে বিষয়ক কোন ফাতওয়ার কথাও মাথায় আসতে পারত। দুঃখের বিষয়, তা মাথায় আসেনি। কেন আসেনি একটু তলিয়ে দেখা দরকার। নাকি কুফরী শক্তির কোন সন্ত্রাসকেই সন্ত্রাস বলার বৈধতা নেই।

১৭. 'আইজিপি এ. কে. এম. শহীদুল হকের সভাপতিত্বে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে'

বিষয়বস্তু হচ্ছে ফাতওয়া। মাসআলা হচ্ছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন 'জিহাদ'। উপস্থিত সদস্যরা হলেন ওলামায়ে কেরাম। সভাপতি পুলিশের আইজিপি, যে লেনিন-কালমার্কসের কমিউনিজম-সমাজতন্ত্র, রুশো ভোল্টায়ারের ধর্মনিরপেক্ষতা, আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র ও আইয়ামে জাহেলিয়্যাতের জাতীয়তাবাদের প্রধান রক্ষক। ইসলামের আলোকে কোন বিধান প্রতিষ্ঠার দাবি করতে গেলে তার প্রতিরোধ করা যার দায়িত্ব -সে হচ্ছে ফাতওয়া বিষয়ক আলোচনার সভাপতি। স্থান পুলিশ হেড কোয়ার্টার। কুফরী সংবিধানের রক্ষক বাহিনীর বেষ্টনীতে চলছে জিহাদ বিষয়ক ফাতওয়ার পরামর্শ।

আমাদের জানামতে পুলিশের একজন থানাপ্রধান পর্যন্ত বিশ্ব কুফরীশক্তির সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকে। পুলিশের প্রথম সারির অফিসাররা কিছু দিন পরপরই বিদেশ সফর করে এবং কুফরী সংবিধান রক্ষা করার সকল কলা-কৌশল রপ্ত করে আসে। একজন পুলিশ অফিসার তখনই আইজি ও ডিআইজি পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে যখন কুফরী সংবিধান রক্ষা করতে পারবে বলে বিশ্ব কুফরীশক্তির কাছে সে মুচলেকা দিতে পারে এবং কুফরী শক্তিও তার উপর আস্থাশীল হতে পারে।

দ্বীনের ধারকবাহক হওয়ার একজন দাবিদার মুসলমানদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে ফাতওয়ার জন্য প্রস্তাব পেশ করছেন কুফরী বিধান রক্ষকদের প্রধানের কাছে। এমন লজ্জাজনক পরিস্থিতি দেখার জন্যও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে? তাহলে ফাতওয়ার এ আয়োজকরা আসলে কী করতে চায়, তা কি বোঝা খুব কঠিন?

১৮. 'একলক্ষ আলিম, মুফতি ও ইমামগণের ফতোয়া'

যে দেশে মুস্তাফতীর চাইতে মুফতী বেশি, রোগীর চাইতে ডাক্তার বেশি সে দেশে গায়রে মুফতী ও অর্ধশিক্ষিত ইমামদের স্বাক্ষরে একটি স্পর্শকাতর গবেষণামূলক আন্তর্জাতিক বিষয়ে এক লক্ষ স্বাক্ষর তড়িঘড়ি জোগাড় করার প্রয়োজন কেন হল?

১৯. 'এতে নাম, মোবাইল নম্বর ও দস্তখত এই তিনটি ঘর রাখা হয়েছে'

স্বাক্ষরদাতাদেরকে এভাবে গোপন রাখার রহস্য কি? এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পর নিজেকে আড়াল করে নেয়ার তো কোন যৌক্তিক কারণ নেই। সংক্ষিপ্ত একটি ঠিকানার জন্য কতটুকু জায়গাই আর খরচ হত? নাকি জালিয়াতি ধরা পড়ে যাওয়ার এতটুকু ভয় এখনো আছে?

২০. 'মহিলাগণের মাঝেও বিপুলসংখ্যক আলিম মুফতীর আবির্ভাব ঘটেছে'

দেশে মহিলাদের জন্য এখনো ফিকহ ও ফাতওয়া বিভাগ খোলা হয়নি। এরপরও দশ হাজারের বেশি মহিলা মুফতীর আবির্ভাব আসলেই একটি অলৌকিক ব্যাপার! এরকম আরো দু'চারটি ফাতওয়ার স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করা

গেলে সারা দেশ মুফতীতে ভরে যেত। এক সময় মুফতী হলে পরে ফাতওয়ায় দস্তখত করত। এখন কোন ফাতওয়ায় দস্তখত করলে সে মুফতী হয়ে যায়। আসলে ইলমের যে দুর্ভিক্ষ চলছে তাতে এ ধরনের মুফতী তৈরীর ডিজিটাল কারখানার কোন বিকল্প নেই।

২১. 'বর্তমান বিশ্বে এটা একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়া সংযোজন'

একটা নয়, অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোজন।
এক. ফাতওয়া বিষয়ক কোন প্রকার পড়াশোনা ছাড়া মুফতী হতে পারা!
দুই. পুরুষদের এক হাজার ফাতওয়া বিভাগ থেকে এক হাজার মুফতী খুঁজে পাওয়া যখন দুষ্কর ব্যাপার, তখন ফাতওয়া বিভাগ ছাড়াই দশ হাজার মহিলা মুফতীর উপস্থিতি!
তিন. যে দেশের মহিলারা পাঁচ ছয় বছরে ইলমের পুরা কোর্স শেষ করে ফেলে সে দেশের সে মহিলারা আন্তর্জাতিক বিষয়ে ফাতওয়া দেয়ার মত যোগ্য হয়ে গেছে!
চার. যে দেশের অধিকাংশ মহিলারা দাওরা পাশ করার পর এখনো আরবী এবারত শুদ্ধ করে পড়া শিখেনি সে দেশের সে মহিলারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাদের ব্যাপারে ফাতওয়া দিতে পারছে।
পাঁচ. যে দেশের মহিলারা 'ইকরা'র পাঁচ বছর পূর্ণ করেছে তারা এখনই ফাতাওয়া শামী, আলমগীরীর আলোকে ফতোয়া দিতে পারছে।
এ বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রত্যেকটিই এমন যা নয়া সংযোজন (বিদআত) হয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (প্রত্যাখ্যাত) হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনটিই অলৌকিক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। খিজির আলাইহিস সালাম ও তাঁর উম্মতের দ্বারা এটা সম্ভব হলেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দ্বারা তা সম্ভব নয়। কারণ এ উম্মতের জন্য কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের বাইরে গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়, বৈধ নয়।

২২. 'দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত, মঈনুল ইসলাম...ফতোয়া সংগ্রহ করে'

দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, চরমোনাই জামিয়া রশীদিয়া ইসলামিয়া, শায়খ যাকারিয়া রিসার্চ সেন্টারসহ আরো যে সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ফাতওয়া সংগ্রহ করা

হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে কয়েক স্তরে দাজ্জালী করা হয়েছে। সে দাজ্জালীগুলোর মধ্যে যেগুলো আমাদের হাতে ধরা পড়েছে তার ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরছি-

এক. ইস্তেফতার ইবারতের মধ্যে স্ববিরোধী কথা দিয়ে অস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক কার বিরুদ্ধে ফতোয়া চাওয়া হয়েছে তা ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে ইস্তিফতা হুবহু তুলে ধরা হচ্ছে এবং তার দাজ্জালীগুলোও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ইস্তেফতার ব্যাখ্যা বিষয়ে আদনান মারূফ নামের একজন গবেষকের লেখা আমাদের হাতে এসেছে। সে লেখাটি এখানে ঈষৎ পরিবর্তনসহ তুলে দেয়া উপযুক্ত হবে বলে মনে হচ্ছে।

একটি ইস্তেফতা পর্যালোচনা

-আদনান মা'রুফ

ফেদায়ে মিল্লাত সাইয়েদ আসআদ মাদানী রহ.-এর পুত্র মাওলানা মাহমুদ মাদানী দা. বা.-এর একটি ইস্তেফতা [ফতোয়া চেয়ে প্রশ্ন] বাংলা অনুবাদসহ দেশের বহু দারুল ইফতার মতো আমাদের মাদরাসার দারুল ইফতায়ও পাঠানো হয়েছে। বাংলা ইস্তেফতাটিকে অবশ্য 'অনুবাদ' বলা হয়নি। বাংলা ভাষার মুস্তাফতী [প্রশ্নকারী] হিসেবে নাম রয়েছে 'মুহাম্মদ আবদুর রহীম'। ঠিকানা দেয়া হয়েছে এভাবে– 'খতীব, ইসলামবাগ জামে মসজিদ। ইসলামবাগ, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। মুহতামিম, তাকওয়া মাদরাসা, রামপুরা'। তিনি ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের ইকরা মাদরাসার উস্তাদ। আমি প্রথমে মাহমুদ মাদানী সাহেবের মূল ইস্তেফতাটি উল্লেখ করছি–

آج کل منصوبہ بند طریقہ پر مذہب اسلام، قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات کو دہشت گری سے جوڑ کبدنا کیا جارہاہے اور قرنی آیا ت ایہ یفشو غلط معنی
میں ڈ ھال کر عوام وخوا کو مذہب اسلام سے ظن کرنے کی مھم پو شلات سے جاہے س
ل ئے حضفر یکا کہ من لم کہ سلسلہ میں اسلام ہے اور قر آیہ
میں س بارے میں نسانیت کیا ہدایاتیں ی گہ ہیں - محمود
اسعد

এখন 'মুহাম্মদ আবদুর রহীম' নামে জারি করা বাংলা অনুবাদটি তুলে ধরছি–

'বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম, পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সা. এর শিক্ষা ও সুমহান আদর্শকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দিয়ে ইসলামের বদনাম করা হচ্ছে। কুরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস শরীফের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার চরম ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব ধর্মের নামে এই ধরনের সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী এবং কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা পরিস্কারভাবে জানতে চাই। আশা করি বিষয়টি সপ্রমাণ উল্লেখ করে উপকৃত করবেন'।

এখন বাংলা প্রশ্নটি উর্দুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন, বা উর্দু প্রশ্নটি বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন, তারপর নিজেই বলুন, বাংলা প্রশ্নটি উর্দু প্রশ্নটির অনুবাদ কি-না এবং উভয় প্রশ্নের উৎস অভিন্ন কি-না? সুতরাং বাংলা প্রশ্নটি সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকলে, উর্দুটির উপরও আপত্তি করা উচিত। উর্দু প্রশ্নকারী মাদানী বা নবী পরিবারের হওয়ার কারণে আপত্তিকারীগণ মাওলানা মাহমুদ মাদানী সাহেবের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, আপত্তি শুধু মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের ব্যাপারে করবেন, তা ঠিক নয়। আর যদি মাওলানা মাহমুদ মাদানী সাহেবের লেখাকে গভীরভাবে দেখা আকাবিরের প্রতি বেয়াদবী মনে করেন, তাহলে শুধু মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেরবর ব্যাপারে আপত্তি করাকেও বেয়াদবী মনে করার আমার সুযোগ থাকার কথা।

প্রশ্নটির শেষাংশে রয়েছে– 'তা পরিস্কারভাবে জানতে চাই'। কারো কাছে তার সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে বিজ্ঞদের কাছে প্রশ্ন করে পরিস্কারভাবে জেনে নেয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের মাদরাসাসহ যে সকল মাদরাসায় উর্দু ও বাংলা ইস্তেফতাটি পাঠানো হয়েছে, আমার জানা মতে দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উত্তর সঙ্গে পাঠানো হয়েছে। দেওবন্দের উত্তরের পর তো অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাওয়ার কথা। তাই দেওবন্দ থেকে উত্তর পাওয়ার পর উত্তর জানার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট ছোট মাদরাসগুলোতেও ইস্তেফতা পাঠানোর কারণ বোধগম্য হচ্ছে না। নেপথ্যে কোনো উদ্দেশ্য কাজ করছে না তো?

তাছাড়া আমাদের এক সহকর্মী এতে দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল ইফতার প্রতি প্রশ্নকারীর আস্থাহীনতার গন্ধও পেয়েছেন। আর একজন বললেন, তিনি

একটি ভিডিও দেখেছেন, তাতে দেশের একজন প্রবীণ আলেম এ বিষয়ে এক লক্ষ ফাতওয়া সংগ্রহ করার ঘোষণা দিয়েছেন। মুসলিম সমাজে ফাতওয়া প্রভাব উল্লেখ করার পর ঐ আলেম ডিবি পুলিশের প্রধানকে এ কথাও বলেছেন যে, 'এক লক্ষ ফাতওয়া সংগ্রহ করা আমাদের জন্য কঠিন হবে না। কারণ, দেশে মসজিদই আছে তিন লক্ষ।' যেন তিন লক্ষ মসজিদের তিন লক্ষ ইমাম বা মুয়াজ্জিন ঐ আলেমের দৃষ্টিতে ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য। কিন্তু আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.-এর شَرْحُ عُقُودِ رَسْمِ المفتِيِّ, মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর أُصُولُ الإفتاءِ প্রভৃতি কিতাব কী বলে? এ কিতাবগুলোতে ফাতওয়া প্রদানের জন্য যে যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, ঐ আলেম কি তিন লক্ষ মসজিদের তি, লক্ষ ইমাম ও মুয়াজ্জিনের মধ্যে ঐ যোগ্যতা আছে বলে মনে করেন?

প্রশ্নটিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়– ১. 'বর্তমানে সারা বিশ্বে ... বদনাম করা হচ্ছে'। ২. 'কুরআন শরীফের ... ষড়যন্ত্র চলছে'। ৩. 'অতএব ধর্মের নামে ... পরিস্কারভাবে জানতে চাই'।

প্রশ্নের পর্ব-সংখ্যা তিনটি হলেও প্রথম পর্বদু'টি মূলত ভূমিকা। 'অতএব' থেকে শুরু হওয়া তৃতীয় পর্বটিই হলো মূল প্রশ্ন। 'অতএব'-এর পূর্বে দু'টি অংশ থাকলেও 'অতএব' থেকে 'জানতে চাই' পর্যন্ত লেখা দ্বারা বুঝা যায়, দ্বিতীয় পর্বটিই হলো প্রশ্নের ক্ষেত্র। দেখুন এভাবে পাঠ করলেও প্রশ্নটি পূর্ণাঙ্গ থাকে– 'বর্তমানে সারা বিশ্বে কুরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস শরীফের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার চরম ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব ধর্মের নামে এই ধরনের সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী এবং কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা পরিস্কারভাবে জানতে চাই'।

পক্ষান্তরে প্রথম পর্ব ও তৃতীয় পর্বকে একত্র করে পাঠ করলে ভূমিকা ও প্রশ্নের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না– 'বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম, পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সা. এর শিক্ষা ও সুমহান আদর্শকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দিয়ে ইসলামের বদনাম করা হচ্ছে। অতএব ধর্মের নামে এই ধরনের সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী এবং কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা পরিস্কারভাবে জানতে চাই'।

অতএব, এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে যে, প্রশ্নের ক্ষেত্র হলো দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বের সঙ্গে প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে প্রথম পর্বটি কেন উল্লেখ করা হলো? একজনের বক্তব্য হলো, উত্তরদাতাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য কৌশল হিসেবে প্রথম পর্বটি লেখা হয়েছে। যেন উত্তরদাতা 'মুফতী সাহেবান' বুঝেন যে, ইসলাম ধর্ম, পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও সুমহান আদর্শকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দিয়ে, যারা সারা বিশ্বে ইসলামের বদনাম করছে, প্রশ্নকারী তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত নন। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি লেখার সম্পাদিত রূপের অংশবিশেষ হলো– 'দুশমন যখন পাশবিক উল্লাসে মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন একদল মুনাফিক যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। বস্তুত উম্মাহর ইতিহাসে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুনাফিকের অভাব হয়নি কখনো। নিছক হালুয়া-রুটির লোভে জেনেশুনেই তারা উম্মাহর জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে; যদিও শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পায় না'। ['এসো কলম মেরামত করি' পৃ. ২০০]

এ বিষয়টিও পরিস্কার যে, প্রথম পর্বে উল্লিখিত 'রাসূল সা. এর শিক্ষা ও সুমহান আদর্শ' দ্বারা জিহাদ উদ্দেশ্য। কারণ, জিহাদ ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোনো তৎপরতাকে শত্রুরা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দেয়ার কথা আমাদের জানা নেই। দৈনিক ইনকিলাবের লেখাটির সম্পাদিত রূপের আরেকটি অংশবিশেষ হলো– 'উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যখন কোনো মুসলিম দেশের উপর আগ্রাসনের থাবা বিস্তার করে, তখন তারা জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে, এবং যারা জানবায মুজাহিদীন তাদের দমন করার জন্য সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের অপবাদ আরোপ করে। কারণ, তারা জানে, একমাত্র জিহাদই পারে বিপর্যস্ত উম্মাহর জীবনে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে।' ['এসো কলম মেরামত করি' পৃ. ২০০]

দ্বিতীয় পর্বে কুরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস শরীফের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার চরম ষড়যন্ত্র করার কথা বলা হয়েছে। যারা কোনো না কোনো বিষয়ের কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণীর অপব্যাখ্যা দেয় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি মানুষকে বিদ্বেষী করে তোলার ষড়যন্ত্র করে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এর পূর্বে তো তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। তারা কারা? কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা কারা দেয়? মানুষকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার ষড়যন্ত্র কারা করে? [মধ্যখানে একটা ছোট্ট প্রশ্ন মনে উঁকি দিয়েছে– ইস্তেফতাকারীর দৃষ্টিতে মুসলমানরা কি 'মানুষ' নন? মুসলমানদেরকে যারা সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী ও উগ্রবাদী আখ্যা দেয়, মুসলমানদের পরিবর্তে ইস্তেফতাকারী কি তাদেরকে মানুষ আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত মনে করেন?]

পরিস্কারভাবে যদি কোনো দলের নাম নেয়া ইস্তেফতাকারী উপযোগী মনে না করেন, তাহলে আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে যাব না। তিনি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে ঐ দলের কমপক্ষে অপব্যাখ্যাগুলো উল্লেখ করতেন। তাহলে কুরআন-হাদীসের আলোকে যাচাই করে আমরা বোঝার সুযোগ পেতাম, তাদের ব্যাখ্যাগুলো অপব্যাখ্যা কি-না? আমাদের সামনে তখন তাদের মুখোশ কিছুটা হলেও উন্মোচিত হতো। আমরা তখন মাওলানা মাহমুদ মাদানী সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচী বাস্তবায়নে তাঁর সহযোগিতা করতাম। কিন্তু ইস্তেফতায় এ দিকটি পরিস্কার করা হয়নি। ফলে ইস্তেফতায় 'অতএব' বলে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় জানা হলেও আমরা সেই করণীয় বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হবো।

ইস্তেফতার তৃতীয় পর্বে মুফতী সাহেবানদের নিকট প্রশ্নকারী তিনটি বিষয় পরিস্কারভাবে জানতে চেয়েছেন। ১. ধর্মের নামে সন্ত্রাসসৃষ্টিতে ইসলামের ভূমিকা কী? ২. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী? ৩. কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কী দিকনির্দেশনা রয়েছে?

আমার বুঝেই আসছে না, প্রশ্নকারী দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও এমন অবাস্তব কথা কিসের ভিত্তিতে মনে করতে পারেন যে, ধর্মের নামে সন্ত্রাসসৃষ্টিতে ইসলামের ভূমিকা রয়েছে। 'ইসলাম ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে' এমন কথা তো শুধু এমন ব্যক্তিই বলতে পারে, যে স্বঘোষিত অমুসলমান।

'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী?' তা অবশ্যই জানার বিষয়। তা আমাদের গৌরবমাখা ইতিহাস। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত ভূমিকা ইসলামেরই রয়েছে। 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী?' বলে

প্রশ্নকারী যদি 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধান কী?' বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে নবী পরিবারের সন্তানের সামনে নবীকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের আয়াত পেশ করা যেত- يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ (**হে নবী! যুদ্ধের প্রতি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করুন। [সূরা আনফাল, ৬৫]**

এবং নবী পরিবারের সন্তানের সামনে নবীকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের এ আয়াতও পেশ করা যেত- يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং ওদের প্রতি কঠোরতা করুন। [সূরা তাওবা, ৭৩]

ইস্তেফতার তৃতীয় পর্বে প্রশ্নকারীর জানতে চাওয়া তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আমার আরজ হলো, 'এ ব্যাপারে' বলে কোন্ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ইঙ্গিত যদি দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে হয়ে থাকে, তাহলে তো ঠিক আছে। কারণ, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে দিকনির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু ইঙ্গিত যদি প্রথম বিষয়টির দিকে হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্নকারী কাদের দলভুক্ত, মনে এমন প্রশ্ন জাগ্রত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকার কথা। কারণ, ইসলাম কখনো সন্ত্রাস সৃষ্টি করেনি। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে দিকনির্দেশনা থাকা তো দূরের কথা, বরং সন্ত্রাসকে প্রতিহত করতে ইসলাম জিহাদের ফরয বিধান দিয়েছে।

ইস্তেফতার আরেকটি ত্রুটি হলো, প্রথম পর্বে রাসূল সা. এর শিক্ষা ও সুমহান আদর্শকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দেয়ার অভিযোগ যাদের ব্যাপারে আনা হয়েছে, তাদের প্রতিকারের জন্য কুরআন-হাদীসে কী দিকনির্দেশনা রয়েছে, মুফতী সাহেবানদের নিকট তা অপরিস্কারভাবেও জানতে চাওয়া হয়নি। তবে কি এই জানতে না চাওয়ার কোনো কারণ আছে?

এ কথা তো পরিস্কার যে, জিহাদ ইসলামের অন্যতম একটি হুকুম। কুরআন পাকে জিহাদের প্রচুর আয়াত রয়েছে। জিহাদ বিষয়ে হাদীসও রয়েছে প্রচুর সংখ্যায়। আর 'মুসলিম জাতির জীবনে যত বিপদ, দুর্যোগ ও বিপর্যয়, তা জিহাদ থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়ারই ফল। সুতরাং জিহাদের পথে ফিরে আসাই হলো তাদের মুক্তির একমাত্র উপায়' [''-এর মধ্যকার বাক্যদু'টি ইনকিলাবের লেখাটির সম্পাদিত রূপের আরেকটি অংশবিশেষ।] কিন্তু

অধিকাংশ মুসলমানের মতো আমিও জিহাদ করিনা। তাই বলে কি জিহাদকে অস্বীকার করতে পারি? কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করার তুলনায় ফাসেক হয়ে মৃতুবরণ করা শতগুণে শ্রেয়। আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবাগণের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! সাহাবাগণের আদর্শ জানার জন্য হযরতজী ইউসুফ কান্দলভী রহ.-এর 'হায়াতুস্ সাহাবা' কিতাবটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মাওলানা মাহমুদ মাদানী সাহেব ভারতের রাজ্যসভার একজন সদস্য। ইস্তেফতাটির কপিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইস্তেফতাটি লেখার জন্য তিনি তাঁর ঐ পদের বিশেষ প্যাড ব্যবহার করেছেন, যার উপরে ভারতের জাতীয় প্রতীকের লোগো রয়েছে। লোগোটি কয়েকটি মূর্তির সমষ্টি। লোগোটি বড় করে দেখিয়ে ভারতের জাতীয় প্রতীকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, একটি গোলাকার অ্যাবাকাসের উপর চারটি এশীয় সিংহ পরস্পরের দিকে পিঠ কর বসে আছে; একটি ফ্রিজে হাতি, লম্ফমান ঘোড়া, ষাঁড় ও সিংহের উচ্চ রিলিফ; এগুলো আবার তাদের ধর্মচক্র দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার প্রশ্ন হলো, একটি ইস্তেফতা, যা তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতায় করেছেন, তাতে এমন শিরকী লোগো সম্বলিত প্যাড ব্যবহার করার কী অনিবার্য প্রয়োজন ছিল? যদি প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন, তাহলে করুন। আপত্তি করার অধিকার আমার না-ও থাকতে পারে। কিন্তু শিরকী লোগোর পাশে بِسْمِ اللّٰهِ الرحمن الرحيم লেখা, বা بِسْمِ اللّٰهِ الرحمن الرحيم-এর পাশে শিরকী লোগো প্রতিস্থাপন করার উপর আপত্তি করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানের আছে।

শুরুর দিকে লেখা এই অংশটি পুনরায় উল্লেখ করে আমি লেখাটি সমাপ্ত করতে চাই– 'বাংলা প্রশ্নটি উর্দুর সঙ্গে মিলেয়ে পড়ুন, বা উর্দু প্রশ্নটি বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন, তারপর নিজেই বলুন, বাংলা প্রশ্নটি উর্দু প্রশ্নটির অনুবাদ কি-না। এবং উভয় প্রশ্নের উৎস অভিন্ন কি-না। সুতরাং বাংলা প্রশ্নটি সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকলে, উর্দুটির উপরও আপত্তি করা উচিত। উর্দু প্রশ্নকারী মাদানী বা নবী পরিবারের হওয়ার কারণে আপত্তিকারীগণ মাওলানা মাহমুদ মাদানী সাহেবের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, আপত্তি মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের ব্যাপারে করবেন, তা ঠিক নয়। আর যদি মাওলানা মাহমুদ মাদানী সাহেবের লেখাকে গভীরভাবে দেখা আকাবিরের

প্রতি বেয়াদবী মনে করেন, তাহলে শুধু মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের ব্যাপারে আপত্তি করাকেও বেয়াদবী মনে করার আমার সুযোগ থাকার কথা'।

***

(ইস্তেফতা পর্যালোচনাটি এখানে শেষ হল)

দুই. সংশ্লিষ্ট দারুল ইফতা ও মুফতীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জানতে পেরেছি তাদেরকে সুবিধাজনক একটি মাত্র প্রশ্ন দেখানো হয়েছে। সে প্রশ্নের উপর উত্তর নিয়ে পরবর্তীতে আয়োজকরা সকল প্রশ্নের উত্তর হিসাবে তাদের স্বাক্ষর প্রচার করেছে।

তিন. প্রত্যেক দারুল ইফতার সবচাইতে দুর্বল ও অসচেতন ছিদ্রপথ দিয়ে স্বাক্ষর আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দুর্বল কোন দিককে সামনে এনে মানসিকভাবে তাকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাঁচ. জিহাদী কার্যক্রমের চলমান কিছু অস্পষ্ট ঘটনাকে আরো অস্পষ্ট করে তুলে ধরে স্বাক্ষর করতে প্ররোচিত করা হয়েছে।

ছয়. এ ফতোয়া দেয়ার মাধ্যমে মাদরাসা-মসজিদ তথা পুরা দ্বীনের কী কী ফায়দা হবে তা দেখিয়ে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাত. বহু রকমের অলীক স্বপ্ন দেখানো হয়েছে।

আট. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি ও ব্যক্তিদের কেউ কেউ আপন জায়গায় গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে প্রদত্ত ফাতওয়ায় ফাতওয়া প্রদানের মূলনীতির ন্যূনতম মাপকাঠিও রক্ষা করেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতার গন্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের বিকৃতি সাধন ও মিথ্যারও সংযোগ করেছেন। যার দরুন আমাদের এমনও সন্দেহ হয় যে, এসব ফাতওয়াও মূলত জাল এবং সাজানো নাটক কি না? আয়োজকদের উপর এ সন্দেহ না করলে সন্দেহ গিয়ে পড়ে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির উপর।

পাঠকদের সুবিধার্থে নামীদামী একটি প্রতিষ্ঠানের একটি ফাতওয়া হুবহু উল্লেখ করা হচ্ছে, এবং সাথে সাথে সে ফাতওয়ায় যেসব অজ্ঞতা, বিকৃতি ও মিথ্যার প্রকাশ ঘটেছে তাও চিহ্নিত করে দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আবু মুহাম্মদ নামের একজনের (যার লেখা থেকে তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য আলেম ও মুফতীই

মনে হয় তাঁর) একটি লেখা আমরা পেয়েছি। তাঁর পর্যালোচনামূলক সে লখাটি এখানে তুলে ধরলে আশা করি পাঠক অনেক উপকৃত হবেন। পর্যালোচনাটি নিম্নরূপ-

একটি ফাতওয়া পর্যালোচনা

আবু মুহাম্মাদ

الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري.

সম্প্রতি উলামায়ে কেরামের অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ' বিরোধী ফাতওয়ার জন্য এবং ফাতওয়াটির সমর্থনের জন্য এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন ও ফাতওয়া বিভিন্ন আলেম ও মুফতীর নিকট এবং বিভিন্ন দারুল ইফতায় প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রশ্নটির অলিখিত ও প্রসিদ্ধ শিরোনাম হল, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এক লক্ষ আলেমের সমর্থন গ্রহণ। প্রশ্নকারীর কভারনেম মুহাম্মদ আব্দুর রহীম। নেপথ্যনায়ক মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদ। তিনি প্রথমে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আহ্বানে ফ্রান্সে জঙ্গিবাদ বিরোধী কথিত 'আমান কনফারেন্সে' ভাষণ দিয়ে একই শিরোনামে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে কনফারেন্স করে সর্বশেষ বাংলাদেশ পুলিশের এবিষয়ক একটি কনফারেন্সে এই উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করেন এবং সেখান থেকে এসে এই 'মহৎ কর্মযজ্ঞে'[১] অবতরণ করেন। এ বিষয়ে বিবিসি বাংলা ফরিদ সাহেবের সাক্ষাৎকারসহ বেশ লম্বা পরিসরের একটি বিশেষ প্রতিবেদনও প্রচার করেছে।

এই উদ্যোগ যারা নিয়েছেন এবং এবিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, তারা যে সরাসরি মুসলমানদের চিরশত্রু কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজটি করছেন,

---

১. শব্দটি তাদের ঝুলি থেকেই সংগৃহীত। তাদের একজন অধম লেখকের মোবাইলে একটি মেসেজ পাঠিয়েছেন- 'এই মহত কাজে অংশগ্রহণ ঈমানী দায়িত্ব। তাই অন্যকে স্বক্ষরদানে উদ্বুদ্ধ করুন'।

তার যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে বিদ্যমান। প্রবন্ধের শেষ দিকে আমরা তথ্যগুলো পেশ করব ইনশা-আল্লাহ। কেউ যদি এজন্য তথ্যগুলো পর্যাপ্ত মনে না করেন, তবে অন্তত তারা যে অনুসরণীয় ব্যক্তি হতে পারেন না, উম্মতের এবং আলেমদের নেতৃত্বের যোগ্য নন; বিশেষত মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় কোনো বিষয়ে–তাতে আশা করি কারোই সংশয় থাকবে না।

এমন নামধারী কিছু 'উলামায়ে সূ' (দুষ্ট আলেম) সবসময় ছিল, থাকবে। বস্তুত তাদের এই হীনকর্মে আমাদের দুঃখ নেই। দুঃখ হল দারুল ইফতাগুলোর ফাতওয়া দেখে। একাধিক প্রসিদ্ধ দারুল ইফতা থেকে প্রশ্নটির উত্তর দেয়া হয়েছে। যা থেকে আমাদের 'কাহতুর রিজাল' তথা ইলমী দৈন্যতা ও খেয়ানতের করুণ চেহারা ফুটে ওঠে।

জিহাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ কী? কে কোনটার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে - এই বিষয়গুলো বাদ দিয়ে, শুধু ফিকহ ফাতওয়ার উসূল ও নীতির আলোকে বিচার করলেই বিস্মিত হতে হয় যে, মুসলিম মিল্লাতের; বরং পুরো মানব জাতির বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক একটি বিষয়ে এত অস্পষ্ট ও প্রতারণামূলক একটি প্রশ্নের এমন অস্পষ্ট উত্তর দেয়া তারা কীভাবে বৈধ মনে করলেন?! অবশ্য এমন অনেক হক্কানি আলেমের কথাও আমরা শুনেছি, যারা এই ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করতে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহ তাঁদের ইলম ও আমল এবং সৎ সাহসে বরকত দান করুন। এবং উম্মতকে সঠিক পথে পরিচালনা করার তাউফীক দান করুন। আমিন।

যারা এই ফাতওয়া লিখেছেন কিংবা তাতে দস্তখত করেছেন, তাদের সামনে আমরা কিছু বিষয় তুলে ধরার ইচ্ছা করছি। আশা করি বিষয়গুলো তাদের জন্য নতুন করে চিন্তা ভাবনা ও পুনঃর্বিবেচনার পথ সুগম করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নপর্যালোচনা

প্রশ্নটি সম্পর্কে যদিও বিবিসির বক্তব্য ছিল "মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ জঙ্গিবাদ বিরোধী কিছু ফাতওয়া জারি করবেন বলে জানিয়েছেন। ইসলাস সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না আর আত্মঘাতি হামলা চালিয়ে বেহেশ্‌ত পাওয়া সম্ভব নয়–এমন সব বার্তা থাকবে তার ফাতওয়ায়।... মূলত এগারটি প্রশ্নকে সামনে রেখে ফাতওয়াগুলো চূড়ান্ত করা হচ্ছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

প্রশ্নগুলো হচ্ছে–সন্ত্রাস ও জঙ্গিতৎপরতাকে ইসলাম সমর্থন করে কি না? জিহাদ ও সন্ত্রাস এক জিনিস কি না? ইসলামের নামে সন্ত্রাস করে মৃত্যুবরণ করলে বা আত্মঘাতি হলে; সে শহীদ হবে কি না? এবং পরকালে বেহেস্ত পাওয়া যাবে কি না? নির্বিচার হত্যাকান্ড ইসলাম সমর্থন করে কি না? ইত্যাদি। এবং এর জবাবে কোরআন হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে তারা একমত হয়েছেন যে, সবগুলো প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে 'না'।" –বিবিসি বাংলা

কিন্তু বাস্তবে এ প্রশ্নগুলো আমাদের নজরে পড়েনি।[৩] যে প্রশ্নটি দারুল ইফতাগুলোতে প্রেরণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রশ্নটি আগাগোড়া সম্পূর্ণই ধোঁকা ও প্রতারণাপূর্ণ। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইচ্ছা করেই যে একটি ঘোলাটে আবহ তৈরি করে প্রশ্নটি এরকম অস্পষ্ট রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রসিদ্ধ একটি দারুল ইফতায় প্রেরিত প্রশ্নটি আমরা এখানে হুবহু তুলে ধরছি।

"আসসালামু আলাইকুম

মুহতারাম হযরত মুফতী সাহেব দা. বা.

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

বিষয়: ফাতওয়া বা নিম্নোক্ত প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন: বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম, পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সা. এর শিক্ষা ও সুমহান আদর্শকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দিয়ে ইসলামের বদনাম করা হচ্ছে। কুরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস শরীফের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার চরম ষড়যন্ত্র চলছে।

অতএব ধর্মের নামে এই ধরনের সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী এবং কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কী নির্দেশনা রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই।

আশা করি বিষয়টি সপ্রমাণ উল্লেখ করে উপকৃত করবেন।

বিনীত

(দস্তখত)

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ০১৭৭৬০০০২০০- ০১৬৭১০৫৪৬১১

খতীব, ইসলামবাগ জামে মসজিদ

[৩] এই লেখাটি তথাকথিত এক লক্ষ স্বাক্ষরের ফতোয়া জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বের।

ইসলামবাগ, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

মুহতামিম, তাকওয়া মাদরাসা, রামপুরা, ঢাকা"।

***

পর্যালোচনা

এক. প্রশ্নের শুরুতে বলা হয়েছে– "বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম, পবিত্র কুরআন এবং রাসূল সা. এর শিক্ষা ও সুমহান আদর্শকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দিয়ে ইসলামের বদনাম করা হচ্ছে"।

এ প্রসঙ্গে আমরা বিশ্বের মানুষগুলোকে চারভাগে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম প্রকার, মুসলমানদের মধ্যে যারা জিহাদ ও খিলাফাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বে সশস্ত্র লড়াই করছেন কিংবা যারা তাদেরকে সমর্থন করছেন।

একথা স্পষ্ট যে, তাদের কেউ ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দেন না; বরং তারা তো তাদের কর্মকান্ডকে ইসলামি জিহাদ আখ্যা দিয়ে এই জিহাদকে সন্ত্রাস ও জুলুম অত্যাচার বন্ধ করে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উপায় ও মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করছেন এবং ঘোষণা দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় প্রকার, মুসলমানদের মধ্যে যারা জিহাদের নামে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সশস্ত্র লড়াইগুলোকে সমর্থন করেন না বা বিরোধিতা করেন।

তারাও ইসলামকে সন্ত্রাস, চরমপন্থা কিংবা জঙ্গিবাদ আখ্যা দেন না; বরং বর্তমানে যারা ইসলাম ও জিহাদের নামে সশস্ত্র লড়াই করছেন, তা তাদের বিভ্রান্তি ও অপকর্ম বলে প্রচার করেন। ইসলামের সঙ্গে এসব কর্মকান্ডের কোন সম্পর্ক নেই বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন। যেমনটি আলোচ্য ফাতওয়ায় করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রকার, কাফেরদের মধ্যে যারা প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের ধুরন্ধর ও ধূর্ত শত্রু, কিন্তু নিজেদেরকে উদার ও ভদ্র মনে করেন এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিপ্রবণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রচার করেন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ কাফের নেতারা এই প্রকৃতির।

এই গ্রুপটির অন্তরে কি আছে তা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বাহ্যত তারা ইসলামকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ বা চরমপন্থার অপবাদ দেয় না; বরং তাদেরকেও হরহামেশা দ্বিতীয় প্রকার মুসলমানদের মতো সশস্ত্র

মুজাহিদদেরকে বিভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে নসিহতের বুলি আওড়াতে শোনা যায়– ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমর্থন করে না, ইসলামে জঙ্গিবাদ নেই ইত্যাদি। তারা বলতে চায়, এগুলো অতি আবেগী বিভ্রান্ত কিছু মুসলিম তরুণদের ভুল কর্মকান্ড, যার সঙ্গে সঠিক ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

চতুর্থ প্রকার, কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমানদের স্বঘোষিত দুশমন, অভদ্র ও নিচু স্বভাব কিংবা জ্ঞানপাপি প্রকৃতির।

এই একটি গ্রুপই মূলত ইসলামে বিধিত জিহাদকে ভিত্তি করে ইসলামকে জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসী ও চরমপন্থার ধর্ম বলে কটূক্তি করে। যদিও ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ জিহাদের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের দাবি, ইসলাম তরবারির জোরেই প্রসার লাভ করেছে। বিশেষ করে মুসতাশরিক তথা প্রাচ্যবিদদের এই অভিযোগ ও প্রোপাগাণ্ডা অনেক পুরোনো কাহিনী।

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে– প্রথমত তিনটি গ্রুপের কোনোটিই আলোচ্য প্রশ্নের প্রথমাংশে উদ্দেশ্য হওয়ার অবকাশ নেই। কারণ তারা কেউই ইসলাম ধর্ম, পবিত্র কোরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও সুমহান আদর্শকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা আখ্যা দেয় না। শেষোক্ত চতুর্থ গ্রুপটিই শুধু ইসলাম ধর্মকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা বলে আখ্যা দেয়। সুতরাং প্রশ্নের এ অংশের উদ্দেশ্য যে একমাত্র তারাই– তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু কথা হল, আলোচ্য প্রশ্নের মূল অংশে এই গ্রুপটি সম্পর্কে কিছুই জানতে চাওয়া হয়নি। সুতরাং যাদের সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নেই এবং প্রশ্নের মূল বিষয়ের সঙ্গেও যাদের কোনো সম্পর্ক নেই, প্রশ্নের শুরুতেই তাদের আলোচনা কেন আনা হল? প্রশ্নে একটা ঘোলাটে আবহ তৈরি করা ছাড়া এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য নয়।

দুই. প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে– "কুরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস শরীফের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলার চরম ষড়যন্ত্র চলছে"।

প্রিয় পাঠক! এই অংশ দ্বারা প্রশ্নকারী কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তিনি কি বলতে চান, মুসলমানদের এমন অবস্থান গ্রহণ করা উচিত, যাতে তাদের প্রতি অমুসলিম 'মানুষ'দের বিদ্বেষ শেষ হয়ে যায়? যদি তাই হয়, তবে তো তাদের ঈমান ত্যাগ করে ইহুদি নাসারাদের

আনুগত্য করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলিমদের বিদ্বেষের মূল কারণই তো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান। ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. (سورة البروج ٨) তারা একমাত্র প্ররাক্রমশালী, প্রসংশিত আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণের কারণেই তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। সূরা বুরূজ, ৮।

মুসলিম মিল্লাতের আদিপিতা তাওহীদের নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ও তার অনুসারীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. الممتحنة ٤ তোমাদের জন্য রয়েছে হযরত ইবরাহীম ও তার সঙ্গিদের মধ্যে উত্তম আদর্শ; যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর ইবাদাত করো তা থেকে সম্পর্কহীন। তোমাদের সঙ্গে আমরা কুফরি করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে গেল– যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান গ্রহণ করো। (সূরা মুমতাহিনা ৪)।

কোরআনে আরো বলা হয়েছে- وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. (سورة البقرة ١٢٠) ইহুদি নাসারারা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। (সূরা বাকারা, ১২০)।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. (سورة المائدة ٥١). হে ঈমানদারেরা! তোমরা ইহুদি নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। (সূরা মায়েদা, ৫১)।

প্রিয় পাঠক! এজাতীয় আরো অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আমি বিষয়টির প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করার জন্য কয়েকটি আয়াতের অংশবিশেষ

উল্লেখ করলাম। অনুরোধ করব এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো একটু মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে দেখুন, প্রকৃত বিষয়টি আসলে শরীয়ত কিভাবে মূল্যায়ন করে এবং আমাদের সমাজে এবিষয়ে কী ধ্যান ধারণা বিরাজ করছে? বর্তমানে যে ব্যক্তি শত্রুদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত ও প্রসংশিত সে আমাদের দৃষ্টিতেও তত বড় আল্লাহওয়ালা ও বুজুর্গ। অথচ কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য হল, ইহুদি নাসারাদের আনুগত্য করা ব্যতীত কিছুতেই তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। হাদীসের বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের যে পরিমাণ নিকটবর্তী হবে তার উপর সেই পরিমাণ বিপদ আপদ আসবে।

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله : أي الناس أشد بلاء ؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي، ٤٠٦\٤ ابواب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا بإسناد حسن، كما قاله الشيخ شعيب الأرنؤوط.

আসলে এখানে প্রশ্নকারী নিজের অপরাধ ঢাকার অপচেষ্টা করেছেন। ধুরন্ধর অপরাধীদের একটা অপকৌশল প্রয়োগ করেছেন। ধূর্ত অপরাধীরা অপরাধ করে আগে আগে প্রতিপক্ষের উপর সেই অপরাধের দায় চাপিয়ে দেয়। যাতে সাধু প্রতিপক্ষ আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে তার প্রতি অপরাধের অভিযোগ উত্থাপনেরই সুযোগ না পায়। এজন্য কোরআন হাদীসের যেই সঠিক ব্যাখ্যার কারণে অমুসলিমরা মুসলামনদের প্রতি বিদ্বেষী হয়, সেই ব্যাখ্যাকে প্রশ্নকারী অপব্যাখ্যা বলছেন। অথচ বাস্তবতা হল, মুজাহিদরা কোরআন হাদীসের জিহাদ সংক্রান্ত নুসূসগুলোর যেই ব্যাখ্যা দিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা-ই উক্ত নসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা। পক্ষান্তরে যারা পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে মডারেট মুসলিম; পশ্চিমাদের অপব্যাখ্যা অনুসারে ইসলাম পালন করেন এবং বিশেষ করে জিহাদ সংক্রান্ত নসগুলো বিকৃত করে জিহাদ বাদ দিয়ে অন্য সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তাদের প্রতি তো অমুসলিমরা

বেজায় খুশি। কারণ কোরআন হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাই তো তাদের অসন্তুষ্টি ও বিদ্বেষের কারণ। সুতরাং কোরআন হাদীসের 'অপব্যাখ্যার' প্রতি প্রশ্নকারী তার যে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করেছেন, তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আসলে এ অংশটা মনে হয় প্রশ্নকারীর মুখ ফসকে তার ভিতরটা খুলে দিয়েছে। কিন্তু তাতে যে তার থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে, তা হয়তো তিনি ঠাওর করতে পারেননি।

তিন. প্রশ্নের তৃতীয়াংশে বলা হয়েছে– "অতএব ধর্মের নামে এই ধরনের সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কী এবং কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কী নির্দেশনা রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই"।

এটা প্রশ্নের মূল অংশ। আগের দুটি অংশ ছিল ভূমিকার মতো। যদিও ভূমিকার সঙ্গে প্রশ্নের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে যেই বাক্যশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে অংশ তিনটির পরস্পর সম্পর্ক মানতেকের পরিভাষায় 'সুগরা' 'কুবরা' ও 'নতীজা'র সম্পর্ক। অথচ আদৌ অংশ তিনটির মাঝে এমন কোনো সম্পর্ক নেই। এরপর বলা হয়েছে– 'এ ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি'। অথচ সন্ত্রাস সৃষ্টির কোনো ধরনই উপরে আলোচিত হয়নি।

চার. প্রশ্নের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও সুনির্দিষ্ট কোনো দল বা ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং কিছু বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষণগুলো হল সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা।

অভিধানে কিংবা সামাজিক প্রচলনে শব্দগুলোর বিশেষ অর্থ থাকলেও নাইন ইলিভেনের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হলুদ মিডিয়ার বদৌলতে শব্দগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োগক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এখন সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা বলতে ঐসকল লোকদের বোঝানো হয়, যারা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের নামে সশস্ত্র আন্দোলন করেন কিংবা তাদেরকে সমর্থন করেন। বিশেষ করে ইসলামের সঙ্গে যোগ করে যখন শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, তখন তো একমাত্র তাদেরকেই বোঝানো হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন, গণমাধ্যম ও মুসলিম অমুসলিম সকল রাজনৈতিক নেতার মুখে এখন শব্দগুলো একমাত্র এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নকারী এই প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেই উক্ত বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছেন। যাতে সবাই বোঝে, প্রশ্নটি মূলত সশস্ত্র জিহাদের সঙ্গে জড়িত সকল মুসলমান সম্পর্কে করা হয়েছে এবং এর উত্তরে

যা বলা হবে, তা তাদের সম্পর্কেই বলা হবে। একই সঙ্গে শব্দগুলোর আরেকটি আভিধানিক অর্থও যেহেতু আছে, যা প্রকৃতই খারাপ ও গর্হিত মানুষের বিশেষণ, তাই এগুলো ব্যবহার করে মুনাফিকানা ছিদ্রপথগুলোও খোলা রাখা হয়েছে। যাতে কেউ সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে ফসকে যাওয়ার সুযোগ থাকে। কেউ যদি বলে আপনারা কি বর্তমান প্রচলিত জিহাদ, মুজাহিদ, তালেবান কিংবা আলকায়েদা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন? বা তাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়েছেন? তখন যেন বলা যায়, না; আমরা তো সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়েছি।

ইতিমধ্যে এমন ঘটনা ঘটেও গেছে। এক ভাই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজনকে যখন বললেন, আপনারা তো ঢালাওভাবে জিহাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করলেন। দুনিয়াতে কি তাহলে এমন কোনো ব্যক্তি বা দল নেই, যারা সত্যিকার অর্থে জিহাদ করছেন?

তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন–

عن جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. صحيح مسلم. النسخة الهندية ١/ ٨٧

সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পথে কিতাল করবে... – এই হাদীসের কী অর্থ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কই; আমরা তো জিহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি!

উত্তরপর্যালোচনা

আমাদের হাতে দেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ কয়েকটি দারুল ইফতার ফাতওয়া আছে। কলেবরে কিছু বেশ-কম হলেও সবগুলো ফাতওয়ার সারমর্ম প্রায় একই। আগা গোড়া কোরআন হাদীসের নিরাপত্তা বিষয়ক নসগুলোর তরজমা করে দেয়া হয়েছে। একটি ফাতওয়া কলেবরে অন্যগুলো অপেক্ষা ছোট হলেও বিষয়বস্তুর বিচারে একটু সমৃদ্ধ। আমরা এখানে সেই ফাতওয়াটি ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ হুবহু তুলে ধরছি।

"উত্তর: الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

আল্লাহ তা'য়ালা শুধু মানুষের স্রষ্টাই নন বিধাতা ও বটেন। তিনি যেভাবে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি তাদের সুখ-শান্তি, সফলতা আর নিরাপত্তার বিধানও জারী করেছেন। ইসলামই হচ্ছে ঐ বিধান যা পৃথিবীর সকল যুলুম-নির্যাতন অরাজকতা আর বিশৃংখলা দুর করে প্রশান্তি, সৌহার্দ আর ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। ইসলামের চার খলিফার যুগ এর উজ্জল দৃষ্টান্ত। মহান সৃষ্টি কর্তা প্রদত্ব পবিত্র জীবন বিধান ইসলাম থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারণেই মূলত আজ সারা বিশ্ব অশান্ত হয়ে উঠেছে।

পবিত্র কোরআন সুন্নাহর ভাষ্য মতে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে শেষ যামানায় হযরত মাহ্দী এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আগমন করবেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসলাম দুনিয়া ব্যাপী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র জিহাদের ঝান্ডা উড়িয়ে তাঁরা চির বিদায় করবেন যালিমদের সকল তন্ত্র-মন্ত্র।

ইসলামের দুশমনদের মনে ভর করেছে আজ তাদের শেষ পরিণতির এই ভয়। তাই পবিত্র জিহাদের বদনাম করতে তারা গঠন করেছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন।

ইসলামের নাম ব্যাবহার করে ওরা বিশ্বের দেশে দেশে নিরিহ নাগরিকদের খুন ঝরাচ্ছে। অথচ শান্তির ধর্ম ইসলামের সাথে এর কোন ও সম্পর্ক নেই"।

এক. ভাষাগত বিচ্যুতিগুলো আমরা আলোচনা করব না। এই পর্যায়ের একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ে ফাতওয়ার ভাষাগত মান কী হওয়া দরকার এবং কী হয়েছে তার বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম।

দুই. ফাতওয়ার সর্বস্বীকৃত একটি নীতি হল, প্রশ্নটি স্পষ্ট হতে হবে। যদি প্রশ্নে কোনো অস্পষ্টতা থাকে তবে উত্তরের পূর্বে প্রশ্নকারীর সঙ্গে কথা বলে প্রশ্ন পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রয়োজনে প্রশ্ন ফেরত দিয়ে পুনরায় স্পষ্ট বিবরণ লিখিয়ে নিতে হবে। অথবা তার অনুমতি নিয়ে মুফতী সাহেব নিজে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ লিখে প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে দিবেন। কিংবা উত্তরের শুরুতে এভাবে বিশ্লেষণ যোগ করে উত্তর লিখবেন যে, প্রশ্নকারীর বিবরণ অনুযায়ী এই তথ্যগুলো উঠে এসেছে। তা যদি বাস্তব হয় তবে উত্তর এই...। বিষয়টি খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন উসূলুল ইফতা, শাইখুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানী দা. বা. মাকতাবাতুস আযহার, বাংলাদেশ, পৃ. ৫৯৫-৫৯৭

এবার চিন্তা করে দেখুন! সাধারণ ছোট একটি ব্যক্তিগত ফাতওয়ার জন্য প্রশ্নটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা যদি এত প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে যে বিষয়টি গোটা মুসলিম জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাতে এমন অস্পষ্ট ও গোলমেলে একটা প্রশ্নের উত্তরে ঝট করে এভাবে প্রশ্নের মতোই অস্পষ্ট একটি ফাতওয়া দিয়ে দেয়া কত জঘন্য ও অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ এবং ইলমে দ্বীনের সঙ্গে কতবড় খেয়ানত !

তিন. আরেকটি নীতি আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা তকি উসমানি (দা.বা.) বলেন, ফাতওয়া শুধু সংশ্লিষ্ট বিধান ও তার ফিকহি দলীল বর্ণনার উপর সীমিত থাকতে হবে। তাতে আবেগ উচ্ছ্বাস সাময়িক ক্রোধ ও স্তুতি-প্রসংশার কিছু থাকতে পারবে না। একই সঙ্গে তা অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর বিশ্লেষণ এবং এমন সংক্ষিপ্ততা থেকেও মুক্ত হতে হবে, যা অস্পষ্টতা তৈরি করে। ফাতওয়ায় অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দও থাকতে পারবে না; থাকতে পারবে না কোনো লম্বা ভূমিকা কিংবা আসরার-হিকাম ও রায-রহস্যের বর্ণনা। পক্ষান্তরে প্রশ্নটি যদি বড় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হয়, তাহলে সেখানে নিয়ম হল কথা দীর্ঘ ও বিশ্লেষণধর্মী করা। সহজ ভাষায় সুন্দর করে সংশ্লিষ্ট সবগুলো দিক খুলে খুলে বুঝিয়ে দেয়া।

-উসূলুল ইফতা, মাকতাবাতুস আযহার, বাংলাদেশ, পৃ. ৬০৮ (সংক্ষেপিত)

ফাতওয়ার এই নীতির আলোকে গোটা মুসলিম মিল্লাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই ফাতওয়াটি কেমন হওয়া প্রয়োজন ছিল এবং কেমন হয়েছে, তা বোঝার জন্য মনে হয় আলেম হওয়ারও প্রয়োজন নেই। তাই এখানে আমরা কোনো প্রকার মন্তব্য থেকে বিরত থাকলাম।

চার. প্রশ্নে একটি ঘোলাটে আবহ তৈরি করে জিহাদকে সন্ত্রাস ও চরমপন্থা আখ্যা দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করা এবং মানবসমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অবকাশ ইসলামী শরীয়তে আছে কি না? উত্তরে বিজ্ঞ মুফতী সাহেবরা কোরআন হাদীস খুলে ইসলামের নিরাপত্তা বিধানের অনেকগুলো আয়াত ও হাদীস লিখে দিলেন।

আমাদের প্রশ্ন হল, ইসলাম যে নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম তা কে না জানে। অজপাড়াগাঁয়ের মূর্খ একজন সাধারণ মুসলমান থেকে বর্তমান মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় মানবশত্রু ওবামা-নিয়াহু পর্যন্ত যাকেই প্রশ্ন করবেন সবাই নির্দ্বিধায় বলে দিবে, হাঁ অবশ্যই ইসলাম নিরাপত্তার ধর্ম। তাহলে এটা প্রমাণ

করার জন্য কেন বড় বড় দারুল ইফতার মুফতী সীল লাগিয়ে এক লক্ষ আলেমের ফাতওয়া দিতে হবে? কেন তাদের এত কাগজ কলমে কোরবানি করতে হবে? তারা এতটুকুও বুঝতে সক্ষম হলেন না যে, এই ফাতওয়াটি ইসলামের সত্যিকার জিহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে? মনে হচ্ছে তাদেরকে যদি কোনো মুনাফিক জিজ্ঞাসা করে, বদর প্রান্তরে; বনু কোরায়াযার এলাকায় যে নিষ্ঠুর সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, তার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? উত্তরে তারা হয়তো অনায়াসেই ফাতওয়া দিয়ে দিবেন, না এমন সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ড ও হত্যাযজ্ঞ ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ কোরআন হাদীসের অনেক জায়গায় অন্যায় হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। নাউযুবিল্লাহ। কারণ এখানেও বড় একট ফাঁকা আছে। প্রশ্নকারী বলবে আমি কাফের কর্তৃক হাত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা জিজ্ঞেস করেছি। ফাতওয়া প্রদানকারীরা বলবে, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম সম্পর্কে কিছু বলিনি; অন্যায় হত্যা ও জুলুম সম্পর্কে বলেছি।

পাঁচ. আমাদের জানামতে বর্তমান বিশ্বে ইসলামের নামে যেসব মুসলমান জিহাদ করছেন (যারা মুসলমানই নয়, যেমন হুথি শিয়া (মূল আরবী শব্দ حوثي), হিযবুল্লাত (হিযবুল্লাহ), রাফেযী, কুর্দী, নুসাইরি ইত্যাদি তাদের আলোচনা বাদ) কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে তারা মৌলিকভাবে দুটি শিবিরে বিভক্ত; যদিও তাদের আঞ্চলিক ও শাখাগত নাম ভিন্ন ভিন্ন। একটি আলকায়েদা-তালেবান, আরেকটি আইএস। অধিকাংশই আলকায়েদা-তালেবানের সঙ্গে এবং অল্পকিছু আইএসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং ফাতওয়াদাতাদের বাস্তবেই যদি ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এত দরদ থাকত, সৎ সাহস থাকত এবং তারা সত্য প্রকাশ করে মুসলিম উম্মাহর দিকনির্দেশনায় আগ্রহী হতেন, তবে তারা পরিষ্কার আই এস কিংবা আলকায়েদা অথবা তাদের অন্য কোনো অঙ্গসংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে; মুসলমানদের দুশমন পশ্চিমা হলুদ মিডিয়ার তথ্যে নির্ভর না করে; বাস্তব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্টভাবে নাম নিয়ে পরিষ্কার করে বলতে পারতেন, তাদের কর্মকাণ্ড ঠিক কিংবা ঠিক নয়; তাদের কর্মকান্ডের এই অংশ ঠিক ঐ অংশ সংশোধনযোগ্য ইত্যাদি। কিন্তু তা না করে এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে প্রশ্নের মতোই ঘোলমোল ও অস্পষ্ট একটা আন্দাযনির্ভর উত্তর তারা কিভাবে দিলেন?

ছয়. উত্তর থেকে পরিষ্কার সবাই বুঝবে, বর্তমান বিশ্বে জিহাদের নামে যা চলছে সবই সন্ত্রাস, অন্যায় ও ভ্রান্ত। কোনো জিহাদি সংগঠনই হকের উপর নেই। কারণ ফাতওয়াটিতে কাউকেই স্বীকার করা হয়নি; ঢালাওভাবে সবগুলোকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাহলে কী বলবেন তারা সে হাদীস সম্পর্কে, যেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. (صحيح مسلم -النسخة الهندية- ١/ ٨٧).

لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. (صحيح مسلم -النسخة الهندية- ١/ ٨٧).

সাত. সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হল, যেখানে হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের কথা আছে, সেখানে তো একথাও আছে যে, তিনি একটি জিহাদি দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন, যেই দলটি সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জিহাদ চালিয়ে যাবে। অথচ সেই হাদীসটি ব্যবহার করেই বর্তমান দুনিয়ায় জিহাদরত কোনো হক দলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। ইলমের সঙ্গে এর চেয়ে বড় প্রতারণা এবং হাদীসের এর চেয়ে মারাত্মক তাহরীফ আর কী হতে পারে আমাদের জানা নেই। এতো ঠিক সেই ইহুদি পাদ্রীদের ঘটনার পুনরাবৃত্তি, যারা আয়াতের একাংশ হাত দিয়ে ঢেকে রেখে আগে পরে পড়ে যাচ্ছিল।

আট. এভাবে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বলে ঢালাওভাবে ইসলামের জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতা মুফতীদের মাঝে এবং বর্তমান বিশ্বের ইহুদী-খ্রিস্টানদের জিহাদ বিরুধিতার মাঝে কি পার্থক্য?

নয়. ফাতওয়াটিতে বলা হয়েছে- ইসলাম সকল জুলুম অত্যাচার ও অরাজকতা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যেমনটি ইসলামের চার খলিফার যুগে হয়েছে।

প্রশ্ন হল, যারা ফাতওয়া দিয়েছেন তারা কি জানেন না, ইসলামের চার খলিফা জুলুম অত্যাচার দূর করার জন্য জিহাদ করেছেন? তাদের যুগে যেই অন্যায় অনাচার জুলুম অত্যাচার ছিল এখন কি তা হাজার গুন বেশী নয়?

তাহলে বর্তমানেও যে এসব অন্যায় অনাচার দমন করার জন্য জিহাদ প্রয়োজন – একথাটি তারা একবারও উচ্চারণ করার সাহস করলেন না কেন? তাহলে কি আমারা মনে করব– তাদের দৃষ্টিতে চার খলীফার জিহাদের সঙ্গেও ইসলামের কোনো সম্পর্ক ছিল না?

দশ. এই মুফতী সাহেবদের দৃষ্টিতে যারা "ইসলামের নাম ব্যাবহার করে ওরা বিশ্বের দেশে দেশে নিরীহ নাগরিকদের খুন ঝরাচ্ছে" তাদের দমন ও প্রতিরোধ করার জন্যও তো 'জিহাদের অনুমোদন' দেয়া দরকার। সাহস করে অন্তত এতটুকুর অনুমোদনও তো তারা দিতে পারতেন। জিহাদের আয়াত ও হাদীসগুলো ঠিকই আরবীতে উল্লেখ করলেন, কিন্তু বাংলায় জিহাদ প্রয়োজন– এ কথাটি কেন একবারও উচ্চারণ করতে পারলেন না?

এগার. আফগানের জিহাদি ইতিহাসের শুরু থেকে আশির দশকে যখন আফগান তালেবান রাশিয়ার সঙ্গে জিহাদ করে, তখন বাংলাদেশসহ দলমত নির্বিশেষে বিশ্বের সকল উলামায়ে কেরাম তাদের নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়েছেন এবং সাধ্যমতো তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতাও করেছেন। ১৯৯৬/১৯৯৭ ইং সনে যখন তালেবান মুজাহিদরা রাজধানী কাবুলসহ আফগানিস্তানের সিংহভাগ দখল করে তখন সৌদিআরব, পাকিস্তান ও আরব আমিরাত তাদেরকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি পর্যন্ত প্রদান করে। বাংলাদেশেসহ বিশ্বের অনেক আলেম, গবেষক তাদের পক্ষে লেখালেখি করেন এবং সভা সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাদেও সাহায্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান। মাসিক জাগো মুজাহিদ, মাসিক রহমত, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ও ইনকিলাব ইত্তেফাকের মতো জাতীয় দৈনিকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচারিত হয়। অনেকে স্বতন্ত্র বইও রচনা করেনে। এ বিষয়ে অনেক তথ্য সংকলন করেছেন মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী 'মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান: বাংলাদেশ ও তালেবান' গ্রন্থে। প্রকাশক; ইসলামী চেতনা বিকাশের পক্ষে– ফারহাত জাহান সানিয়া, হোলসেলার; কিতাব কেন্দ্র, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, দ্বিতীয় প্রকাশ; জানুয়ারী ২০০৩ ইং।

আরো দেখুন;

১. আল্লাহর পথের মুজাহিদ, মূল; মুফতী রফী উসমানী, অনুবাদ; আবু উসামা, প্রকাশক; মুমতায লাইব্রেরী, পরিবেশক; মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা। ২. رحلتي إلى أرض الجهاد (দেখে এলাম জিহাদ ভূমি) আল্লামা সুলতান যওক নদভী। ৩. আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি,

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী। ৪. বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধঃ ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা, ৫. আফগান ও তালেবান, এ জেড এ শামসুল আলম। ইত্যাদি

আমাদের প্রশ্ন হল, যেই তালেবান ইতিপূর্বে হকপন্থী মুজাহিদ ছিল, সত্যের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আসছিল, যাদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের দ্বিমত ছিল না; এক কথায় বিষয়টি ছিল ইজমায়ী ও সর্বস্বীকৃত, সেই তালেবান এবং একই মানহাজ ও আকিদা বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত আলকায়েদা এখন কীভাবে সন্ত্রাসি হয়ে গেল? তাদের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে বলা হচ্ছে, ইসলামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই?! অথচ তারা তো তাদের আকিদা বিশ্বাস ও মানহাজে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনেনি।

একথা নিশ্চিত ও সর্বস্বীকৃত যে, বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার অমুসলিম কর্তৃক মুসলিম জাতি। এবিষয়ে মুসলিম উম্মাহর কী দায়িত্ব; আলেমদের কী করণীয়? -এবিষয়ে কোনো পদক্ষেপ তো আমরা কাউকে গ্রহণ করতে দেখিনি? কিন্তু যখন কিছু মুসলমান জালিম কাফেরদের অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দাঁড়াল, তখন কেন তা বন্ধ করার জন্য এক লক্ষ আলেমের এই ফাতওয়াপ্রয়াস! তাও আবার সেই জালিম শাসক ও পশ্চিমা কাফেরদেরই তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায়?! ফরিদ সাহেবদের মতো দরবারি আলেমদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে? তিনি কি এখনো বাংলাদেশের আলেমদের নেতৃত্ব দেয়ার মতো যোগ্যতা রাখেন যে, বড় বড় মুফতী সাহেবরা তার অন্ধ অনুসরন করে এভাবে সমর্থন দিয়ে দিলেন?

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা এখানে ফরিদ সাহেবের কর্মকান্ড সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরছি। তথ্যগুলো সামনে আসলে আশা করি যে কোনো ঈমানদারের ভিতর থেকেই এই প্রশ্নগুলো জেগে উঠবে।

ক. ফরিদ সাহেব প্রথমে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দাওয়াতে রাশিয়া গিয়ে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী 'আমান কনফারেন্স' এ অংশগ্রহণ করলেন। তারপর তিনি ইন্ডিয়ায় কনফারেন্স করলেন। তারপর একই বিষয়ে বাংলাদেশেও কনফারেন্স করলেন। এক পর্যায়ে একই বিষয়ে ডি এম পি পুলিশের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রস্তাব করলেন 'ইসলামী জঙ্গিদের' দমন করার জন্য তিনি এক লক্ষ আলেমের দস্তখত নিয়ে ফাতওয়া জারি করবেন। সেখান থেকে এসেই তিনি এই হীনকর্মে লিপ্ত হলেন।

খ. সারাদেশ যখন আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীন শরীয়ত নিয়ে ব্যঙ্গকারী নাস্তিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, এবং তাদের ভাষায় 'অশুভ শক্তি'– হেফাজতে ইসলামের ইমানী আন্দোলনের লংমার্চ প্রতিহত করার জন্য নাস্তিকদের প্রসিদ্ধ আখড়া– ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির হরতালের সঙ্গে অবরোধের ডাক দিয়েছে তখন তিনি জামায়াতবিরোধিতার ছদ্মাবরণে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে গিয়ে নর্তকীদের বেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে সেই নাস্তিকদের সমর্থন দিয়ে আসলেন। বললেন, মওদূদী সাঈদীরা নাকি রাজিব আসিফ থেকেও জঘন্য ও বড় নাস্তিক। আরো ভয়াবহ বিষয় হল, কোন এক টিভি চ্যানেলের লাইভ ফোনিংয়ে এক ব্যক্তি যখন প্রশ্ন করল যে, এমন আন্দোলনে আপনার সংহতি প্রকাশ করা ঠিক হয়েছে কিনা, তখন তিনি উত্তর দিলেন,– "আমি এই বিষয়ে ইস্তেখারা পর্যন্ত করেছি। এরপরে আমি এতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এ সিদ্ধান্তটা আমি আমার জন্য ইবাদত বলে মনে করছি।" দেখুন–

https://www.youtube.com/watch?v=fa3JHD5Y7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=9HqU4Hru70o
https://www.youtube.com/watch?v=DHkgRN7LUUY

গ. তার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সমাজিক সংগঠন ইসলাহুল মুসলিমিনের অফিসে এখনো একজন রাজনৈতিক নেতার বিশাল ছবি সসম্মানে মাথার উপর ঝুলছে। একসময় তার মাদরাসার বিভিন্ন জায়গায়ও এধরনের বিভিন্ন ছবি প্রদর্শিত ছিল।

ঘ. আমাদের জানামতে ইসলামী কোনো জাতীয় দৈনিক আমাদের দেশে না থাকলেও এ যাবত ইসলামের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে আসছে দৈনিক আমার দেশ এবং দৈনিক ইনকিলাব। কিন্তু তিনি দুটি পত্রিকাকে বলছেন হলুদ মিডিয়া সমৃদ্ধ পত্রিকা। অথচ ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় সিদ্ধহস্ত 'জনকণ্ঠ' সম্পর্কে তার **মন্তব্য, এটি সব আলেমদের 'তেলাওয়াত' করা দরকার।**

ঙ. তার সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক পাথেয় থেকে তার প্রচারিত 'ইসলামের' কিছু নমুনা দেখুন-

গাজিপুর চৌরাস্তায় স্থাপিত ভাস্কর্যের পাশ দিয়ে সফররত এক লেখক, শিরকের প্রতীক মূর্তি ও ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে লিখছেন– "বাইরে দৃষ্টি রাখতেই বিশাল এক ভাস্কর্য, রাইফেল হাতে অপলকনেত্রে তাকিয়ে আছে শূন্যের দিকে, নিরব সাক্ষী হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে স্বাধীন

বাংলার স্বাধীন চেতনার বীর বাহাদুর সন্তানদের"। -মাসিক পাথেয়, ডিসেম্বর ২০১৫ ইং, পৃ. ৬।

আরেকজন লিখছেন– "৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিলো মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন প্রজ্ঞার অন্যতম ঘটনা। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করে যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়"। -মাসিক পাথেয়, ডিসেম্বর ২০১৫ ইং, পৃ. ২৬।

যেখানে কোরআনে কারীম বলছে –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)

''হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।''[৪]

সেখানে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ার এই জঘন্য অপবাদ খোদ কোরআনের বাহক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে! নাউযুবিল্লাহ। এতো শতভাগ ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিদের কণ্ঠস্বর।

***

(আবু মুহাম্মাদ কৃত পর্যালোচনাটি এখানে শেষ হল)

অতএব সত্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে মাপকাঠি দিয়ে গেছেন সে মাপকাঠি অনুযায়ী সত্যকে নির্ণয় করাই বেশি নিরাপদ। কুরআন হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যদি মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের অনুসরণকে জরুরী মনে করি,

---

[৪].সূরা মায়েদা- ৫১

তাহলে মনে হয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের সঠিক মাপকাঠি ধরে রাখার তাওফীক দান করুন।

২৩. 'মানব কল্যাণের বিপুল আগ্রহে'

মানক কল্যাণের ব্যবস্থাটা নাস্তিক্যবাদের আদলে হয়ে গেল। যার প্রতি বিপুল আগ্রহ কখনো কাম্য হতে পারে না। মানব কল্যাণের জন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা দিয়েছিল সেটি গ্রহণ করা ছিল মুসলমানদের দায়িত্ব। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু অর্ধ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে ইসলামের শীতল পাটিতে স্থান দিয়েছিলেন। যা জিহাদ ছাড়া কখনো সম্ভব ছিল না। রক্তারক্তি ও কঠোরতা ছাড়া যদি মানব কল্যাণের সহজ আরো কোন পথ থাকত তাহলে সাহাবায়ে কেরাম সে পথটিই গ্রহণ করতেন। জিহাদের মত এমন কঠিন ও কঠোর পথটি ধরতেন না। আল্লাহ তাআলাও এত কঠিন পথ আমাদেরকে দেখাতেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এত কঠিন পথ মাড়াতেন না। মূসা ইবনে নুসায়ের ও তারিক বিন যিয়াদ যে আফ্রিকা মহাদেশ জয় করে ইউরোপের নাভি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, তার দ্বারা কি মানব কল্যাণ সাধিত হয়নি। মানব কল্যাণের সে পদ্ধতিগুলো কি কঠোরতামুক্ত ও রক্তারক্তি ছাড়া হয়েছিল?

আমরা কোন পথে মানব কল্যাণ খুঁজে চলেছি? ইসলামের এ ইতিহাস কি মুছে দেয়া যাবে? আমরা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে ইসলামের ইতিহাসকে অস্বীকার করার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি তা কি কখনো সম্ভব হবে? আমরা কেন ইসলামের বাস্তবতার যথার্থতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি না এবং এ পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্ট করছি না?

২৪. 'অনেক স্থানে তারা বিরূপ সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন'

এরপরও স্বাক্ষর গ্রহণকারীরা দলিলভিত্তিক আপত্তিগুলোর কোন প্রকার জবাব না দিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণের কাজ করেই চলেছে। ভুল প্রকাশ পাওয়ার পরও এবং সে ভুল স্বীকার করে নেয়ার পরও মত পরিবর্তনের প্রয়োজনবোধ করেনি। এ পরিস্থিতি বহু জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত পরিস্থিতি বিস্তারিত তুলে ধরছি।

স্বাক্ষর গ্রহণকারী একটি মাদরাসায় গিয়েছেন। স্বাক্ষর গ্রহণকারীর বয়স ষাটের উর্দ্ধে। কর্তৃপক্ষের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বোঝালেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ

দু'চারটি প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে বুঝে ফেললেন। তবে শুধু কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ প্রধান এবং তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন একজন এদুজন স্বাক্ষর করলেন। সিনিয়র-জুনিয়র আর কোন উস্তায স্বাক্ষর করেননি। তাঁদের বুঝে আসেনি। একটি মাদরাসা থেকে মাত্র দু'টি স্বাক্ষর পাওয়া গেল। স্বাক্ষর গ্রহণকারী বললেন, কাফিয়া জামাত (৯ম শ্রেণি) থেকে উপরের ছাত্ররা স্বাক্ষর করলেই হবে। যিম্মাদার ছাত্রদের কাছে স্বাক্ষরের জন্য পাঠালেন। মাদরাসা মিশকাত জামাত পর্যন্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে মিশকাত, জালালাইন ও শরহে বেকায়ার ছাত্রদের বুঝে আসেনি, তারা ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করে মুফতী হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করল। অবশেষে কাফিয়ার ছাত্রদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হল।

উস্তাযগণ এবং উপরের জামাতের ছাত্ররা যে কারণে স্বাক্ষর করেনি স্বাক্ষর গ্রহণকারী তার কোন উত্তর দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। তার শান্ত্বনা, বড় হুজুর স্বাক্ষর করেছেন, অতএব অন্যরা কেন করেনি তা জানা তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ফাতওয়ার স্বাক্ষর যে বড় হুজুরের অনুসরণ করে করতে হয় না বরং নিজে বুঝে করতে হয় তা হয়ত বোঝার মত বয়স তাদের হয়নি।

যাইহোক সফলতা-বিফলতার দোলাচলে স্বাক্ষর গ্রহণকারী পার্শ্ববর্তী একটি মাদরাসায় গেলেন। দাওরা হাদীস পর্যন্ত মাদরাসা। মুহতামিম একজন তরুণ আলেম। স্বাক্ষর গ্রহণকারী স্বাক্ষরের কাগজ-পত্র মুহতামিমের কাছে পেশ করলেন। স্বাক্ষর সম্পর্কে বলতে গিয়ে শুরুতে এও বললেন, জামাতে কাফিয়া (৯ম শ্রেণি) থেকে উপরের ছাত্ররা স্বাক্ষর করলেও চলবে। মুহতামিম দীর্ঘক্ষণ দেখে চিন্তা ভাবনা করে বললেন, এখানে স্বাক্ষর করলে তো ঈমান থাকবে না। এটি তো সরাসরি জিহাদ বিরোধী একটি ফাতওয়া। স্বাক্ষর গ্রহণকারী যেন বিদ্যুতের শক খেলেন। এরপর দলিল প্রমাণের আলোকে এক ঘন্টা উভয়ের মাঝে এ বিষয়ে কথা হল। স্বাক্ষর গ্রহণকারী ঠান্ডা হয়ে গেলেন।

জবাবের থলি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি আপত্তির জবাবের জন্য ফাতওয়ার আয়োজক গোষ্ঠীর সভাপতি মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদের শরণাপন্ন হলেন। তাকে ফোন করলেন। মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ বার বার আলোচ্য মোহতামিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু মুহতামিম বললেন, আমি তার সঙ্গে ফোনে কথা বলব না। প্রয়োজনে সাক্ষাতে কথা বলব। আপনি দলিলগুলো বুঝে নিন, পরে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।

স্বাক্ষর গ্রহণকারী আয়োজক গোষ্ঠীর সভাপতি ফরীদ উদ্দীন মাসউদের সঙ্গে অনেক্ষণ কথা বললেন। কথা শেষে মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। মনে হল কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। ফোনের মাধ্যমে উত্তর দেয়ার মত কিছু অর্জিত হয়নি। উপস্থিত ছাত্র উস্তায সবাই তাকে ঘিরে বসে আছেন, ভাল কিছু শোনার জন্য। সবাই জানতে চাইলেন, কি পেলেন বলুন? তিনি সহজ সরল উত্তর দিলেন, আমি তো বুঝেছি, কিন্তু আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না। সবাই বলে উঠল, কেন এটা কি খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদের মত? যা বোঝা যায় কিন্তু বোঝানো যায় না? তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

ইতিমধ্যে সাবেক মাদরাসার সিনিয়র অভিজ্ঞ মুহতামিম যিনি বুঝে শুনে স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি ছুটে এসেছেন। কারণ তাঁর সঙ্গে স্বাক্ষরকারীদের দু'য়েকজন এ দ্বিতীয় মজলিসে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে বলা যায় দ্বীনী আমানত রক্ষার্থে আলোচ্য সাবেক মাদরাসার মুহতামিম সাহেবকে ফোন করে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, 'স্বাক্ষর তো করেছেন, এখন দেখি স্বাক্ষর করলে সত্যি ঈমান চলে যাবে। বিষয়টা তো ঈমান কুফরের'। যাইহোক সাবেক মুহতামিম সাহেব এসে প্রথমে তাঁর স্বাক্ষরের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে কিছুক্ষণ মজলিস চালানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। পুরা মজলিস এ কথার উপরই একমত হয়েছে যে, এ আলোচ্য কাগজে স্বাক্ষর করলে সত্যিই ঈমান চলে যাবে।

এরপর সাক্ষর গ্রহণকারীকে এ বলে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে যে, আপনার বয়স এখন ষাটের উর্দ্ধে। জীবনে অনেক ভাল কাজ করেছেন। দ্বীন ও ইসলামের জন্য আপনি অনেক ভাল ভাল অবদান রেখেছেন। জীবনের শেষে এসে দয়া করে আপনি এ ঈমান বিধ্বংসী কাজটি করবেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে এ মুহূর্তের পর থেকে আর একজন মানুষকেও এখানে স্বাক্ষর করার কথা বলবেন না। দয়া করে এ ভয়ংকর কাজ থেকে বিরত থাকুন। স্বাক্ষর গ্রহণকারী বিনীতভাবে সায় দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

কিন্তু আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তিনি তার স্বাক্ষর গ্রহণ করা থেকে বিরত হননি। এ ফাতওয়াকে কেন্দ্র করে পরবর্তিতে যা যা হয়েছে সব জায়গায় তাকে আগে আগে দেখা গেছে। এখনো দেখা যাচ্ছে। একটি ইলমী বিষয় এবং দ্বীনী বিষয়ে ভুলের উপর বিরূপ মন্তব্য নিয়ে যতটা মাথাব্যথা

দেখা যাচ্ছে সে বিষয়টি যে ভুল এবং দলিল বিরোধী তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।

ইলমী ও দ্বীনী কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত ভুল ও দলিলশূন্য প্রমাণিত হওয়ার পর সিদ্ধান্তদাতাদের করণীয় কী? এ বিষয়ে ইলম ও শরীয়তের কোন মূলনীতি নেই? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন।

২৫. 'একমাত্র আল্লাহর তাওফীক, তাঁর রহমত এবং নুসরতেই...'

খেয়ানতের চিত্রগুলো সামনে আসলেই নুসরত ও তাওফীকের হাকীকত প্রকাশ পেয়ে যাবে। জিহাদের মত একটি রুকনকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যে অপকর্মের আয়োজন তা আল্লাহর নুসরতে ও তাওফীকে সম্পাদন হয়েছে - এমন কথা বলা বা ধারণা করা কুফর। কুফর ও গুনাহের কাজে আল্লাহ তাআলা ঢিল দেন, নুসরত করেন না এবং তাওফীক দেন না।

২৬. 'জাতিসংঘ'

এ ফাতওয়ার আয়োজক গোষ্ঠী যদি মনে করে থাকে, তারা তাদের এ ফাতওয়াটি কুরআন-হাদীসের দালিলের আলোকে তৈরি করেছে, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য করেছে তাহলে এ ফাতওয়ায় আল্লাহর দুশমনদের, জাতিসংঘের কী কাজ? এবং এ ফাতওয়া নিয়ে তাদের দরবারে কিসের আশায়? নোবেলের আশা করার মত দালালি কি হয়ে গেছে? গিনিস বুকে নাম উঠানোর জন্য তো অনুনয় বিনুনয় চলছে। বাকি অষ্টম আশ্চর্যের খাতায় নাম উঠানোরও চেষ্টা করা যেতে পারে। কারণ স্বজাতির পায়ে এক সঙ্গে একলক্ষ কুঠারাঘাত করার মত আশ্চর্যজনক ঘটনা মনে হয় এর আগে পৃথিবীর বুকে আর কখনো ঘটেনি।

২৭. 'ওআইসি'

ওআইসির সদস্যদের কে কে মুফতী? কী খেতাব পাওয়ার জন্য তাদের শরণাপন্ন হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে? জিহাদ বিরোধী ফাতওয়ার আয়োজকদের ভাষ্যমতে ওআইসির মহাসচিব ফাতওয়ার আয়োজক কমিটির সভাপতিকে জিজ্ঞেস করেছেন, এ ফাতওয়া বিষয়ে বিশ্বের বড় বড় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র এবং বড় বড় ইসলামী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে কি

না? এ প্রশ্নের জবাবে সভাপতি বলেছেন, বিভিন্ন ধর্মগুরুদের কাছে এর খবর পৌঁছেছে এবং তারা এ ব্যাপারে পজেটিভ মন্তব্য করেছেন। যাদের মধ্যে ভ্যাটিকান সিটির পোপও রয়েছে।

আমাদের মত যারা শুধু ইসলাম সম্পর্কে সামান্য পড়াশোনা করেছে তাদের জন্য এ কথা বোঝা মুশকিল যে, মুসলমানদের একটি ফাতওয়ার মাঝে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও ইসলামী ব্যক্তির পরিবর্তে খৃস্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও খৃস্ট ধর্মীয় গুরু পোপের সত্যায়নের গুরুত্ব কেন বেশি? এ বিষয়টি তারাই বেশি বোঝার কথা যারা শিশুকালেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও .... দেরকে গিলে ফেলেছে। সক্রেটিস ও আরাসতুকে গলায় জড়িয়ে নিয়েছে, আইনস্টাইন ও গিরিশ চন্দ্র সেনকে নিজের আইকন বানিয়েছে। পোপ ও দালাইলামার গুরুত্ব কোন অল্প শিক্ষিত মুসলমানের দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়!

২৮. 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি'

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বলেছে, 'ধর্ম-বর্ণ-দল-মতের উর্দ্ধে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হবে'।

সবার মাঝে প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, গবেষকদের কাছে সে ব্রাহ্মণ, তার লেখা ও বক্তব্যের আলোকে অত্যাধুনিক অনুসারীরা তাকে নাস্তিক বলতে পছন্দ করে। নাস্তিকতার অগ্রপথিক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে তাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়। রবীন্দ্রনাথের শত্রু-মিত্র কেউ কখনো তাকে মুসলমান বলে সন্দেহ করেনি। শত্রু-মিত্র সবাই জানে, সে যে ধর্মেরই হোক মুসলমানদের শত্রু হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রপতির বক্তব্য হচ্ছে, এ লোকটার আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাকে আদর্শ বানাতে হবে। অযথা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপতি ধর্মের উর্দ্ধে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে বলছে। এ বক্তব্যের অনুবাদ যদি এভাবে করা হয়, 'রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি বর্ণের সঙ্গে টক্কর লেগে যায় তাহলে বর্ণের তোয়াক্কা করা যাবে না, যদি দলের সঙ্গে টক্কর লাগে তাহলে দলের তোয়াক্কা করা যাবে না, মতের সঙ্গে টক্কর লাগলে মতের তোয়াক্কা না করে রাবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই প্রাধান্য দিতে হবে, এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সাথে যদি ধর্মের টক্কর লাগে তাহলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই প্রাধান্য দিতে হবে বা দেয়া চাই' -এভাবে তরজমা

করলে কি তরজমাটা ভুল হবে? যদি তরজমা ভুল না হয় তাহলে এ কথা এবং এধরণের অসংখ্য কুফরী কথা বলার পর রাষ্ট্রপতি মুসলমান না মুরতাদ?

যদি মুসলমান হয় তাহলে কীভাবে? আর যদি মুরতাদ হয় তাহলে এমন ব্যক্তির দরবারে মুসলমানদের জিহাদ বিষয়ক একটি ফাতওয়া উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য কী? উপস্থাপকরা তার কাছ থেকে কি পেতে চায়? আর এমন ব্যক্তি মুসলমানদের ধারক-বাহক হওয়ার দাবিদারদের মুখে মহামান্য হয় কীভাবে? মান্য ও মহামান্য শব্দগুলোর কি কোন অর্থ নেই? মুসলমানদের মান্য ও মহামান্য কে হবে? কোন মুরতাদ একজন মুসলমানের মান্য ও মহামান্য হওয়ার বৈধ পদ্ধতি কী? কোন অমুসলিম বা মুরতাদকে মান্য বা মহামান্য বানানো বা মনে করা বা মহামান্য বলে প্রকাশ করা কি ঈমান পরিপন্থী নয়? শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম ও ইলমে ওহীর তালেবানের কাছে আমার এ নিবেদন, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে বিষয়গুলোকে আর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। আবেগ ও শঙ্কাকে এড়িয়ে একটু শরীয়তের উসূলের আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছার পথে পা বাড়ান। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক গন্তব্যে আশা করি পৌঁছে দেবেন।

২৯. 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তে একটি করে কপি অর্পণ করবো ইনশাআল্লাহ'

এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতে নিশ্চয় সমাজতন্ত্র (কমিউনিজম-নাস্তিকতানির্ভর মতবাদ), গণতন্ত্র (নাস্তিকতানির্ভর মতবাদ), ধর্মনিরপেক্ষতা (যে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব মুক্ত নাস্তিকতানির্ভর মতবাদ), ও জাতিয়তাবাদ (সাম্প্রদায়িকতা) -এ কুফরী মতবাদগুলোর সফল বাস্তবায়ককেই বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান যেহেতু এ চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে সেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতে ঐ ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে যে এ চারটি কুফরী মতবাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য সংবিধান তৈরি করেছে, বা সংবিধান সংস্কার করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বশক্তির আয়োজন করে রেখেছে। এ প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় সে প্রধানমন্ত্রী যে কিছু দিন আগে মুসলমানদরেকে দুর্গা ও সরস্বতী পূজায় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছে এবং নিজের দলের মুসলমান (?) কর্মীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করেছে। শিরক ও পূজায় অংশগ্রহণ ও

সহযোগিতার আহবান করার পর একজন মুসলমানের (যদি সে আগে থেকে মুসলমান থেকে থাকে) ঈমানের কী অবস্থা হওয়ার কথা?

নিশ্চয় এ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান এবং মসজিদে মন্দিরে মোনাজাত ও দোয়া হয়েছে। দেখুন-

'শেকাবহ আগস্ট, শোক, শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ' শিরোনামে

প্রথমআলো, নিজস্ব প্রতিবেদক, আপডেট: ০২:১৪, আগস্ট ১৬. ২০১৬, প্রিন্ট সংস্করণ

"ঢাকার মতো সারা দেশেই তৃণমূল আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন সংগঠন শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে বঙ্গবন্ধুকে। মসজিদ, মন্দিরসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন শোক দিবসের অনুষ্ঠানমালা সরাসরি সম্প্রচার করেছে। সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে।"

প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তির মাঝে সুনির্দিষ্টভাবে অসংখ্য কুফরী বিদ্যমান রয়েছে সে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাননীয় হয় কীভাবে? একজন মুসলমান কেন কোন অমুসলিমকে মেনে চলবে? আর মুসলমানদের কোন ফাতওয়ার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? মুসলমানদের ধারক-বাহক হওয়ার দাবিদার কেউ যদি কোন অমুসলিমকে নিজের লেখা একটি ফাতওয়া উপহার দেয় তাহলে এর অর্থ কী দাঁড়ায়? এবং এর উদ্দেশ্য কী হতে পারে? নচেৎ যারা কোন ধর্মের পক্ষ গ্রহণ করে না ধর্মের ফাতওয়ায় তাদের কী কাজ?

আরো ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, এমন জঘন্য একটি ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' এর ব্যবহার। একটু ভয় কেন হয় না। জিদের ফল আসলেই এত নির্মম?

৩০. 'বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, দয়া চাপলেসহ ... স্বতঃপ্রনোদিত...সহযোগিতা করেছেন'

ইসলামের একটি বিধান সম্পর্কিত ফতোয়ার ব্যাপারে ইহুদী-খৃস্টান কর্তৃক পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর এত অগ্রহ কেন? মুসলমানদের কোন কাজের উপর যদি ইহুদী-খৃস্টানসহ অমুসলিমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আগ্রহ দেখায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সহযোগিতা করে তাহলে বিষয়টি কি মুসলমানদেরকে ভাবিয়ে তোলার কথা নয়? আল্লাহ তাআলা যখন বলছেন-

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. (سورة البقرة ١٢٠).

"আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। -সূরা বাকারা ১২০

তখন এ পরিস্থিতির উপর মুসলমান শঙ্কাবোধ না করে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করে কীভাবে? এ ক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করার মানে তো হচ্ছে দ্বীন ও ইসলাম থেকে হাত ধুয়ে বসা। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যুলুম করে করে এভাবে আর কতকাল ইসলামের শত্রুপক্ষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকব এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজতে থাকব?

৩১. 'সবাইকে আল্লাহ্ পাক নেক বদলা দিন'

এখানে সামান্য আগে উল্লিখিত সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদ কর্মীদের জন্যই দোয়া করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এরা সবাই অমুসলিম। কেউ ঘোষিত, আর কেউ অঘোষিত। অমুসলিমদের জন্য এ দোয়ার হুকুম কী? কিতাবাদিতে দেখা দরকার। কোন অপকর্মের তো নেক বদলা হতে পারে না। ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীদের জন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপের ঘোষণা রয়েছে। আর যদি ধরে নেয়া হয় আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদেরকে নেক বদলা দেবেন, তাহলে নেক বদলা হতে পারে তাদেরকে ঈমানের দৌলত দান করবেন। কিন্তু তারা ঈমানদার হলে তো এ ফাতওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং এ ফাতওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করবে। তখন ফাতওয়ার আয়োজকদের উপায় কি হবে?

আর যদি নেক বদলা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, এ ধরনের অপকর্মের মাঝে আরো বেশি অগ্রসর হওয়া, তাহলে প্রশ্ন আসবে এমন দোয়াকারীর শেষ হাশর কী? অতীত ইতিহাসে এমন দোয়াকারীদের ব্যাপারে কী কী কথা বর্ণিত হয়েছে?

৩২. 'আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মর্যাদা শীর্ষমার্গে নিয়ে যাবে'

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল হচ্ছে কুফরের নিয়ন্ত্রণে। সে পরিমণ্ডলে উচ্চমার্গ অর্জন করার সহজ পথ হচ্ছে কুফরকে আলিঙ্গন করা। ইসলামের কথাকে উপরে রেখে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্থান করে নেয়া অতীতে কখনো সম্ভব হয়নি, ভাবিষ্যতেও কখনো তার কোন সম্ভাবনা নেই।

তবে আয়োজকরা যেটা চাচ্ছে তা অবশ্য হবে, হওয়া সম্ভব। জিহাদ বিরোধী ফাতওয়ার আয়োজকরা চাচ্ছে, বাংলাদেশের মর্যাদাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শীর্ষমার্গে নিয়ে যেতে। এটি একটি যুক্তিসংগত কামনা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের মোড়লরা ইসলামের জিহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছে। জিহাদকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছে। ইসলামবিরোধী মোড়লরা জিহাদের বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছে বিশ্বের চামচা দেশগুলো সে অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে যে যত অগ্রগামী হতে পারবে সেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তত শীর্ষমার্গে স্থান করে নিতে পারবে।

আর এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অবশ্যই অনেক সম্ভাবনাময়। কারণ বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রকাশ্য কুফরী শক্তি বা রাজ শক্তিই জিহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছে। আর সাধারণত ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনতা নিজেদেরকে তা থেকে বিরত রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এক ব্যতিক্রম দেশ যেখানে কুফরী শক্তি ও রাজ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ধারক-বাহক হওয়ার দাবিদাররাও জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইসলামের সঙ্গে উপহাসের স্বাক্ষর স্বরূপ জিহাদের সবগুলো আয়াত ও হাদীসকে দুমড়ে মুচড়ে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করার অপচেষ্টা প্রকাশ্যে করা হয়েছে। এতে করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল এত বেশি খুশি হয়েছে যার কোন তুলনা হয় না। সুতরাং কুফরী শক্তি কর্তৃক পরিচালিত বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা উচ্চমার্গে উঠবে -এ কামনা করা খুবই যুক্তিসংগত এবং এটাই এর একমাত্র পদ্ধতি বলা যায়।

৩৩. 'এ ধরনের বড় কাজ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোথাও কখনও হয়েছে...'

আমি জানি। এমন কাজ পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কখনও কোথাও হয়নি। এমনটি হওয়া সম্ভবও নয়। কোন জাতি এভাবে তার নিজের পায়ে এক সঙ্গে এক লক্ষ কুড়ালের আঘাত কখনও করেনি। কোন জাতির কর্ণধার হওয়ার দাবিদাররা কখনো এভাবে স্বজাতির শিকড়গুলো এক লক্ষ ছুরি নিয়ে কেটে দেয়নি, দেয়ার চেষ্টা করেনি।

বিশ্ব কুফরীশক্তি ইসলামকে টেররিজম উপাধিতে ভূষিত করে ইসলামের পক্ষের সকল লড়াইকে সন্ত্রাস বলে বিশ্বের নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ করেছে। ইসলামের জিহাদকে যখন কুফরীশক্তি সন্ত্রাস বলে প্রচার করে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতাশটি জিহাদকে সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে, রাসূল, রাসূলের সাহাবী, খোলাফায়ে রাশেদীন, ইসলামের ইতিহাসের সকল মুজাহিদ, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, নূরুউদ্দীন জঙ্গী, সুলতান মাহমূদ গজনবী, মুহাম্মদ আল ফাতেহ, সাইয়েদ আহমদ বেরলভী, ইসমাঈল শহীদ, শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামাসহ ইসলামের ইতিহাসে সকল মুজাহিদকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে চলেছে তখন মুসলমানদের কর্ণধার হওয়ার দাবিদার একটি হতভাগা কাফেলা একই সুরে বিশ্ব কুফরী শক্তির তালে তাল মিলিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। শত্রুর জন্য এভাবে মাঠ তৈরি করে দেয়ার উদাহরণ আসলেই পৃথিবী কখনো দেখেনি। কুফরীশক্তি শত্রু যদি এরপরও সন্তুষ্ট না হয় তাহলে আর করার কিছু নেই।

শত্রু যে কাজ করতে শত বছর লাগত তা আজ শত বছর এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি তা মুসলমানদের ফাতওয়ার মাধ্যমে হয়েছে, অতএব মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আপত্তি উঠারও সুযোগ নেই। ইসলামীশক্তির পক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিরোধের মুখে পড়ারতো প্রশ্নই আসে না। কুফরীশক্তি মুসলমানদেরকে দমন করে যাবে, নিধন করে যাবে। কোন বাধা নেই। কারণ তারাতো সন্ত্রাস দমন করছে। তাদের ধর্মগুরুর পক্ষ থেকে বাধাতো নেইই; বরং উৎসাহ আছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করার কোন অধিকার নেই; কারণ তাদের কর্ণধাররা তা করতে নিষেধ করেছেন। মুসলমানদের ধর্মগুরু এক লক্ষ সাহেব বলেছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হিংস্রতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা। মুসলমানের জন্য এটা মানায় না। মুসলমানদের জন্ম

হয়েছে শত্রুর হাতে মার খেয়ে নিজের টুপি দিয়ে শত্রুর কপালের ঘাম মুছে দেয়ার জন্য। কারণ মুসলমান হচ্ছে জাহেলী যুগের অসহায় কন্যা শিশু। জীবন্ত পুঁতে ফেলার জন্য গর্ত খুঁড়তে গিয়ে ঘাম ঝরলে সে ঘাম কন্যা শিশুটিই মুছে দেবে। কুফরীশক্তি এমন প্রতিপক্ষ পেয়েও যদি কৃতজ্ঞতা আদায় না করে তবে এ শত্রুর মত হতভাগা আর নাই।

৩৪. 'তিন শ্রেণী থেকে আমাদের বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে'

আর সাত শ্রেণীর কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। যথা: (১) মুরতাদ/যিন্দিক/মুলহিদ শ্রেণী। (২) প্রতারিত শ্রেণী। (৩) ভীতু শ্রেণী। (৪) লোভী শ্রেণী। (৫) বেখবর-গাফেল শ্রেণী। (৬) শিশু শ্রেণী। (৭) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিপরীতে উস্তাদের আদব রক্ষাকারী শ্রেণী।

জিহাদবিরোধী দাজ্জালী এ ফাতওয়ায় যারা স্বাক্ষর করেছে সরেজমিন তদন্ত করে জরিপ চালিয়ে তাদের মাঝে মোট এ সাত শ্রেণীর লোক পাওয়া গেছে। এ সাত শ্রেণীর খবর আমি সরাসরি সংগ্রহ করেছি। এর বাইরে আরো কোন অপদার্থ শ্রেণীও থাকতে পারে, তবে তাদের ব্যাপারে সারাসরি কোন তথ্য আমার কাছে নেই। এ প্রত্যেকটি শ্রেণী সম্পর্কে কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। পাঠকবর্গ একটু ধৈর্যের পরিচয় দিলে স্বাক্ষরকারীদের দল-উপদলের পরিচয় লিখতে ও বলতে আগ্রহবোধ করব।

১) মুরতাদ/যিন্দিক/মুলহিদ শ্রেণী: এ ফাতওয়ায় যারা স্বাক্ষর করেছে তাদের একটি দল হচ্ছে যারা এর মাঝে উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্রশ্ন ও উত্তর দেখেছে, বুঝেছে, অনুধাবন ও উপলব্ধি করেছে। এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করলে ঈমান চলে যাবে এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছে, ঈমান না যাওয়ার পক্ষে কোন দলিল দাঁড় করাতে পারেনি। কিন্তু এরপরও এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করেছে।

এ ফাতওয়ায় যেসব আয়াতের তাহরীফ করা হয়েছে সেসব তাহরীফের সঙ্গে একাত্বতা ঘোষণা করেছে। কুরআনের বিকৃতি কুফর। বনী ইসরাঈলের আহবার ও রুহবান তাহরীফের অপরাধেই কাফের হয়েছে। কুরআনের যে আয়াতটি কারূনের জন্য এসেছে সে আয়াতটিকে ইসলামের নামে যারা জিহাদ করছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। যে আয়াতটি ফেরাউনের যাদুকরদের ব্যাপারে এসেছে সে আয়াতকে মুজাহিদদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। কুরআনের যে আয়াতে ফিতনা বলে কুফর-শিরককে বুঝানো হয়েছে

সে ফিতনাকে শিরকের বিপরীতে জিহাদী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। মানসূখ-রহিত আয়াতের বিধানগুলো মুজাহিদগণের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
আর এগুলোর প্রত্যেকটি কুফর। অতএব এ প্রথম প্রকারের স্বাক্ষরকারী যারা এ সব কিছু দেখে এবং জেনে শুনে স্বাক্ষর করেছে তারা জেনে শুনেই কুফরীর শিকার হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে এ কথা স্পষ্ট যে, জিহাদ একটি সদা চলমান বিষয়, কেয়ামত পর্যন্ত যা কখনো বন্ধ হবে না। যা একটি কাফেলা সর্বদা চালিয়ে যাবে। এ ফাতওয়া দাবি করতে চেয়েছে, পৃথিবীতে জিহাদের কোন কাফেলা নেই। জিহাদের নামে যত কাফেলা কাজ করছে তারা সবাই সন্ত্রাসী। এ ফাতওয়ার আলোকে জিহাদের কোন কাফেলার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যা মুতাওয়াতির বিশ্বাসের বিপরীত কুফরী আকীদা। প্রথম প্রকারের স্বাক্ষরকারীরা এ বিষয়টি জেনেই এতে স্বাক্ষর করেছে।
এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একটি জনগোষ্ঠী এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করেছে, যে ধর্মনিরপেক্ষতা কুফরী মতবাদ হওয়ার বিষয়ে এ পর্যন্ত কারো কোন দ্বিমত হয়নি।

পূজা-পার্বনে মুসলমানরা হিন্দুদেরকে সহযোগিতা করবে এ বিশ্বাস পোষণকারী একটি কাফেলাও এতে স্বাক্ষর করেছে।
অমুসলিমদের সঙ্গে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখা যাবে না। কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে হলেও তাদের সঙ্গে ভালবাসা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে মনে করে এমন একটি দলও এতে স্বাক্ষর করেছে।

এ হিসাবে বোঝা যায় মুরতাদ শ্রেণীর একটি বড় অংশই এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করেছে। যাদের কারো ঈমান স্বাক্ষর করার আগেই চলে গেছে, আর কারো ঈমান এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করার কারণে চলে গেছে।
এ ছাড়া পোপ, দালাইলামা, জাতিসংঘ, হাউজ অব কমেন্স ও আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্যরাতো আছেই যারা এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষরের দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছে।

২) প্রতারিত শ্রেণী: স্বাক্ষরকারী একাধিক মুফতী ও দারুল ইফতার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, তাদেরকে শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন দেখানো হয়েছে। বাকি নয়টি প্রশ্নই তাদেরকে দেখানো হয়নি। একটি প্রশ্নের জবাবের উপর

স্বাক্ষর গ্রহণ করে সে স্বাক্ষর প্রকাশ করা হয়েছে দশটি প্রশ্নের জবাবের উপর স্বাক্ষর হিসাবে।

কোন ক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে, এ ফাতওয়া একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সম্পর্কে যাদের সঙ্গে জিহাদী কর্মকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। এ ফাতওয়া যে পৃথিবীর সকল জিহাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তা বুঝতেই দেয়া হয়নি। নাদান মুফতী আর দারুল ইফতাগুলো এভাবেই প্রতারিত হয়ে নিজের অজান্তে এক লক্ষের সারিতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

৩) ভীতু শ্রেণী: ঢাকা শহরের স্বাক্ষরকারী কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দারুল ইফতা ও গুরুত্বপূর্ণ মুফতীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বলেছেন, আমাদেরকে স্বাক্ষর করার জন্য বার বার এত বেশি বলা হয়েছে যে, আমরা শঙ্কাবোধ করতে শুরু করেছি না জানি আবার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এতে নিজের ক্ষতির পাশাপাশি মাদরাসারও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, সেগুলোর একটি মাদরাসার অধিকার নিয়ে দুই পক্ষ মামলার শিকলে আবদ্ধ। আর এ সুযোগটাকেই ফাতওয়ার আয়োজক গোষ্ঠী কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। বিশেষত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ক্ষমতাসীনরা দখল করে রাখার কারণে ভয়ের কারণ শত গুণ বেড়ে গেছে।

৪) লোভী শ্রেণী: মাদরাসার জন্য বিশেষ সহযোগিতা পাওয়া যাবে এমন আশ্বাসের ভিত্তিতে অনেকে স্বাক্ষর করেছে। সরকার পক্ষীয়রা প্রায় জায়গায় এ স্বাক্ষর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যেমন স্বাক্ষর না করলে শঙ্কাবোধ করেছে তেমনিভাবে স্বাক্ষর করলে কিছু পাওয়ার আশাও করেছে। এ ছাড়া কোন কোন জায়গায় সুস্পষ্ট আশ্বাস ও ধমকি দেয়াও হয়েছে। লোভী শ্রেণীকে এরপর তো আর আটকে রাখা যায় না। তারা তাদের ঈমান ঠিক রেখেই ঈমাননাশক ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করে দিয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

৫) বেখবর শ্রেণী: এ বেখবর ও গাফেল শ্রেণী বিভিন্ন পর্বে এ গাফলত ও বেখবরীর শিকার হয়েছে। যথা, এক তরুণ এক মুহতারামের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী সেরা মাদরাসার মুহাদ্দিস এবং কয়েক মাদরাসার শায়খুল হাদীস। এক লক্ষ পরিবারের খুব কাছাকাছি অবস্থান। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করা কি শুধু

কবীরা গুনাহের বিষয় না ঈমান কুফরের প্রশ্ন? তিনি যেন শক খেলেন। বলে ফেললেন, আমিও তো স্বাক্ষর করেছি।

তরুণ তাঁকে মাসিক পাথেয় পত্রিকার কয়েকটি উদ্ধিতি দিয়ে বিষয়টি তাঁর সামনে তুলে ধরল। তিনি বললেন, আমি তো আসলে বিষয়টি এত গভীরভাবে ভেবে দেখিনি। পাথেয় পত্রিকাও আসলে পড়া হয় না। আরো বলেছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু টার্গেট হয়ে গেছি। অর্থাৎ এ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে তিনি টার্গেট হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচালেন। বলা হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষরকারীদের যে হুকুম তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে পাল্টা বিবৃতি দিতে হবে। তিনি বললেন, এটা কি সম্ভব? বলা হল, তাহলে আর কী করার আছে? শরীয়ত তো তার গতিতে চলবে।

৬) শিশু শ্রেণী: সচেতন দ্বীনদার শ্রেণী যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে ও ভয় করে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর পাওয়া যাবে না এ আশঙ্কায় স্বাক্ষর গ্রহণকারীরা প্রচুর পরিমাণে নাবালেগ শিশুদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করেছে। যেমন আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফাতওয়ার আয়োজক গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে যার নাম আসে সে ব্যক্তি একাধিক মাদরাসায় গিয়ে অকপটেই ঘোষণা করে দিয়েছে, কাফিয়া জামাতের (৯ম শ্রেণী) ছাত্ররা স্বাক্ষর করলেও হবে।

কিন্তু ঢাকার একাধিক মাদরাসা থেকে আমি খবর পেয়েছি, সেখানে উপরের জামাতের ছাত্ররা স্বাক্ষর না করার কারণে উর্দ্ধ জামাতের ছাত্রদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্ররা যখন বুঝতে পারছিল না এটা কি বিষয়ে স্বাক্ষর, তখন তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের উস্তায বলেছেন স্বাক্ষর করতে তাই স্বাক্ষর কর। তোমাদের উস্তাযরা তোমাদের চাইতে ভাল বোঝেন।

আমার জরিপ মতে শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ স্বাক্ষর হবে অবুঝ তালেবে ইলমদের। বিষয়টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক, বিষয়টি হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইলমী তাহকীকের। স্বাক্ষর চলছে অবুঝ তালেবে ইলমদের, গাইরে মুকাল্লাফ শিশুদের।

কোন কোন মহল থেকে জবাব দেয়া হয়েছে অমুক বড় হুজুর স্বাক্ষর করেছেন, তাহলে আমি স্বাক্ষর করতে সমস্যা কোথায়? এ ফালতু প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, সব চাইতে বড় হুজুরতো হচ্ছেন এক লক্ষ সাহেব। এরপর

হেটে হেটে স্বাক্ষর গ্রহণ করার দরকারটা কী? বিশ্বের সেরা বড় হুজুর যখন এর আয়োজক তখন ঐ হুজুরের উদ্ধৃতিতে ষোল কোটি মানুষের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করে দিলেই তো হয়। আর ষোল কোটিই বা কেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর করে দিলেই তো হয়। অথবা এ শান্তির পক্ষে তো পৃথিবীর কাফের মুশরিক সবাই, অতএব মনে করলেই হয় যে, এ ফাতওয়ায় বিশ্বের সকল মানুষের স্বাক্ষর রয়েছে। কারণ এর আয়োজক বিশ্বের সেরা হুজুর।

আর যদি স্বাক্ষর করার অর্থ হয়, স্বাক্ষরকারী নিজের তাহকীক অনুযায়ী নিশ্চিত হয়েছে যে, এ ফাতওয়া সঠিক এবং সে ভিত্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাহলে এ কথা বলার কোন সুযোগ নেই যে, অমুকে করেছে, আমি করলে সমস্যা কী?

৭) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপরীতে উস্তাযের আদব রক্ষাকারী শ্রেণী: স্বাক্ষরকারীদের এক দলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর তারা বহু রকমের দলিল দিয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। দলিলের ঝুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পর বললেন, আপনি কি আমাকে আমার উস্তাযের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলেন? আমি বললাম, উস্তাযের বিরুদ্ধে বলবেন কেন? আমি তো আপনাকে শরীয়তের মাসআলা জিজ্ঞেস করেছি। বললেন, হোক তবু তিনি অনেক বড় মানুষ। বললাম, শরীয়তের যে হুকুম তার ব্যাপারে কী বলা? বললেন, আমরা ছোট মানুষ, এত বড় মাসআলা নিয়ে আমাদের ভাবার প্রয়োজন নেই। বললাম, উস্তাযের বিপরীত অবস্থান এত কঠিন বেয়াদবী বলে মনে হচ্ছে, বুঝে শুনে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিপরীতে অবস্থান নেয়া সামান্য রকমের বেয়াদবী বলেও মনে হচ্ছে না কেন? বললেন, ঠিক আছে আপনার কথা। তবুও....

৩৫. আমরা জেহাদের বিরুদ্ধে কাজ করছি এই অপবাদ তুলে...

এটা অপবাদ হবে কেন? এ ফাতওয়ার আলোকে জিহাদের কোন অস্তিত্ব বের করে আনা কারো দ্বারা সম্ভব নয়। **এ ফাতওয়ার আয়োজক ও অনুসারীরা অবশ্যই জিহাদের অস্বীকারকারী। কারণ-**

১) বিশ্বের চলমান প্রত্যেকটি জিহাদী কাফেলাকেই সন্ত্রাসী বলা হয়েছে এবং কোন একটি জিহাদী কাফেলাকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। যার অনিবার্য ফলাফল পৃথিবী শরয়ী জিহাদ থেকে শূন্য। অথচ সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু

দাউদ ইত্যাদি গ্রন্থের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, মুজাহিদদের সর্বশেষ কাফেলা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করা পর্যন্ত একটি তায়েফা আল্লাহর পথে কিতাল-জিহাদ করে যাবে। সুতরাং একটি কাফেলাকেও স্বীকৃতি না দেয়ার অর্থই হচ্ছে শরীয়ত সমর্থিত জিহাদকে অস্বীকার করা।

২) এমন কোন কথাও বলা হয়নি যে, এই এই শর্ত যে কাফেলার মাঝে পাওয়া যাবে সেটি সঠিক জিহাদী কাফেলা। যার অর্থ দাঁড়ায় জিহাদের কোন সঠিক মাপকাঠিও দেয়া হয়নি; বরং জিহাদের নামে যা কিছু চলছে সব কিছুকে সন্ত্রাস বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যা কোন জিহাদের আস্বীকারকারীই করতে পারে।

৩) এ ফাতওয়ার মধ্যে জিহাদের যে সংজ্ঞা করা হয়েছে তা প্রমাণ করে এরা জিহাদকে অস্বীকার করে। কারণ এ সংজ্ঞার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অসংখ্য জিহাদ এবং সকল ফুকাহায়ে কেরামের কৃত জিহাদের সংজ্ঞার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। জিহাদের সংজ্ঞার মূল স্তম্ভই হচ্ছে مقاتلة الكفار কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আর সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসে এ জিহাদই জিহাদ ছিল। এ থেকে বোঝা যায় এ ফাতওয়ার আয়োজকরা সীরাত, ইসলামের ইতিহাস ও ফিকহের পরিভাষায় যা জিহাদ তাকে অস্বীকার করে নতুন কোন কিছুকে জিহাদ বলে চালিয়ে দিতে চায়।

৪) এ আয়োজক গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রসঙ্গেই বলেছে, ইসলামে মারামারি নেই রক্তারক্তি নেই। আর মারামারি ও রক্তারক্তি ছাড়া জিহাদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়; সুতরাং তারা যে জিহাদকে অস্বীকার করছে এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন সুযোগ নেই।

৫) যে সকল আয়াতকে রহিত করে জিহাদের আয়াত নাযিল হয়েছে সে মানসূখ-রহিত আয়াতগুলোকে এ ফাতওয়ার আয়োজকরা জিহাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছে। কাফের-মুশরিকদেরকে ক্ষমা করা, তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া বিষয়ক যত আয়াত নাযিল হয়েছে এবং যেসব আয়াতের ব্যাপারে সকল মুফসসিরীনে কেরাম বলতেই থেকেছেন যে, এ আয়াতগুলো জিহাদের আয়াত দ্বারা মানুসুখ-রহিত হয়ে গেছে সেসব আয়াত উল্লেখ করে করে কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে ভাল আচরণ করতে হবে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, এ ফাতওয়া

জিহাদের বিরোধিতার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। কারণ মানসূখ আয়াতকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করার অর্থই হচ্ছে নাসেখ আয়াতের হুকুমকে অস্বীকার করা।

কেউ যদি মদের হুকুম বয়ান করার জন্য

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

আয়াতটি দিয়ে মদের বৈধতার পক্ষে দলিল দেয়, তাহলে অবশ্যই বলা হবে সে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আয়াতের হুকুমকে অস্বীকার করে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৬) কুরআনের যে আয়াতগুলো কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে সে আয়াতগুলোকে চলমান জিহাদী কাফেলাগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। ফেরাউন, কারূন, নমরুদের ব্যাপারে যেসব আয়াত এসেছে সেসব আয়াতকে প্রয়োগ করা হয়েছে সেসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা ইসলামের নামে জিহাদ করে চলেছে। এ বিষয়গুলো কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

৭) কাফের-মুশরিক তথা অমুসলিম গোষ্ঠী যারা আজীবন জিহাদের বিপক্ষে তারা আজ সম্মিলিতভাবে এ ফাতওয়ার পক্ষে। রাসূল ও সাহাবার জিহাদকে যারা সন্ত্রাস বলে তারা সবাই আজ এ ফাতওয়ার পক্ষে। খৃস্টান ধর্মগুরু পোপ এ ফাতওয়ার পক্ষে। বৌদ্ধদের ধর্মগুরু দালাইলামা এ ফাতওয়ার পক্ষে। এরপরও কি বুঝতে বাকি আছে যে, এ ফাতওয়া জিহাদের বিরুদ্ধে এবং এর মাধ্যমে জিহাদকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৮) এ ফাতওয়ার অনুসারীদের জন্য জিহাদের বাস্তবমুখী কোন রূপ দাঁড় করানো সম্ভব নয়। যার অনিবার্য ফলাফল জিহাদকে অস্বীকার করা।

১০) এ ফাতওয়ার আয়োজকরা ভূখন্ডের জন্য এবং ভাষার জন্য লড়াই করাকে জিহাদ বলেছে এবং এ লড়াইয়ে যারা মারা গেছে তাদেরকে শহীদ বলেছে, যাদের মাঝে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানও আছে। যে পথ জিহাদ ও শহীদ হওয়ার পথ নয়, সে পথকে ও সে পথকে শহীদ হওয়ার পথ বলার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে শরীয়তের জিহাদকে অস্বীকার করা।

১১) কুফরী আইন ও সংবিধানের রক্ষক বাহিনী জিহাদী কর্মকাণ্ড দমন করতে গিয়ে মারা গেলে এ ফাতওয়ার আয়োজক গোষ্ঠী তদেরকে শহীদ বলেছে।

যার অনিবার্য ফলাফল জিহাদকে এবং জিহাদের পথে শহীদ হওয়াকে অস্বীকার করা।

৩৬. 'অন্তরে যাদের মরচে পড়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র'

কাদের অন্তরে মরিচা পড়েছে সে সম্পর্কে ফয়সালা আমরা কুরআন থেকেই নিতে পারি। যাদের অন্তরে মরিচা পড়েছে তাদের বাহ্যিক আকৃতিতে কী কী প্রভাব দেখা যেতে পারে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তা বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোর সঙ্গে মরিচা পড়া অন্তরগুলোকে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ.

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ.

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (سورة التوبة ٨١-٩٠).

"পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায়

জিহাদ করতে এবং তারা বলল, তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না। বল, জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত। অতএব তারা অল্প হাসুক, আর বেশি কাঁদুক, তারা যা অর্জন করেছে তার বিনিময়ে।

অতএব যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে বের হওয়ার অনুমতি চায়, তবে তুমি বল, তোমরা আমার সাথে কখনো বের হবে না এবং আমার সাথে কোন দুশমনের বিরুদ্ধে কখনও লড়াই করবে না। নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছ, সুতরাং তোমরা বসে থাকো পেছনে (বসে) থাকা লোকদের সাথে। আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে।

আর তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের দুনিয়ার জীবনে আযাব দিতে চান এবং কাফির অবস্থায় তাদের জান বের হয়ে যাবে। আর যখন কোন সূরা এ মর্মে নাযিল করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ কর, তখন তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা তোমার কাছে অনুমতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা বসে থাকা লোকদের সাথে থাকব। তারা পেছনে থাকা লোকদের সাথে থাকা বেছে নিল এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দেয়া হল, ফলে তারা বুঝতে পারে না।

কিন্তু রাসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সে সব লোকের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটিই মহাসফলতা। আর গ্রামবাসীদের থেকে ওযর পেশকারীরা আসল, যেন তাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং (জিহাদ না করে) বসে থাকল তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক আযাব আক্রান্ত করবে। -সূরা তাওবা ৮১-৯০

সুতরাং মরিচা কোন অন্তরে পড়েছে তা নিয়ে আর সংশয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

৩৭. 'শান্তির দেশ, সহাবস্থানের দেশ, এই প্রিয় দেশ'

যে দেশ শতভাগ কুফরী আইন ও কুফরী সংবিধানে পরিচালিত, প্রধান বিচারপতি হিন্দু, বিচারকদের বৃহৎ একটি অংশ ঘোষিত অমুসলিম, অধিকাংশ অঘোষিত অমুসলিম, বাকি সবাই কুফরী এ আইন দিয়ে বিচার করতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করে না, রাষ্ট্রের মূলনীতিতে সব ধর্মের মান সমান, এ কুফরী আইনের প্রহরার জন্য রয়েছে লক্ষ লক্ষ বাহিনী এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ, সে দেশে যারা শান্তিতে আছে তারা কারা? এসব কিছু যাদের অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করে না তারা কারা?

সহাবস্থানের এ চিত্র মুসলমান কীভাবে মেনে নেয়? মুসলমানদেরকে তো শরীয়তের পক্ষ থেকে সহাবস্থানের এমন পদ্ধতি দেয়া হয়নি। এ সহাবস্থানের উপর তো মুসলমানদের কান্না আসার কথা, গর্ববোধ হয় কীভাবে? মুসলমানদের সহাবস্থানে যে কাফের থাকবে সে হয় তো যিম্মি হিসাবে থাকবে, নয় তো গোলাম-ক্রিতদাস হিসাবে থাকবে। সম অধিকার আর সম শক্তি নিয়ে এবং শরীয়তের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে এ সহাবস্থান মুসলমান কোথায় পেয়েছে?

যে প্রিয় দেশকে কুফরমুক্ত করা যায়নি সে প্রিয় দেশে তো থাকার অনুমতি নেই। থাকতে হলে শরীয়ত স্বীকৃত অপারগতার ভিত্তিতে থাকতে পারবে, আর নয় দেশকে কুফরীমুক্ত করার প্রচেষ্টার জন্য থাকতে পারবে। শুধু প্রিয় হওয়ার কারণে প্রিয় দেশে থাকার অনুমতি নেই। প্রিয় দেশ যত দিন ইসলামের দখলে আসবে না তত দিন প্রিয় দেশ নিজের দেশ নয়। একজন মুসলমানের জন্য তা নিজের দেশ হতে পারে না।

৩৮. 'আতঙ্কবাদী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে?'

মুসলমানদেরকে এমন কর্মকাণ্ড করার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হয়েছে যা কাফেরদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. (سورة الأنفال ٥٩-٦٠).

"আর কাফিররা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা (আযাবের) নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, নিশ্চয় তারা (আল্লাহকে আযাব প্রদানে) অক্ষম করতে পারে না। আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না"। -সূরা আনফাল ৫৯-৬০

যারা আল্লাহর শত্রু তাদেরকে ভয় দেখাতে হবে। আর যারা আল্লাহর বন্ধু তারা ভয় দেখাবে। তৃতীয় কোন বিভাগ নেই, যে বিভাগের লোকেরা আল্লাহর শত্রু নয়, আবার ভয় পাবে।

৩৯. 'হানাহানি নির্মূল করার জন্যই মহান ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব'

হানাহানি অর্থ যদি হয় যুদ্ধ ও লড়াই, তাহলে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত কুফরী শক্তি ও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. (صحيح مسلم، النسخة الهندية. ١/ ٨٧)

لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. (صحيح مسلم، النسخة الهندية. ١/ ٨٧)

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم. (صحيح البخاري، باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)

এ হানাহানি নির্মূল হওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে সকল কাফের মুসলমান হয়ে যাওয়া। অথবা সারা পৃথিবী মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যাওয়া। যত দিন

পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে তত দিন পর্যন্ত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে হানাহানি চলতেই থাকবে।

এটাই কুরআনের হুকুম।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

(سورة البقرة ١٩٤).

"আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই''। সূরা বাকারা ১৯৩

আর হানাহানি দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় মুসলমানে মুসলমানে মারামারি তাহলে ইসলাম অবশ্যই তা নির্মূল করবে। সন্ধির মাধ্যমে তা নির্মূল করার চেষ্টা করা হবে, তবে সন্ধির মাধ্যমে সম্ভব না হলে অস্ত্রের মাধ্যমে করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

(سورة الحجرات ٩-١٠).

"আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে''। সূরা হুজুরাত ৯-১০

এছাড়া মুসলমান যতদিন কাফেরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না তত দিন পর্যন্ত তাদের পরস্পরের লড়াই বন্ধ হবে না। হওয়ার কথা নয়।

৪০. 'ইসলাম শান্তি ও ভালবাসার ধর্ম'

ইসলাম আত্মসমর্পণ ও একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের ধর্ম। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (سورة الذاريات ٦٧). -

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে"। -সূরা যারিয়াত ৫৬

এ ধর্মে আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালের শান্তি রেখেছেন। এ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। এ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ওমর রাযিয়াল্লাহ তাআলা আনহু তরবারী হাতে নিয়ে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামকে পৃথিবীর দিগ দিগন্তে পাঠিয়েছিলেন। আলহামদু লিল্লাহ! সে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেও শত ভাগ। কিন্তু আজ যখন মুসলমান শান্তি প্রতিষ্ঠার সে অস্ত্র শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে, শত্রুর জন্য সে অস্ত্র ব্যবহার করাকে বৈধ করে দিয়ে, মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহার করা হারাম করে দিয়েছে তখন অশান্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ অশান্তির অপনোদন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবার সে অস্ত্রই হাতে নিতে হবে।

ভালবাসার এ ধর্ম মুসলমানদেরকে বলেছে, পরস্পরকে ভালবাসতে। আর বলেছে কাফেরদের সঙ্গে শত্রুতা করতে, বিদ্বেষ রাখতে। হ্যাঁ, পুরা সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা রাখবে। সে ভালবাসার সুবাদে তাকে শান্তির পথে আসার দাওয়াত দেবে। শান্তির রাজপথ দেখিয়ে দেবে। যদি সে গ্রহণ না করে তাহলে তার সঙ্গে শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদর্শ হিসাবে দিয়েছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে। আর দিয়েছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনকে। উম্মত যেন কোথায় ভালবাসা হবে, আর কোথায় শত্রুতা হবে? কখন ভালবাসা হবে, আর কখন শত্রুতা হবে? এ বিষয়গুলোতে তালগোল পাকিয়ে না ফেলে সে জন্য খুলে খুলে সব বলে দিয়েছেন। এরপরও উম্মত যা করছে তাকে আর অজ্ঞতা বলা চলে না, তাকে হঠকারীতাই বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. (سورة مريم ٤١-٤٨).

"আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী, নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয় শয়তান হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। সে বলল, হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও। ইবরাহীম বলল, তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। আর আমি তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত তোমরা কর তাদের পরিত্যাগ করছি এবং আমি আমার রবের ইবাদাত করছি। আশা করি আমার রবের ইবাদাত করে আমি ব্যর্থ হব না"। -সূরা মারয়াম ৪১-৪৮

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. (سورة التوبة ١١٣-١١٤).

"নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী। নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের

ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল''। সূরা তাওবা ১১৩-১১৪

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (سورة الممتحنة ٤–٥).

"ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তিটি ব্যতিক্রম: 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়''। -সূরা মুমতাহিনা ৪-৫

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ

الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. (سورة الفتح ٢٩).

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ড় কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন''। -সূরা ফাতহ ২৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. (سورة التوبة ١٢٣).

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন''। সূরা তাওবা ১২৩

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা বলেনি, অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে। আর মনস্থ করেছে এমন কিছুর যা তারা পায়নি। আর তারা একমাত্র এ কারণেই দোষারোপ করেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন।

এরপর যদি তারা তাওবা করে, তবে তা হবে তাদের জন্য উত্তম, আর যদি তারা বিমুখ হয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক আযাব দেবেন, আর তাদের জন্য যমীনে নেই কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী"। সূরা তাওবা ৭৩-৭৪

তাফসীর ও ফিকহের আলোকে এ আয়াতগুলোর প্রয়োগ কীভাবে হবে তা আবার একটু দেখে নেয়া মুসলমানদের দায়িত্ব। দৃষ্টান্ত

৪১. 'শান্তি বিধাতা'

কুরআন তরজমায় 'আসসালাম' এর অর্থ করা হয়েছে, 'সকল দোষ থেকে মুক্ত'। এ ফাতওয়ায় লেখা হয়েছে 'শান্তি বিধাতা'। অর্থটি আবার দেখা দরকার। আর 'আসসালাম' অর্থ যদি শান্তি বিধাতা হয় তাহলে মুজাহিদগণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর বৈপরীত্য কোথায়? এমনিভাবে تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ এর সঙ্গেই বা এর বৈপরীত্য কোথায়? শান্তির বিধাতা এ ধর্মের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য শান্তির ওয়াদা করেছেন, তাঁর শত্রুদের জন্য হত্যা, বন্দি এবং সর্বশেষ জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। এসব শান্তির বিধাতারই দান।

৪২. ادخلوا في السلم كافة

আয়াতের দাবি হচ্ছে, মুসলমান দাবি করতে হলে ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানকে মানতে হবে। ভাল লাগলেও মানতে হবে না লাগলেও মানতে হবে। কোন কোন বিধান মনের বিপরীত হতেও পারে সেখানেও মানতে হবে। জিহাদ কষ্টকর মনে হতে পারে, খারাপ লাগতে পারে, জিহাদী কর্মকাণ্ডকে পছন্দ করতে মনে না চাইতে পারে, তবু মানতে হবে। মন কবুল করবে না তবু মানতে হবে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা

তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না''। -সূরা বাকারা ২১৬

মুসলমান হতে হলে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। মিষ্টি লাগলে মহাসমারোহে প্রচার করা হবে, আর ঝাল লাগলে বিরুদ্ধে ফাতওয়া দেয়া হবে -এভাবে মুসলমান হওয়া যাবে না। ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করতে হবে; নচেৎ কঠোর ব্যবস্থা।

৪৩. لهم دار السلام عند ربهم

এ শান্তির নিবাস হচ্ছে জান্নাত, যেখানে শুধু মুসলমানরাই থাকবে। মুসলিম-অমুসলিমের সহাবস্থানের কোন শান্তির নিবাস নয়। এ শান্তির নিবাসে যেন মানুষ যেতে পারে সে জন্য রয়েছে তাদেরকে প্রথমে এ সঠিক পথের দাওয়াত দেয়া, যদি দাওয়াত কবুল না করে তাহলে তাদের জন্য রয়েছে জিহাদের ব্যবস্থা। জিহাদ না করে শান্তির স্বপ্ন দেখার ব্যবস্থা ইসলামে নেই। ইসলামের ছায়াতলে না এসে শান্তির কোন ব্যবস্থা নেই। ইসলাম ও ইসলামের জিহাদ ব্যতীত শান্তির স্বপ্ন দেখায় জাতিসংঘ ও নোবেল পুরস্কারের আয়োজকরা। জানি না এ ফাতওয়ার আয়োজকরা কি সে ধরনের কোন শান্তিই চাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে নোবেল শান্তি পুরস্কারের চারা লাগিয়ে চলেছে?

লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে মুরতাদ বানিয়ে মাদার তেরেসা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। দেশের কোটি কোটি মানুষকে সুদের সঙ্গে জড়াতে পেরে ড. ইউনুস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। এবার জিহাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়ে যদি শান্তিতে আরেকটি নোবেল পাওয়া যায় তাহলে দেশের মুখ বিশ্ব দরবারে আরো উজ্জ্বল হবে। বারটা বাজলে মুসলমানদের ইসলামের বারটা বাজবে। নোবেল বিজয়ীর তো কোন সমস্যা নেই।

ইসলামে তো শান্তির নিবাসের দিকে আল্লাহ তাআলা এভাবে ডেকেছেন, শান্তির নিবাসের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন-

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. (سورة الأنعام ١٢٥-١٣١).

"সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ–সঙ্কুচিত করে দেন, যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না। আর এ হচ্ছে তোমার রবের সরল পথ। আমি তো বিস্তারিতভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি এমন কওমের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে শান্তির আবাস এবং তারা যে আমল করত, তার কারণে তিনি তাদের অভিভাবক। আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন বলবেন, হে জিনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাদের অভিভাবকরা বলবে, হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা পৌঁছে গিয়েছি সে কালে, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলবেন, আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে। তবে আল্লাহ যা চান (তা ভিন্ন কথা)। নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আর এভাবেই আমি যালিমদের কতককে কতকের বন্ধু বানিয়ে দেই, তারা যা অর্জন করত সে কারণে। হে জিন ও মানুষের দল, তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের নিকট রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করত? তারা বলবে, আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা ছিল কাফির। তা

এই কারণে যে, তোমার রব যুল্‌মের কারণে জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না তার অধিবাসীরা গাফিল থাকা অবস্থায়"। -সূরা আনআম ১২৫-১৩১

এর সঙ্গে তো নোবেল ওয়ালাদের শান্তির কোন সম্পর্ক নেই।

৪৪. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله

এ আয়াতে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে যদি তারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় তাহলে সে প্রস্তাবে সাড়া দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো একজন মুসলমানের জানা থাকা দরকার তা হচ্ছে, ১) এ চুক্তি ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠাকারীদের সঙ্গে কুফরী আইন প্রতিষ্ঠাকারীদের সঙ্গে। কুফরী আইন প্রতিষ্ঠাকারী দুই পক্ষের পরস্পর সন্ধিচুক্তির কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। ২) যুদ্ধবিরতি চুক্তি একেবারেই একটি সাময়িক চুক্তি, যা কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য হতে পারে না। জতিসংঘের শান্তিচুক্তি বা এ ধরনের কোন চুক্তির সঙ্গে এ চুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ৩) ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিলেই এ যুদ্ধ বিরতি চুক্তি বাতিল করে দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া ফিকহের কিতাবাদিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আরো বহু শর্তের ভিত্তিতে এ চুক্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর যুদ্ধবিরতি এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলিমদের লড়াই চলতে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যা কখনো কখনো সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ থাকতে পারে।

এ বিষয়ে ফিকহের কিতাবাদি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে-

(ويجوز الصلح) على ترك الجهاد (معهم بمال) منهم أو منا (لو خيرا) لقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) (وننبذ) أي نعلمهم بنقض الصلح تحرزا عن الغدر المحرم (لو خيرا) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة. (**الدر المختار مع رد المحتار**٦\٢١٦-٢١٧ دار عالم الكتب).

وَالْآيَةُ مُقَيَّدَةٌ بِرُؤْيَةِ الْمَصْلَحَةِ إجْمَاعًا لقوله تعالى (وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ) (محمد:٣٥) أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ. (**رد المحتار**٦\٢١٧ دار عالم الكتب).).

فإن قيل: هذه الآية منسوخة في قول ابن عباس بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون، وفي قول مجاهد بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، فكيف جاز الاحتجاج بها؟

أجيب: بأن هذه الآية محمولة على ما إذا كانت في المصالحة مصلحة للمسلمين بدليل آية أخرى وهي قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} (محمد: ٣٥)، وبدليل الآية الموجبة للقتال والا لزم التناقض، لما أن موجب الأمر بالقتال مخالف الأمر بالمصالحة، فلا بد من التوفيق بينهما، وهو بما ذكرنا بدليل موادعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل مكة على ما ذكر في الكتاب... (بخلاف ما إذا لم تكن خيراً) متصل بقوله إذا كان خيراً، يعني لا يجوز الصلح إذا لم يكن خيراً للمسلمين (لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى) أما صورة فظاهر حيث ترك القتال. وأما معنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسلمين لم يكن في تلك الموادعة دفع الشر فلم يحصل الجهاد معنى أيضاً. (**البناية** ٥١٤\٦- ٥١٦ دار الفكر).

باب الموادعة ومن يجوز أمانه

الموادعة المسالمة، وهو جهاد معنى لا صورة، فأخره عن الجهاد صورة ومعنى. وما قيل لأنه ترك الجهاد وترك الشيء يقتضي سبق وجوده فغير صحيح، بل يتحقق ترك الزنا وسائر المعاصي ممن لم توجد منه أصلا ويثاب على ذلك، وكيف وهو مكلف بتركها في جميع عمره؟ وإلا كان تكليفا بالمحال.

قوله: (وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم بمال وبلا مال وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به) لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، والآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى، وهي قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون}، فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع. وفي السلم كسر السين وفتحها مع سكون اللام وفتحها ومنه قوله تعالى وألقوا إليكم السلم ومقتضى الأصول أنها إما منسوخة إن كانت الثانية بعدها أي نسخ الإطلاق وتقييده بحالة المصلحة أو المعارضة في حالة عدم وجود المصلحة إن لم يعلم ثم ترجح مقتضى المنع أعني: آية ولا تهنوا كما هو القاعدة في تقديم المحرم. وأما حديث موادعته عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية عشر سنين فنظر

فيه بعض الشارحين بأن الصحيح عند أصحاب المغازي أنها سنتان، كذا ذكره معتمر بن سليمان عن أبيه، وليس بلازم، لأن الحاصل أن أهل النقل مختلفون في ذلك فوقع في سيرة موسى بن عقبة أنها كانت سنتين، أخرجه البيهقي عنه، وعن عروة بن الزبير مرسلا، ثم قال البيهقي: وقولهما سنتين يريدان بقاءه سنتين إلى أن نقض المشركون عهدهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لفتح مكة، وأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق وهي عشر سنين اه. وما ذكره عن ابن إسحاق هو المذكور في سيرته وسيرة ابن هشام من غير أن يتعقبة، ورواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال، ورواه أحمد رحمه الله في مسنده مطولا بقصة الفتح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن إسحاق فساقه إلى أن قال على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وكذا رواه الواقدي في المغازي حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي بردة عن واقد بن عمرو فذكر قصة الحديبية إلى أن قال على وضع الحرب عشر سنين الخ. والوجه الذي ذكره البيهقي وجه حسن به تنتفي المعارضة فيجب اعتباره فإن الكل اتفقوا على أن سبب الفتح كان نقض قريش العهد حيث أعانوا على خزاعة وكانوا دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في مدة الصلح فوقع الخلاف ظاهرا بأن مراد من قال سنتين أن بقاءه سنتان ومن قال عشرا قال إنه عقده عشرا كما رواه كذلك فإنه لا تنافي بينهما حينئذ والله سبحانه أعلم.

قوله ولا يقتصر الحكم وهو جواز الموادعة على المدة المذكورة وهي عشر سنين لتعدي المعنى الذي به علل جوازها وهو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم فإنه قد يكون بأكثر بخلاف ما إذا لم تكن الموادعة أو المدة المسماة خيرا للمسلمين فإنه لا يجوز لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى وما أبيح إلا باعتبار أنه جهاد وذلك إنما يتحقق إذا كان خيرا للمسلمين وإلا فهو ترك للمأمور به. (**فتح القدير**، باب الموادعة ومن يجوز أمانه ٥\٤٤٠–٤٤١ دار الكتب العلمية).

(وإذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب) لأنه لا مصلحة في ذلكلما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى أو تأخيره، لأن الموادعة طلب الأمان وترك القتال، قال تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) ﴿محمد: ٣٥﴾ (وإن لم يكن لهم قوة فلا بأس به) لأنه خير للمسلمين، قال تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) ﴿الأنفال: ٦١﴾ أي إن مالوا إلى المصالحة فمل إليهم وصالحهم، والمعتبر في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين، فيجوز عند وجود المصلحة دون عدمها، ولأن عليهم حفظ أنفسهم بالموادعة، ألا ترى أنه (صلى الله عليه وسلم) صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين، ولأن الموادعة إذا كانت مصلحة المسلمين كان جهادا معنى ، لأن المقصود دفع الشر وقد حصل، وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة، لأن تحقيق المصلحة والخير لا يتوقت بمدة دون مدة. **(الاختيار لتعليل المختار ١٦\٤-١٧ دار الرسالة العالمية تحقيق شعيب الأرنؤوط).**

قوله: (ونصالحهم ولو بمال لو خيرا) لقوله تعالى: [وإن جنحوا للسلم فاجنح لها] (الأنفال ٦١) ووادع رسول الله أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به فإذا وقع الصلح أمنوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم وأمن من أمنوه وصار في حكمهم كما في الولوالجية. أراد بالصلح العهد على ترك الجهاد مدة معينة أي مدة كانت ولا يقتصر الحكم على المدة المذكورة في المروي لتعدي المعني إلى ما زاد عليها. وقيد بالخير لأنه لا يجوز بالإجماع إذا لم يكن فيه مصطلحة.

وأطلق في قوله ولو بمال فشمل المال المدفوع منهم إلينا وعكسه والأول ظاهر إذا كان بالمسلمين حاجة إليه لأنه جهاد معنى ولأنه إذا جاز بغير المال فبالمال أولى وإن لم يكن إليهم حاجة به لا يجوز لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى. **(البحر الرائق ١٣٣\٥ العلمية).**

قال: وإن قالوا للمسلمين وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغى للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون}. ولان الجهاد فرض، فانما تركوا الموادعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا. إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون. فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم.

قال الله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}. وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين. ولان حقيقة الجهاد في حفظ قوة أنفسهم أولا ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم. فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظواقوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلون، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة كما قال الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.

وكذلك لو قالوا للمسلمين: وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالا معنوما على أن تجروا علينا أحكامكم، فليس ينبغى الموادعة على ذلك لانهم لا يلتزمون شيئا من أحكامنا، وإنما ينتهى القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الاسلام فيما يرجع إلى المعاملات، والرضا منهم بالمقام في دار الاسلام مقهورين. ولما فيه ترك المحاربة أصلا، ولا يوجد ذلك فيما طلبوا.

ولانهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما يظنون أنا إنما نقاتلهم طمعا في أموالهم، بل لا يشكون في ذلك، ولا يحل للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم. إلا أن يكون لهم شوكة شديدة فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم. فلان يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى. وهذا المال لا يؤخذ عوضا عن ترك القتال، وإنما يوخذ لان مالهم مباح لنا. فباعتبار تلك الاباحة يؤخذ هذا المال منهم. **(السير الكبير)**.

(باب الموادعة ومن يجوز أمانه): (وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به) لقوله تعالى{ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} { ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين }، ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به، ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها ، بخلاف ما إذا لم يكن خيرا؛ لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى (**العناية**).

وإذا طلب قوم من أهل الحرب الموادعة سنين بغير شيء نظر الإمام في ذلك فإن رآه خيرا للمسلمين لشدة شوكتهم أو لغير ذلك فعله لقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} (الأنفال: ٦١) ولأن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- (صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين).

فكان ذلك نظرا للمسلمين لمواطئة كانت بين أهل مكة وأهل خيبر وهي معروفة ولأن الإمام نصب ناظرا ومن النظر حفظ قوة المسلمين أولا فربما يكون ذلك في الموادعة إذا كانت للمشركين شوكة أو احتاج إلى أن يمعن في دار الحرب ليتوصل إلى قوم لهم بأس شديد فلا يجد بدا من أن يوادع من على طريقه وإن لم تكن الموادعة خيرا للمسلمين فلا ينبغي أن يوادعهم لقوله تعالى {ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} (محمد: ٣٥) ولأن قتال المشركين فرض وترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز فإن رأى الموادعة خيرا فوادعهم ثم نظر فوجد موادعتهم شرا للمسلمين نبذ إليهم الموادعة وقاتلهم . (**المبسوط**).

وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به لقوله تعالى {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} ووادع رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها بخلاف ما إذا لم يكن خيرا لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى. وإن صالحهم مدة ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم

وقاتلهم لأنه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر. (**الهداية**، باب الموادعة ومن يجوز أمانه).

وشرطها الضرورة، وهي ضرورة استعداد القتال بأن كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة المجاوزة إلى قوم آخرين، فلا تجوز عند عدم الضرورة، لأن الموادعة ترك القتال المفروض، فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال، لأنها حينئذ تكون قتالا معنى. قال الله تبارك وتعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم} وعند تحقق الضرورة لا بأس به لقول الله تبارك وتعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} وقد روي أن رسول الله وادع أهل مكة عام الحديبية على أن توضع الحرب عشر سنين، ولا يشترط إذن الإمام بالموادعة حتى لو وادعهم الإمام أو فريق من المسلمين من غير إذن الإمام جازت موادعتهم، لأن المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين، وقد وجد. (**بدائع الصنائع ٩\١٣٥ دار الكتب العلمية**).

(وَيُصَالِحُهُمْ وَلَوْ بِمَالٍ إنْ خَيْرًا) أَيْ يُصَالِحُ الْإِمَامُ أَهْلَ الْحَرْبِ إنْ كان الصُّلْحُ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لها} أَيْ مَالُوا لِلصُّلْحِ. وَصَالَحَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَهْلَ مَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ على أَنْ يَضَعُوا الْحَرْبَ بَيْنَهُمْ وكان في ذلك نَظَرٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِمُوَاطَأَةٍ كانت بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ خَيْبَرَ وَلِأَنَّ الصُّلْحَ جِهَادٌ في الْمَعْنَى إذَا كان فيه مَصْلَحَةٌ إذْ الْمَقْصُودُ من الْجِهَادِ دَفْعُ الشَّرِّ. (**تبيين الحقائق**).

88. والله يدعو إلى دار السلام

ইমাম সুয়ূতী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, [وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَار السَّلَام] أَيْ السَّلَامَة وَهِيَ الْجَنَّة بِالدُّعَاءِ إِلَى الْإِيمَان [وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء] هِدَايَته [إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم] دِين الْإِسْلَام । যার অর্থ হচ্ছে জান্নাত। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ফাতওয়ার আয়োজকরা কি কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ, হানাহানি, কাটাকাটি, দাঙ্গা ছেড়ে দিয়ে তাদের সরাসারি জান্নাতে নিয়ে যেতে চায়? কাফেরদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যাবে

না, কাফেরদেরকে হত্যা করা যাবে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। যখন পরিস্থিতি এমন তখন তাদেরকে নিয়ে দারুস সালামে বসবাস করার যে আয়োজন চলছে তার সম্ভাব্য ব্যবস্থা কী?

একলক্ষ সাহেবের মতে এ দারুস সালাম দুনিয়াতে না আখেরাতে? যদি আখেরাতে হয় মুফাসসিরগণ যেমনটি বলেছেন তাহলে দারুস সালাম হচ্ছে জান্নাত। কিন্তু সেখানে মুসলিম ও অমুসলিমের সহাবস্থানের পদ্ধতি কী? আর যদি এ দারুস সালাম দুনিয়ায় হয় তাহলে এ দারুস সালাম পৃথিবীর কোন ভূখন্ডটি? যেখানে আল্লাহর আইন চলে সেটি? নাকি যেখানে কুফরী আইন চলে তা? এর সমাধান কিন্তু একলক্ষ সাহেবকেই দিতে হবে।

আর যদি এসব কিছুই উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এ আয়াতটি এখানে কেন উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? এমনিভাবে এ প্রশ্নের উত্তরে আরো যেসব আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এ মাসআলার কী সম্পর্ক? আল্লাহর নাম, বেহেশতের নাম, যুদ্ধ বিরতি ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে আলোচ্য প্রশ্ন ও উত্তরের কী সম্পর্ক? পাত্রে-অপাত্রে শান্তি শব্দের বার বার উচ্চারণের হেতু কী? এবং সুবিধা কী?
নাকি ঘুরেফিরে সে আশঙ্কাই সঠিক!

আমি জানি না, নোবেল পুরস্কারের আয়োজকরা হয়তো বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্র এমন একটি জরিপও করে যে, কোন ব্যক্তি তার জীবনে কত কোটি বার 'শান্তি' শব্দটি উচ্চারণ করেছে। অবশ্য এটা শুধুমাত্র শান্তিতে নোবেলের ক্ষেত্রেই হবে, অন্যগুলোতে নয়।

৪৫. 'ইসলাম কেবল মানুষ নয় সব প্রাণী ও জীবজন্তুর নিরাপত্তা দেয়'

শুধু নিরাপত্তা দেয় না আল্লাহর দুশমনদেরকে। যে ইসলাম সকল জীব জন্তুর নিরাপত্তা দেয় সে ইসলামই সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত কাফের মুশরিকদের বিরদ্ধে লড়াই করে যেতে আদেশ করেছে। যে আদেশের অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে তাদেরকে হত্য করা। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলা হয়েছে এবং যাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার কী পদ্ধতি? একটু কিতাবের আলোকে বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়।

৪৬. 'একটি পিপিলিকা তোমাকে কেটেছে অথচ তুমি পুরো একটি সম্প্রদায়কে'

একজন মুসলমানের এ কথা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, ইসলামের শুরু থেকে আজো পর্যন্ত ইসলামের পক্ষ থেকে অস্ত্র তাক করা হয়েছে আল্লাহর দুশমনদের দিকে। পিপিলিকা কখনো আল্লাহর দুশমন নয়। কুরআন ও হাদীস স্পষ্ট করে এ কথাই বলে যে, এসকল মাখলূক আল্লাহর দুশমন তো নয়ই; বরং তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আল্লাহর ইবাদতকারী কোন মাখলূককে আল্লাহর নাফরমান কোন মাখলূকের সঙ্গে তুলনা করা কত বড় অন্যায়!

৪৭. فرأينا حمرة معها فرخان

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নিস্পাপ পাখিকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন, সে হাদীস দিয়ে দলিল দেয়া হচ্ছে জিহাদের নামে কোন অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া যাবে না। কারণ তারা মানুষ। অথচ সাহাবী বলছেন, তখন আমরা এক সফরে ছিলাম। বলাবাহুল্য, দুয়েকটি সফর ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাকি সব সফরই ছিল জিহাদের সফর। সে সফরেই হয়তো তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে আল্লাহর দুশমন কিছু মানুষকে হত্যা করে ফিরে আসছেন, অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। এত সুস্পষ্ট কথাগুলোকে আমরা কিসের স্বার্থে লুকিয়ে চলেছি। বা কিসের আশায় লুকিয়ে চলেছি।

৪৮. ...فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش

আবারও সে উদাহরণটি দিয়েই জিহাদের বিষয়ে উম্মতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। একটি কুকুর নাপাক হলেও সে নিরাপরাধ। আল্লাহর কোন দুশমন কখনো একটি নিরাপরাধ কুকুরের বরাবর হতে পারে না। আর সে কারণেই আল্লাহর এ রাসূল মুরতাদদের একটি জামাতকে يأكل الثرى পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনা প্রসিদ্ধ। সবারই জানা। কিন্তু হঠকারীতা যখন মানুষকে অন্ধ করে দেয় তখন সে মৃত ব্যক্তির মত। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. 'আলবিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ' গন্থে সীরাতের এ অংশটিকে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

قال الواقدي في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري الى العرنيين، الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم في آثارهم كرز بن جابر في عشرين فارسا فردوهم.

وكان من أمرهم ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل وعرينة وفي رواية من عكل أو عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقالوا: يا رسول الله! انا أناس أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى اذا كانوا بناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه و سلم واستاقوا الذود وكفرو بعد اسلامهم، فبعث النبي صلى الله عليه و سلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. قال قتادة فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا خطب بعد ذلك حض على الصدقة ونهى عن المثلة.

وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك وفي رواية مسلم عن معاوية بن قرة عن أنس أن نفرا من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم، فأسلموا وبايعوه وقد وقع في المدينة الموم وهو البرسام فقالوا هذا الموم قد وقع يا رسول الله لو أذنت لنا فرجعنا الى الابل، قال نعم فاخرجوا فكونوا فيها، فخرجوا فقتلوا الراعيين وذهبوا بالابل وعنده سار من الانصار قريب عشرين فأرسلهم اليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم.

وفي صحيح البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس أنه قال قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال الحقوا بالابل واشربوا من أبوالها وألبانها فذهبوا وكانوا فيها ما شاء الله فقتلوا الراعي واستاقوا الابل فجاء الصريخ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترتفع الشمس حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بها وقطع أيديهم وأرجلهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا ولم يحمهم. وفي رواية عن أنس قال فلقد رأيت أحدهم يكدم الارض بفيه من العطش قال أبو قلابة فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه و سلم. (**فصل في السرايا الَّتِي كَانَتْ فِي سَنَةِ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ ٦\٢٤٣-٢٤٥ دار هجر**).

সীরাতের এ অংশটি থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি? আল্লাহর দুশমন মুরতাদ কাফেরদেরকে কি কখনো একটি নিরাপরাধ কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা বৈধ?

৪৯. امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر

এক রকমের উদাহরণ বার বার উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহর বান্দারা এ কথা মানতে কোনভাবেই প্রস্তুত নয় যে, আল্লাহর দুশমনদেরকে হত্যা করার হুকম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই দিয়েছেন। আর আল্লাহর নিষ্পাপ মাখলূককে কষ্ট না দেয়ার জন্যও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই আদেশ দিয়েছেন। আমরাতো আদেশ-নিষেধের গোলাম। কেন আমরা নিজের মত করে যুক্তি তৈরি করে তা দিয়ে পুরা শরীয়তকে পাল্টে দিতে চাই? এসব বিষয় না বোঝার ভান করে আসলে কতকাল কাটানো যাবে? আর দুনিয়ার জীবন না হয় কেটেই গেল, কিন্তু আখেরাতের কী হাশর হবে!

৫০. 'একটা গাছের পাতাও অনর্থক কর্তন করা, ছেঁড়া...'

আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আল্রাহর ওয়াস্তে একটু ভাবুন! গাছের পাতা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপকার করে। এরই বিপরীত আল্লাহর দুশমন আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়। দয়া করে একটি নিষ্প্রাণ ও নিষ্পাপ বস্তুর সঙ্গে কোন স্বীকৃত কাফেরকে তুলনা করবেন না। বিষয়টি ঈমান-কুফরের, কোন দলিল বিহীন আবেগের কথা নয়। গাছের পাতা সম্পর্কে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কী পাই? আর অবাধ্য কাফের সম্পর্কে কী পাই? দু'টি বিষয়কে আল্লাহ তাআলা একই সঙ্গে উল্লেখ করেছে। এরপর কারো আর কোন ওজর থাকতে পারে না। একটু দেখুন-

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (سورة الحشر ٢٤).

"তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশারী, প্রজ্ঞাময়"। -সূরা হাশর ২৪

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. (سورة الحج ١٨).

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজী, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন"। -সূরা হজ্জ ১৮

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. (سورة الرحمن ٦).

"আর তারকা ও গাছ–পালা সিজদা করে"। সূরা রাহমান ৬

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. (سورة الإسراء ٤٤).

"সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ"। -সূরা ইসরা ৪৪

৫১. إن أحب الإعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله

প্রশ্ন হচ্ছে, এরপরও কেন আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে এত ভালবাসা এবং আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে এত শত্রুতা? এসব কি আল্লাহর জন্যই?! সারা বিশ্বে যারা কুফরী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছে, করার জন্য প্রতি নিয়ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে তাদের সঙ্গে পরমার্শ করে, তাদের সহযোগিতা এবং তাদের সমর্থন ও পজেটিভ মনোভাবকে পুঁজি করে সেসকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া হচ্ছে যারা জীবনের সকল আরাম আয়েশ ছেড়ে দিয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামে বিধান বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের নামে, মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করে চলেছে। আল্লাহর জন্য ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ চলছে জিহাদী কাফেলাগুলোর সঙ্গে শত্রুতা করে! আর আল্লাহর জন্য শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ চলছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত

কুফরী শক্তির সঙ্গে ভালবাসা, সৌহার্দ্য, মায়া প্রদর্শন করে এবং তার প্রতি আহ্বান করে করে!

একলক্ষ সাহেবরা তো বিভিন্ন প্রসঙ্গে খুব অকপটে স্বীকার করে গেছে, ইহুদী-খ্রিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ কোন অমুসলিমের সাথেই বিদ্বেষ রাখা যাবে না; তাদের সঙ্গে মায়া, ভালবাসা রাখতে হবে। যাদের কাছে সত্য দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে গেছে, যারা বুঝে-শুনে ইসলামের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত, যারা ইসলামের বিরোধিতার জন্য সকল আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে, যারা ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, যারা প্রতি নিয়ত ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চলেছে, যারা মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে সন্ত্রাস বলে ফেলেছে, তাঁর ব্যঙ্গ চিত্র তৈরি করেছে, যারা ইসলামের একেকটি বিধানকে পশ্চাদপদতার কারণ ও প্রতীক হিসাবে প্রচার করে চলেছে, যারা ধোঁকা ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে মুরতাদ বানিয়ে চলেছে, যারা ইসলামের পক্ষে যে কোন পর্যায়ে অস্ত্রধারণকে সন্ত্রাস বলে সংজ্ঞায়িত করে ফেলেছে, যারা এ মুহূর্তে অসংখ্য ময়দানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, যাদের হামলায় আক্রান্ত অসংখ্য মুসলিম জনপদ -তাদের সঙ্গে মায়া-ভালবাসাই কি এখন মুসলমানদের জন্য الحب في الله -এর বাস্তবায়নের সবচাইতে উপযুক্ত ক্ষেত্র? তাদের নির্দেশনা মত চলাই কি আজ মুসলমানদের জন্য الحب في الله -এর বাস্তবায়নের সবচাইতে উপযুক্ত ক্ষেত্র? তাদের সন্তুষ্টি অর্জনই কি আজ মুসলমানদের জন্য الحب في الله -এর বাস্তবায়নের সবচাইতে উপযুক্ত ক্ষেত্র? বিশ্বের বুকে নিজেদেরকে হিরো বানানোর জন্য তাদের স্বীকৃতি আদায় করাই কি আজ মুসলমানদের জন্য الحب في الله -এর বাস্তবায়নের সবচাইতে উপযুক্ত ক্ষেত্র?

আর যারা এ বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে, সম্মিলিত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে, ইসলামী খিলাফতের জন্য জীবনের সব আরাম আয়েশ বিসর্জন দিয়েছে, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য নিজের জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে শত্রু শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পাহাড়ের গুহায় গুহায় বছরের পর বছর জীবন কাটিয়ে চলেছে, হাদিয়া তোহফার মসনদ ছেড়ে বুলেট-বোমার গন্ধ শুঁকে পেঠ ভর্তি করছে, সমাদৃতি ও আপ্যায়নের জলসাকে আলবিদা বলে পাথর-বালুর সঙ্গে গলাগলি করছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

দুশমনদের বধ করতে পারলে হেঁসে উঠছে, হাজার হাজার মাইল দূরের একজন মুসলিম ভাইয়ের রক্ত দেখে কেঁদে উঠছে, যারা বছরের পর বছর মুসলমান ভাইয়ের শত্রুকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আল্লাহর রাসূলকে যারা গালি দিয়েছে তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কাফেরদের জন্য যারা কঠোর, যারা এত প্রিয় জীবনটাকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে -তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ, তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আনন্দ লাভ করা, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য শত্রুর রাস্তাকে সুগম করে দেয় এটাই কি আজ মুসলমানের والبغض في الله এর সর্বোচ্চ প্রকাশের ক্ষেত্র?

এ প্রসঙ্গে কেবলই মনে পড়ে এক কৌতুকশিল্পির একটি কৌতুকের কথা। অসলে কৌতুক বলার মত মানসিক অবস্থা নেই। কিন্তু কৌতুকটি যেহেতু শুধুই কৌতুক নয় তাই আশা করি বলাটা খুব বেমানান হবে ন।

কৌতুকশিল্পি এক ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং বললেন-

"**কৌতুকশিল্পি:** ডাক্তার সাহেব, আমি একজন পাগল, অমাকে উপযুক্ত ওষুধ দিন।

ডাক্তার: আপনি পাগল?! আপনিতো খুব সুন্দর করে কথা বলছেন। আপনি পাগল হওয়ার কথা নয়।

কৌতুকশিল্পি: না, স্যার! আমি একজন পাগল। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। দয়া করে একটু চিকিৎসা দিয়ে আমাকে সুস্থ বানান।

ডাক্তার: না, অপনি পাগল হতে পারেন না। কোন পাগল এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। আপনি সুস্থ আছেন। আপনি যান, শুধু শুধু বিরক্ত করবেন না।

কৌতুকশিল্পি: স্যার, আপনি একটু পরীক্ষ করে দেখুন। দয়া করে দেখুন। আমি আসলেই একজন পাগল। স্যার, আমার পরিবার এবং এলাকার সবাই জানে আমি একজন পাগল। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবন না। আমি একজন সুস্থ মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই।

ডাক্তার: (ভালো করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর) না, আপনি পাগল নন। পাগলামির কোন কিছুই আপনার মাঝে নেই। আপনি শতভাগ সুস্থ মানুষ।

কৌতুকশিল্পি: (অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে) স্যার, আপনি সঠিক বলছেন? আমি আসলেই পাগল নই?!

ডাক্তার: হ্যাঁ, সঠিক বলছি। আপনি কোনভাবেই পাগল নন।

কৌতুকশিল্পিঃ (কিছুটা আস্বস্ত হয়ে) স্যার, যদি আমি পাগল না হয়ে থাকি এবং আপনার এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়ে থাকে তাহলে একটি ফলকে এ কথাটি লিখে দিন। আর নিচে আপনার নাম লিখে দিন। এ ফলক আমি গলায় ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে হাটব, আর মানুষকে বলব, দেখ আমি একজন সুস্থ মানুষ, পাগল নই। তোমরা যে আমাকে পাগল বলছ, এটা সঠিক নয়।

ডাক্তারঃ (একটু অবাক হয়ে) আসলে ব্যাপারটা কি? একটু খুলে বলুন তো। আপনার কথাগুলো বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

কৌতুকশিল্পিঃ স্যার, আপনি শুনতে চাইলে আমি শুনাতে পারি। তবে কথাটা আমাকে লিখে দিতে হবে। না হয় স্যার আমার উপায় নেই।

ডাক্তারঃ অচ্ছা সে দেখা যাবে, আগে বলুন।

কৌতুকশিল্পিঃ স্যার, আমার বাবা মাদক প্রতিরোধ কর্মকর্তা এবং আমার মা মানবাধিকার কর্মী। কিন্তু আমার বাবা প্রায় প্রতি রাতে যখন বাসায় আসেন তখন মাতাল অবস্থায় ঘরে ঢোকেন। মা ঘরে ঢোকার পর মা বাবার এক দফা মারপিট হয়ে যায়। প্রতি দিনই এ ঘটনা ঘটে। আমি এক দু'দিন আপত্তি করার পর আমাকে পাগল বলে ডাকতে লাগলেন। এ কথা যখন আমি বাইরের দু'য়েক জনের সঙ্গে আলোচনা করেছি তখন তারা বাইরের লোকজনকেও জানিয়ে দিলেন, আমি পাগল। সে থেকে মানুষ আমাকে পাগল বলেই জানে। আমিও আমাকে পাগল ভাবতে শুরু করেছি।

সর্বশেষ এক দিন আমার ছোট বোনের বিয়ের প্রস্তাব আসল। আমি, মা-বাবা ও বোন এক সঙ্গে বসে আছি। বরপক্ষ মেয়ে দেখতে এসেছে। মা বরপক্ষের সামনে তাঁর মেয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন, আমার মেয়ে কখনো ঘরের বাইরে যায় না। সব সময় মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটে। জীবনে কখনো কোন ছেলের সঙ্গে কথাও বলেনি ইত্যাদি ইত্যাদি। স্যার, আমি এ কথাগুলো শুনে ধৈর্য ধরতে পারলম না।

আমি বললাম, মা! আল্লাহর ওয়াস্তে এ মানুষগুলোকে ধোঁকা দিও না। তুমি জান তোমার মেয়ের কমপক্ষে সাত আটটা ছেলে বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার কারণে সে কখনো রাত বারটা একটার আগে ঘরে আসে না। তুমি কি এটা জান না?!

স্যার! এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবা আমাকে ধোলাই দেয়া শুরু করলেন আর বলতে থাকলেন, এ পাগলটার কারণে সমাজে আর বাঁচার উপায় নেই। কার কথা কার সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। দুনিয়ার যত আজগুবি কথা তার কাছে

পাওয়া যায়। ওকে আর সহ্য করা যায় না। পাগলা খানায় পাঠাতেই হবে। চিকিৎসা করব করব করেও করা হচ্ছে না। মোটকথা এত বকা এবং এত মার দেয়া হল যার দ্বারা বরপক্ষ আশ্বস্ত হতে পেরেছে যে, আমি সত্যিই পাগল। এরপর একটি শিকল দিয়ে আমাকে সিঁড়ির নিচে বেঁধে রাখা হল। বিয়ে হল। বহু দিন কেটে গেল। সবাই জানে আমি পাগল। আমিও জানি আমি পাগল। স্যার, আমি যদি বলি, আমি সুস্থ তাহলে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। অপনি দয়া করে লিখে দিন, আমি সুস্থ। আমি আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলব, আমি পাগল নই। আমি সুস্থ"।

পাঠকদেরকে একটু কষ্ট দিলাম। কারণ আমরা আল্লাহর জন্য কাকে ভালোবাসছি এবং আল্লাহর জন্য কার সঙ্গে বিদ্বেষ রাখছি? কে আল্লাহর বন্ধু আর কে আল্লাহর শত্রু এর পরিচয়কে যখন এত বিপরীতমুখী প্রবাহে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তখন ডাক্তারের সনদপত্র ছাড়া আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব কে আল্লাহর শত্রু আর কে আল্লাহর বন্ধু? ইসলাম ধর্মের যারা ডাক্তার রয়েছেন তাঁরা যদি একটু লিখে দিতেন আমি পাগল নই, তাহলে মানব সামাজে আরো কিছু দিন সুস্থ মানুষ হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকতে পারতাম। আর যদি আমাকে পাগলই মনে হয় তাহলে যদি একটু বলে দিতেন, কোন অষুধে সুস্থ হতে পারি এবং সে অষুধটা কোথায় পাওয়া যায়?

৫২. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

বলাবাহুল্য, এ রহমতের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সারা বিশ্বের মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য রাহমাতুল লিলআলামীন মানবদেহের বিষাক্ত অংশ আল্লাহর শত্রুদেরকে কেটে পরিস্কার করে ফেলেছেন। সরাসরি সাতাশটি যুদ্ধে শরিক হয়ে এবং অসংখ্য যুদ্ধকাফেলা পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার দুশমনকে হত্যা করে দায়িত্ব আদায়ের চূড়ান্ত পর্বে আরোহন করেছেন। জীবন সায়াহ্নে উসামা ইবনে যায়েদ রা. এর নেতৃত্বে একটি জিহাদী কাফেলা তৈরি করে দিয়ে শেষ বিদায় নিয়েছেন।

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের দাবিতেই একটা মেয়াদ পর্যন্ত অমুসলিমদের দরজায় দরজায় গিয়ে তাদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতে থেকেছেন। এরপর আরেকটি মেয়াদে এসে সে একই রহমতের দাবিতে জিহাদের মাধ্যমে মানবদেহের সে দুষ্ট অংশটিকে কেটে ফেলে দিয়েছিলেন যা পুরা মানবদেহকে বিষিয়ে তুলছিল। এ কারণেই

রহমতে আলম ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের পরিচয় আল্লাহ তাআলা এভাবে দিয়েছেন-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (سورة الفتح ٢٩).

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন"। -সূরা ফাতহ ২৯

যার দ্বারা প্রমাণিত হয় রহমতে আলম হওয়ার দাবিই হচ্ছে প্রয়োজনে তিনি ফুল হবেন, আবার প্রয়োজনে তিনি তরবারি হবেন। একই সত্তার মাঝে তরবারি ও ফুলের উপস্থিতির মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। রহমতে আলম নিজেই তা প্রমাণ করে গেছেন। এরপরও জিহাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলার মাঠ তৈরি করার জন্য যারা وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين আয়াতটিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চায় তারা নিশ্চয় আয়াতটিকে অপাত্রে ব্যবহার করার পথেই এগুচ্ছে, যার পরিণতি খুবই ভয়ংকর।

৫৩. ...كنتم خير أمة أخرجت للناس

এখানে যাদেরকে খায়রে উম্মত বা উত্তম জাতি বলা হয়েছে তাদের প্রথম সারি নিশ্চয় সাহাবায়ে কেরামের জামাত। এ খায়রে উম্মতের উপর আদেশ ছিল ভাল কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, খায়রে উম্মতের প্রথম সারি ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে কী কী করেছিলেন? তাদের সে কাজের তালিকা আমরা নিজের মত করে তৈরি করব? নাকি সীরাত ও ইতিহাস থেকে নিয়ে সে তালিকা তৈরি করব? এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিস কি বলে দেখুন-

عن أبي هريرة رضي الله عنه {كنتم خير أمة أخرجت للناس} قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. (**صحيح البخاري**، باب كنتم خير أمة أخرجت للناس)

তাফসীরে রূহুল মাআনীতে তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে রাযীর বক্তব্যসহ দেখুন-

(كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال "خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام"، قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، (**فتح الباري**).

روى الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس" قال: (أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله). وقال: هذا حديث حسن. وقال أبو هريرة: نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. (**تفسير القرطبي**).

وهاهنا سؤالات:

السؤال الأول: من أي وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأمم؟.

والجواب: قال القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليد، وأقواها ما يكون بالقتال، لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وأعرف المعروفات الدين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة، وأنكر المنكرات: الكفر بالله، فكان الجهاد في الدين محملا لأعظم المضار لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع، وتخليصه من أعظم المضار، فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات، ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع، لا جرم صار ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه و«لا إله إلا الله» أعظم المعروف، والتكذيب هو أنكر المنكر.

ثم قال القفال: فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف، وذلك لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الألف والعادة، ولا يتأملون في الدلائل التي تورد عليهم فإذا أكره على الدخول في الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه، ثم لا يزال يضعف ما في قلبه من حب الدين الباطل، ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين الحق إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق، ومن استحقاق العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم. (**التفسير الكبير**).

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس في الآية أن المعنى تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقرّوا بما أنزل الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر. (**روح المعاني**).

বয়ানুল কুরআন দেখুন-

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو زیادہ اہتمام کی قید نکال دی ہے (یعنی لگادی ہے) مراد اس سے امر و نہی بالید یعنی ہاتھ اور قوت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو اعلی درجہ اس کا ہے، یہ درجہ اس امت میں اور امم سے دو وجہ سے زیادہ ہے -اولا: جہاد کا مشروع ہونا، جس سے دفع کفر ودفع فساد مقصود ہے، ثانیا: بوجہ عموم دعوت محمدیہ ....

بخلاف شرائع سابقہ کے بعض میں جہاد نہ تھا اور بعض میں بوجہ خصوصی بعثت انبیاء سابقین کے سب اقوام کے لئے عام نہ تھا. (بيان القرآن تحت تفسير هذه الآية).

মাআরিফুল কুরআন দেখুন-

اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہونچانے ہی کے لئے وجود میں آئی ہے اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعہ ہوئی، اگر چہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر بھی عائد تھا جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے مگر اول تو بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا اس لئے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا امت محمدی میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ بھی اس کا جزء ہے اس کے علاوہ امم سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعائر سے غفلت عام ہوکر محو ہوگئی تھی اسی طرح امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہوگیا تھا اور اس امت محمدیہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے کہ اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی .(معارف القرآن تحت تفسير هذه الآية).

আমরা কেন জানি যা দেখি এবং পড়ি তা বিশ্বাস করি না, বা তা বিশ্বাস করতে মনে চায় না। এরই বিপরীত নিজেদের উদ্ভাবিত, ধারণানির্ভর ও আবেগপ্রসূত কথাগুলো বিশ্বাস করতেই বেশি পছন্দ করি। এমনিভাবে বলার ক্ষেত্রেও কিতাবের বাইরের কথাগুলো বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। কুরআনের হুকুম হচ্ছে আদেশ ও নিষেধের। আমরা অনুরোধ করে চলেছি। আদেশ-নিষেধ করার পর বিপরীত চললে তার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাণ্ডার ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, নিজেও ডাণ্ডার ব্যবহার করে গেছেন। আমরা বলছি, জানিয়ে দেয়ার পর আমার দায়িত্ব শেষ। মানা না মানা তার ব্যাপার। এটা নিয়ে মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই।

খায়রে উম্মতের প্রথম সারি সাহাবায়ে কেরাম আদেশ-নিষেধের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, ইসলামের দাওয়াত তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। দাওয়াত গ্রহণ না করার পর তাদেরকে কর দেয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন। শেষ ফায়সালা তরবারির মাধ্যমে হয়েছে। আর আমরা বলছি, আমরা তাদেরকে শুধু বোঝাতেই থাকব। বছরের পর বছরের পর বছরের পর বছর বোঝাতেই থাকব। আবার এ সাহাবায়ে কেরামেরই কাহিনী শোনাতে থাকব।

এ খায়রে উম্মত সারা বিশ্বের জন্য কল্যাণকামী -এ কথা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাতলানো পদ্ধতি ছেড়ে প্রত্যেকে নিজের মত করে পদ্ধতি আবিষ্কার করে চলেছে। যে কল্যাণকামীতার জন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম হাতে অস্ত্র নিলেন, আজ সে অস্ত্র হাতে নেয়াকে সন্ত্রাস আখ্যা দেয়া হচ্ছে, আবার খায়রে উম্মত হওয়ার রিহার্সালও চলছে। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ আর এখন رحماء عَلَى الْكُفَّار হয়ে খায়রে উম্মত হওয়ার অনুশীলন চলছে। আল্লাহর আদেশ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (٢٣) পালন করতে গিয়ে খায়রে উম্মতের প্রথম সারি أئمة الكفار এবং رؤساء الكفار এর মাথা থেতলে দিতে সদা অস্ত্র হাতে প্রস্তুত ছিলেন, আর আজ কাফের সর্দারদের আশির্বাদ, সমর্থন, পজেটিভ মনোভাব, সহাযোগিতা ও সহমর্মিতা নিয়ে খায়রে উম্মত হওয়ার তামরীন চলছে। সে অনুশীলনের দাওয়াত চলছে। যারা কুরআনের আদেশ পালন করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের পথ ধরে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে তাদের বিরুদ্ধে দাজ্জালী ফাতওয়া জারি করেও খায়রে উম্মত পদ লাভ করার চেষ্টা চলছে।

আর আমরা যারা সাধু পুরুষ। আমাদের সবচাইতে বড় দায়িত্ব হচ্ছে, এ কথা প্রমাণ করা যে, আমি একজন মু'তাদিল মানুষ, কারো সমালোচনা করি না, সবার কাছে সমাদৃত, এত কঠিন যামানায়ও আমি একজন অত্যন্ত ভাল মানুষ।

৫৪. إني لم ابعث لعانا...

যে রাসূল লানত করার জন্য প্রেরিত হননি সে রাসূলই কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে লানত করেছেন। কুনূতে নাযেলা কিন্তু সে জন্যই এসেছে। আর লানত না করার দ্বারা আল্লাহর দুশমনদেরকে হত্যা না করা কীভাবে প্রমাণিত হয়?

আহকামুল কুরআন, জাসসাস দেখুন-

باب لعن الكفار

قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من مات كافرا وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه لأن قوله والناس أجمعين قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لو جن لم يكن زوال التكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراءة منه وكذلك سبيل ما يوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاح أن موت من كان كذلك أو جنونه لا يغير حكمه عما كان عليه قبل حدوث هذه الحادثة فإن قيل روي عن أبي العالية أن مراد الآية أن الناس يلعنونه يوم القيامة كقوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا قيل له هذا تخصيص بلا دلالة ولا خلاف أنه يستحق اللعن من الله تعالى والملائكة في الدنيا بالآية فكذلك من الناس وإنما يشتبه ذلك على من يظن أن ذلك إخبار من الله تعالى أن الناس يلعنونه وليس كذلك بل هو إخبار باستحقاقه اللعن من الناس لعنوه أو لم يلعنوه. (**أحكام القرآن**).

তাফসীরে ইবনে কাসীর দেখুন-

فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعمن بعده من الأئمة، يلعنون الكفرة في القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم له، واستدل بعضهم بهذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله عليه السلام، في صحيح

البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" قالوا: فعلَّة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. **(ابن كثير)**.

তাফসীরে জালালাইন দেখুন-

[إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّار] حَال [أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَة اللهَّ وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ] أَيْ هُمْ مُسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. (الجلالين).

তাফসীরে কুরতুবী দেখুন-

فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: "وهم كفار" الواو واو الحال. قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه، لان حاله عند الموافاة لا تعلم، وقد شرط الله تعالى في هذه الاية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بملهم.

قال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني). فلعنه، وإن كان الايمان والدين والاسلام مآله. وانتصف بقوله: (عدد ما هجاني) ولم يزد ليعلم العدل والانصاف.

وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الاعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.

قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله، لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصى كشراب الخمر وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد في الاحاديث لعنه. **(القرطبي)**.

কাফেরদেরকে লানত করার বর্ণনা হাদীসের সকল কিতাব এবং সীরাত ও তারীখের সকল কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী থেকে একটি বর্ণনা এখানে তুলে ধরছি-

٤٠٩١- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «بعث خاله، أخ لأم سليم، في سبعين راكبا» وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين ثلاث خصال، فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف؟ فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال: غدة كغدة البكر، في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه، فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج، ورجل من بني فلان، قال: كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم، وأومئوا إلى رجل، فأتاه من خلفه فطعنه، -قال همام أحسبه- حتى أنفذه بالرمح، قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فلحق الرجل، فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا «فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثين صباحا، على رعل، وذكوان، وبني لحيان، وعصية، الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم». (**صحيح البخاري**).

এ বর্ণনা এ কথা প্রমাণ করে যে, খোদ কাফেররা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে যার দরুন যে রাসূলকে লানতকারী হিসাবে পাঠানো হয়নি সে রসূলও দিনের পর দিন সম্মিলিতভাবে কাফেরদেরকে লানত করতে পারেন। তাহলে উম্মতের বেলায়ও কি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে না?

৫৫. 'তায়েফের বর্বর নির্যাতনের ... হেদায়েতই কামনা করেছেন'

রাসূল উম্মতের জন্য আজীবনই হেদায়েত কামনা করেছেন, উম্মতের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেছেন। এটাই স্বাভাবিক। আর মুজাহিদরাই তো সারা বিশ্বের মানুষের হেদায়েত কামনা করবে। শয়তানী শক্তির প্রতারণার কারণে যেন সাধারণ মানুষ হেদায়েত থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য তাদেরকে শায়েস্তা করবে। যার দরুন তায়েফের সঙ্গে দ্বিতীয় আচরণ এটা ছিল না।

জিহাদের ফরয হুকুম এসে যাওয়ার পর এ তায়েফের লোকদের বিরুদ্ধে আল্লহর রাসূল জিহাদ করেছেন। এ কথা কেন আমরা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এমনিভাবে অন্যদেরকে ভুলিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছি। হাদীস ও সীরাতের বিবরণ তো এই।

সহীহ বুখারীর বর্ণনা দেখুন-

باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة

٤٣٢٥- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي العباس الشاعر الأعمى، عن عبد الله بن عمر، قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، فلم ينل منهم شيئا، قال: «إنا قافلون إن شاء الله». فثقل عليهم، وقالوا: نذهب ولا نفتحه، وقال مرة: «نقفل». فقال: «اغدوا على القتال». فغدوا فأصابهم جراح، فقال: «إنا قافلون غدا إن شاء الله». فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة، فتبسم، قال: قال الحميدي، حدثنا سفيان الخبر كله. (**صحيح البخاري**).

জিহাদের হুকুম আসার আগের পরিস্থিতি দিয়ে যদি কেউ জিহাদের হুকুম আসার পরের হুকুমকে বিচার করে তা হলে সে যিন্দিক। মক্কার জীবনে যে বিষয়গুলো হালাল ছিল এবং মদীনার জীবনে এসে হারাম হয়ে গেছে সেগুলোকে তুলে এনে যদি কেউ হালাল ফাতওয়া দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সে আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মানতে রাজি নয়। মুখে এ কথা স্বীকার না করার কারণে তাকে মুরতাদ বলা না গেলেও যিন্দিক বলতে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না। বাকি মুফতী সাহেবরা ফায়সালা করবেন। মক্কী আয়াতে মদের সামান্য উপকার আছে বলা হয়েছে -এ উসিলা দিয়ে যদি কেউ আজ মদের উপকারিতা বর্ণনা করে এবং এর হালাল হওয়ার ফাতওয়া দেয় তাহলে তাকে যিন্দিক বলতে কী কী সমস্যা তা পরিস্কার হওয়া দরকার।

৫৬. ...ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

কুরআনের ভাষায় 'মুফসিদ' কে? আর 'মুসলিহ' কে? বিষয়টির ব্যাপারে একদম ফায়সালা হয়ে যাওয়া দরকার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রিসালাতপ্রাপ্ত হলেন তখন পৃথিবীর অবস্থা হচ্ছে পৃথিবী আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকার, শিরক, সুদ, মদ,

যিনা, জাতীয়তা-সাম্প্রদায়িকতা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যুদ্ধ ইত্যাদিতে ভরপুর। নিজের সম্প্রদায়ের-কওমের একজনের হত্যার বদলা নেয়ার জন্য অপর সম্প্রদায়ের একশত জনকে খুন করার পণ। **এ হচ্ছে এক অবস্থা**।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অস্তিত্বের কথা বললেন, এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিলেন, মদ, যিনা ও সাম্প্রদায়িকতা তথা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কথা বললেন তখন যুদ্ধ শুরু হল ঘরে ঘরে, বাবার বিরুদ্ধে ছেলে অস্ত্র ধারণ করল, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই অস্ত্র ধারণ করল, ভগ্নিপতির বিরুদ্ধে শ্যালক অস্ত্র ধারণ করল, ভাই বোনকে রক্তাক্ত করল, ভাতিজার বিরুদ্ধে চাচা অস্ত্র ধারণ করল, মামার বিরুদ্ধে ভাগিনা অস্ত্র ধারণ করল, স্বামী থেকে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, মা-বাবা থেকে ছেলে-মেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আপনজন আপনজনের ভয়ে বাস্তুভিটা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালাতে লাগল, একমাত্র তাওহীদের বিশ্বাসের শর্তে সকল বন্ধু শত্রুতে রূপান্তরিত হল, আর শত্রু বন্ধুতে রূপান্তরিত হল, আপনজনের হাতে আপনজন বন্দি হল, স্বজাতির সাধারণ শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীর গলায় দড়ি লাগিয়ে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করল, উচ্চ শ্রেণী সাধারণ শ্রেণীর বুকে পাথর চাপা দিল, ঈমান আনার দায়ে স্বজাতির নারীর লজ্জাস্থানে বর্ষার আঘাত করা হল, মামার বাড়ির লোকজনের হাতে পাগল হিসাবে চিহ্নিত হল, সর্বোপরি রক্তের বাঁধনে আবদ্ধ একটি অঙ্গ আরেকটি অঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিল, যুদ্ধে লিপ্ত হল, শত শত খুন হল, হাজার হাজার আহত হল, শত শত বন্দি হল, শত শত নারী দাসী হল, শত শত শিশু দাস হল, এসবের ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। **এ হচ্ছে আরেক অবস্থা**।

এ দু'টি অবস্থার কোনটি 'ফাসাদ' আর কেনটি 'সালাহ'? এ দুই অবস্থার দুই স্থপতি। দুই স্থপতির কোন জন 'মুফসিদ' আর কোন জন 'মুসলিহ'? দুই অবস্থার কোন অবস্থা 'বিশৃংখলা' আর কোন অবস্থা 'শৃংখলা'? দু'টির কোনটি 'সন্ত্রাস' আর কোনটি 'সন্ত্রাসদমন'? দু'টির কোনটির প্রতিষ্ঠাতা 'সন্ত্রাসী' আর কোনটির প্রতিষ্ঠাতা 'সন্ত্রাসবিনাশী'?

এর সঙ্গে দেখা যেতে পারে বর্তমান পৃথিবীর দু'টি অবস্থা। পৃথিবীব্যাপী কুফর প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা সচল। ঘরে ঘরে শিরক পৌঁছে দেয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন। মুসলিম অধ্যুষিত প্রতিটি জনপদের মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন করা হয়ে গেছে। সে মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তার সামনে অর্ঘ্য দান, তার

সম্মান রক্ষা করা নাগরিকত্বের বৈধতার শর্ত হিসাবে স্থান পেয়ে গেছে। মূর্তির সমালোচনা, মূর্তির অসম্মান মুসলমানদের জন্যও রাষ্ট্রদ্রোহিতা পর্যায়ের অপরাধ হিসাবে আইন পাস করা হয়ে গেছে। মুসলিম জনপদে যিনা ব্যভিচার বৈধ পেশা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। সুদভিত্তিক জীবন যাপন বৈধতা পেয়ে গেছে। সুদ প্রতিষ্ঠার ভবন দেশের সব চাইতে বড় ভবন হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। কুফরী আইন প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য ঘোষণা এসে গেছে। কুফরী আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারার উপর গর্ব এবং ত্রুটির উপর আফসোস এবং ত্রুটি শুধরে নেয়ার নতুনভাবে অঙ্গিকার সততা ও মানবতার প্রতিক হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। শতভাগ কুফরী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি ইহুদী-খ্রিস্টানদের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, হত্যা রক্ত ঝরানো চলছে। ট্যাংক, কামান, ড্রোন, বিমান, মাইন, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র ও রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার চলছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা চলছে। **এ হচ্ছে এক অবস্থা।**

একটি কাফেলা, মানুষদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আনার জন্য, তাওহীদের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, কুফর-শিরকের ফিতনাকে মূলোৎপাটন করার জন্য, কুফরের আধিপত্যকে ধ্বংস করার জন্য, ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য, ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য, হুকমে ইলাহী বাস্তবায়নের জন্য, ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে পুনরুদ্ধারের জন্য, মজলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়, জান্নাতের লোভে, জাহান্নামের ভয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, নিরাপদের ঘুম কুরবান করে, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানিকে আলিঙ্গন করে করে মরু বিয়াবানে, পাহাড়ের গুহায় গুহায়, অচীন দেশে, অচীন অলিতে গলিতে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। **এ হচ্ছে আরেক অবস্থা।**

এ দু'টি অবস্থার কোনটি 'ফাসাদ' আর কেনটি 'সালাহ'? এ দুই অবস্থার দুই স্থপতি। দুই স্থপতির কোন জন 'মুফসিদ' আর কোন জন 'মুসলিহ'? দুই অবস্থার কোন অবস্থা 'বিশৃংখলা' আর কোন অবস্থা 'শৃংখলা'? দু'টির কোনটি 'সন্ত্রাস' আর কোনটি 'সন্ত্রাসদমন'? দু'টির কোনটির প্রতিষ্ঠাতা 'সন্ত্রাসী' আর কোনটির প্রতিষ্ঠাতা 'সন্ত্রাসবিনাশী'?

প্রশ্নগুলো একজন মুসলমানকে। যে এ কথা বিশ্বাস করে যে, ফিতনা ফাসাদ হচ্ছে শিরক ও কুফর, যা হত্যার চাইতে জঘন্য। যে কুরআনের এ আয়তকে বিশ্বাস করে وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ যে আয়াতে 'ফিতনা' শব্দের অর্থের মাঝে কোন অস্পষ্টতা নেই, কোন দ্বিমত নেই। যে কোন তাফসীরের কিতাব দেখুন। তাফসীরে জালালাইন দেখুন-

[وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ] وَجَدْتُمُوهُمْ [وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ] أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ [وَالْفِتْنَةُ] الشِّرْكُ مِنْهُمْ [أَشَدُّ] أَعْظَم [مِنْ الْقَتْل] لَهُمْ فِي الْحَرَم أَوْ الْإِحْرَام الَّذِي اسْتَعْظَمْتُمُوهُ

খোদ এ আয়াতটির তাফসীর দেখুন। যে আয়াত দিয়ে ইসলামের নামে চলমান জিহাদী কর্মকাণ্ডকে ফাসাদ ও সন্ত্রাস হিসাবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

একটু দেখুন, তাফসীরবিদগণ বলছেন, শিরক ও গুনাহের দ্বারা ফাসাদ সৃষ্টি করো না। এখানে ফাসাদ সৃষ্টি করো না বলে উদ্দেশ্যই হচ্ছে, শিরক ও গুনাহের কাজ করো না। যে কোন তাফসীর দেখতে পারেন। এখানে তাফসীরে জালালাইন থেকে একটিমাত্র উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি-

[وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض] بِالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي [بَعْد إِصْلَاحهَا] بِبَعْثِ الرُّسُل [وَادْعُوهُ خَوْفًا] مِنْ عِقَابه [وَطَمَعًا] فِي رَحْمَته [إِنَّ رَحْمَة اللَّه قَرِيب مِنْ الْمُحْسِنِينَ] الْمُطِيعِينَ وَتَذْكِير قَرِيب الْمُخْبَر بِهِ عن رحمته لِإِضَافَتِهَا إِلَى اللَّه

কিন্তু আমরা কাকে ফিতনা ও ফাসাদ বলতে ও ভাবতে পছন্দ করি।

কুরআনে কারীমে কাকে ফিতনা ও ফাসাদ বলা হয়েছে, আর অমরা কাকে ফিতনা ও ফাসাদ বলে প্রচার করে চলেছি। কুরআনে কারীমে 'মুফসিদূন' ও 'মুফসিদীন' শব্দ যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে কাফের মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? নাকি মুসলমানদেরকে বা মুসলমানদের জিহাদী কর্মকাণ্ডকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? শব্দদু'টি কুফর শিরকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে? নাকি কুফর শিরকের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত

হয়েছে? চলুন আমরা একটু কুরআনের সঙ্গে চলি এবং তাফসীরবিদগণের মতামতও পর্যবেক্ষণ করি।

তাফসরিে আবুস সাউদ দেখুন-

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. (سورة ص ٢٨).

[أم نجعل الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كالمفسدين فِى الارض] أمْ منقطعةٌ وما فيَها من بلْ للإضرابِ الانتقاليِّ عن تقريرِ أمر البعثِ والحسابِ والجزاء بما مرَّ من نفيِ خلقِ العالم خالياً عن الحكمِ والمصالحِ إلى تقريرِه وتحقيقِه بما في الهمزةِ من إنكار التَّسويةِ بين الفريقينِ ونفيها على أبلغِ وجهٍ وآكدِه أي بل أنجعلُ المؤمنينَ المصلحينَ كالكَفَرةِ المفسدين في أقطارِ الأرضِ. (تفسير أبي السعود).

তাফসীরে জালালাইন দেখুন-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. (سورة المائدة ٦٤).

[وَقَالَتْ الْيَهُود] لَمَّا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد أَنْ كَانُوا أَكْثَر النَّاس مَالًا [يَد اللَّهُ مَغْلُولَة] مَقْبُوضَة عَنْ إِدْرَار الرِّزْق عَلَيْنَا كَنَّوْا بِهِ عَنْ البخل تعالى الله عن ذلك قال تعالى [غُلَّتْ] أَمْسَكَتْ [أَيْدِيهِمْ] عَنْ فِعْل الْخَيْرَات دُعَاء عَلَيْهِمْ [وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ] مُبَالَغَة فِي الْوَصْف بِالْجُودِ وَثَنْي الْيَد لِإِفَادَةِ الْكَثْرَة إِذْ غَايَة مَا يَبْذُلهُ السَّخِيّ مِنْ مَاله أَنْ يُعْطِي بِيَدَيْهِ [يُنْفِق كَيْفَ يَشَاء] مِنْ تَوْسِيع وَتَضْيِيق لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ [وَلَيَزِيدَن كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَبّك] مِنْ الْقُرْآن [طُغْيَانًا وَكُفْرًا] لِكُفْرِهِمْ بِهِ [وَأَلْقَيْنَا بَيْنهمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة] فَكُلّ فِرْقَة مِنْهُمْ تُخَالِف

الْأُخْرَى [كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ] أَيْ لِحَرْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَطْفَأَهَا اللهُ] أَيْ كُلَّمَا أَرَادُوهُ رَدَّهُمْ [وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا] أَيْ مُفْسِدِينَ بِالْمَعَاصِي [وَاللهُ لَا يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ] بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبهُمْ. (تفسير الجلالين).

তাফসীরে জালালাইন দেখুন-

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. (سورة الأعراف ٨٦).

[وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاط] طَرِيق [تُوعِدُونَ] تُخَوِّفُونَ النَّاس بِأَخْذِ ثِيَابهمْ أَوْ الْمُكْس مِنْهُمْ [وَتَصُدُّونَ] تَصْرِفُونَ [عَنْ سَبِيل اللهِ] دِينه [مَنْ آمَنَ بِهِ] بِتَوَعُّدِكُمْ إِيَّاهُ بِالْقَتْلِ [وَتَبْغُونَهَا] تَطْلُبُونَ الطَّرِيق [عِوَجًا] مُعْوَجَّة [وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الْمُفْسِدِينَ] قَبْلكُمْ بِتَكْذِيبِ رُسُلهمْ أَيْ آخِر أَمْرهمْ مِنْ الْهَلَاك. (تفسير الجلالين).

তাফসীরে আবুস সাউদ দেখুন-

[واذكروا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ] بالبركة في النسل والمال [وانظروا كَيْفَ كَانَ عاقبة المفسدين] من الأمم الماضيةِ كقومِ نوحٍ ومَنْ بعدهم من عاد وثمودَ وأضرابِهم واعتبِروا بهم. (تفسير أبي السعود).

তাফসীরে জালালাইন দেখুন-

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. (سورة الأعراف.١٠٣).

[ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدهمْ] أَيْ الرُّسُل الْمَذْكُورِينَ [موسى بآياتنا] التسع [إلى فرعون وملإه] قَوْمه [فَظَلَمُوا] كَفَرُوا [بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الْمُفْسِدِينَ] بِالْكُفْرِ مِنْ إِهْلَاكهمْ. (تفسير الجلالين).

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. (سورة يونس ٨١).

[فَلَمَّا أَلْقَوْا] حِبَالهمْ وَعِصِيّهمْ [قَالَ مُوسَى مَا] اسْتِفْهَامِيَّة مُبْتَدَأ خَبَره [جِئْتُمْ بِهِ السِّحْر] بَدَل وَفِي قِرَاءَة بِهَمْزَةٍ وَاحِدَة إِخْبَار فَمَا اسْم مَوْصُول مُبْتَدَأ [إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ] أَيْ سَيَمْحَقُهُ [إن الله لا يصلح عمل المفسدين]. (تفسير الجلالين).

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. (سورة يونس ٩١).

[وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيل الْبَحْر فَأَتْبَعَهُمْ] لَحِقَهُمْ [فِرْعَوْن وَجُنُوده بَغْيًا وَعَدْوًا] مَفْعُول لَهُ [حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَق قَالَ آمَنْت أَنَّهُ] أَيْ بِأَنَّهُ وَفِي قِرَاءَة بِالْكَسْرِ اسْتِئْنَافًا [لَا إِله إِلَّا الذي آمنت به بنوا إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ] كَرَّرَهُ لِيُقْبَل مِنْهُ فَلَمْ يَقْبَل وَدَسَّ جِبْرِيل فِي فِيهِ مِنْ حَمْأَة الْبَحْر مَخَافَة أَنْ تَنَالهُ الرَّحْمَة وَقَالَ له[آلْآنَ] تُؤْمِن [وَقَدْ عَصَيْت قَبْل وَكُنْت مِنْ الْمُفْسِدِينَ] بِضَلَالِك وَإِضْلَالك عَنْ الْإِيمَان. (تفسير الجلالين).

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. (سورة النمل ١٤).

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. (سورة القصص ٤).

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ.

(سورة العنكبوت ٢٨-٣٠).

[قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي] بِتَحْقِيقِ قَوْلِي فِي إِنْزَالِ الْعَذَابِ [عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ] الْعَاصِينَ بِإِتْيَانِ الرِّجَالِ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ. (تفسير الجلالين).

আল্লাহ তাআলা কুফর, শিরক, যিনা, সমকামিতা, গুনাহকে বলছেন ফাসাদ-ফিতনা। ফেরাউন, নমরুদ, কারূন, আদ, সামুদসহ বিভিন্ন কাফের, নাস্তিক, মুরতাদ ও মুশরিক সম্প্রদায়কে বলছেন মুফসিদূন। এখন একটি পক্ষ এর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বলছে ফিতনা-ফাসাদ। আর যারা এ প্রতিরোধ কর্মকান্ডে জড়িত তাদেরকে বলছে মুফসিদ ও সন্ত্রাসী। দলিল দিচ্ছে সে আয়াত দিয়েই যে আয়াতে এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। এ কাজটি কি শুধুই গুনাহ? না এটা কুফর?

বনী ইসরাঈলের আলেম ও পীর মাশায়েখকে যে আল্লাহ তাআলা কাফের বলেছেন তাদের কাফের হওয়ার সে কারণটি কতটুকু ছিল। তারা যিনার শাস্তি হালকা করে দিয়েছিল, কিছু কিছু হালাল বিষয়কে হারাম বলেছিল, আবার কিছু কিছু হারাম বিষয়কে হালাল বলেছিল। দু'টি অবস্থাকে তুলনা করলে কোন পাল্লা ভারি হবে তা ভেবে দেখা দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব। এড়িয়ে যাওয়া ও সময় ক্ষেপন করার বৈধতা কতটুকু তাও দেখা দরকার। কৌশলগত কারণে কতটা লুকিয়ে রাখার বৈধতা আছে তাও দেখা দরকার। ব্যস্ততার ওজর কতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে তাও দেখা দরকার। না জানা ও না বোঝার ভান করার কতটুকু সুযোগ তাও দেখা দরকার। অন্তসারশূণ্য কোন অজুহাতে কতক্ষণ পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে তাও তাহকীক করা দরকার।

৫৭. 'সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা মুনাফিকদের কাজ'

আল্লাহর দুশমন ও তার দালালদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা তো মুসলমানদের ফরয দায়িত্বে। আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে এবং এর পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٩) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. (سورة الأنفال ٦٠).

আর মুনাফিকরা আজীবন মুসলমানদেরকেই ভয় করেছে। তাদের যে কোন ভাল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আতঙ্কবোধ করেছে। এমনিভাবে মুনাফিকরা আজীবনই অমুসলিমদেরকে ভালবেসেছে। (দেখুন: পাথেয়)। কিন্তু মুমিন কখনো আল্লাহর শত্রুকে ভালোবাসতে পারে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورة المجادلة ٢٢) .

"যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে তুমি পাবে না এমন জাতিকে তাদেরকে পাবে না এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বন্ধু হিসাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে, যদি সেই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি–গোষ্ঠী হয় তবুও। এদের অন্দ্ত্বে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরা হল আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফল কাম''। -সূরা মুজাদালাহ ২২

আর মুনাফিক যারা ফাসাদ করে বেড়ায় তাদের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে তাদের এক পা সর্বদা ঘোষিত ও স্বীকৃত কাফেরদের কম্বলের ভেতর আটকে থাকে।

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (سورة البقرة ٨-٢٠).

''আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে (বলে মনে করে)। অথচ তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না। তাদের অন্ড়রসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী'। জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বুঝে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে, তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে? জেনে রাখ, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না। আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন। এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালাল। এরপর যখন

আগুন তার চারপাশ আলোকিত করল, আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন অন্ধকারে। তারা কিছু দেখছে না। তারা বধির–মূক–অন্ধ। তাই তারা ফিরে আসবে না। কিংবা আকাশের বর্ষণমুখর মেঘের ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘন অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙুল দিয়ে রাখে। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন তা তাদের উপর অন্ধকার করে দেয়, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তাদের শ্রবণ ও চোখসমূহ কেড়ে নিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান''। -সূরা বাকারা ৮-২০

৫৮. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض

আয়াতটি কি মুরতাদ ও কাফেরদেরকে যে হত্যা করবে তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে? যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যে হাজার হাজার কাফের ও মুরতাদকে হত্যা করেছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও আয়াতটি প্রযোজ্য হবে? অথচ তাফসীরবিদগণ বলছেন, এখানে فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুফর-শিরক-গুনাহ।

তাফসীরে জালালাইন দেখুন-

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

[مِنْ أَجْل ذَلِكَ] الَّذِي فَعَلَهُ قَابِيل [كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أَنَّهُ] أَيْ الشَّأْن [مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس] قَتَلَهَا [أَوْ] بِغَيْرِ [فَسَاد] أَتَاهُ [فِي الْأَرْض] مِنْ كُفْر أَوْ زِنًا أَوْ قَطْع طَرِيق أَوْ نَحْوه [فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا] بِأَنْ امْتَنَعَ عَنْ قَتْلهَا [فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا] قَالَ بن عَبَّاس مِنْ حَيْثُ انْتِهَاك حُرْمَتهَا وَصَوْنهَا [وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ] أَيْ بَنِي

إِسْرَائِيل [رُسُلنَا بِالْبَيِّنَاتِ] الْمُعْجِزَات [ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْد ذَلِكَ فِي الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ] مُجَاوِزُونَ الْحَدّ بِالْكُفْرِ وَالْقَتْل وَغَيْر ذلك. (تفسير الجلالين).

যার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে কুফর-শিরকে লিপ্তদেরকে অন্য কোন কারণ ছাড়াই হত্যা করা হবে। আর কুফর-শিরকের কারণে কেউ হত্যা করলে যদি এ হত্যাকারীকে কেউ ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কুফর-শিরক এবং কাফের ও মুসলমান এর বিধি-বিধানের মাঝে পার্থক্য করার মানসিকতা কুফরী শক্তির ডলার ও অস্ত্রের সামনে কুরবান হয়ে গেছে। এরই সঙ্গে এ মাত্রা আরো শত গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার মত বিষাক্ত কুফরী মানসিকতা এবং গণতন্ত্রের মত সূক্ষ্ম কুফরের বীজ। নাহয় এতটা বেহাল অবস্থা হওয়ার কথা নয়।

৫৭. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده

এ হাদীস ঐ মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না যে মুসলমান ইসলামের দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করে? যে মুসলমান কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না? যদি হয় তা হলে তা ইসলামী আদালতের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ ইসলামের ইতিহাসের সকল মুজাহিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। করণ, তাদের কারো হাত থেকেই অপরাধী, মুরতাদ ও কাফেররা নিরাপদে থাকেনি। যদি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়ে থাকে তা হলে বর্তমানে যারা কাফের-মুরতাদরদেরকে হত্যা করার জন্য এবং অপরাধীদের বিচারের জন্য শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কেন?

না কি এ ফাতওয়ার আয়োজকরা বলতে চায়, যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে কাফের-মুশরিকদেরকে হত্যা করবে না, যিনা ও চুরির শাস্তি দেবে না, কোন অপরাধ দমনের জন্য কঠোর কোন ব্যবস্থা নেবে না, শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করবে না, মুরতাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে না, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে যারা গালি দেয় তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে না তারাই প্রকৃত মুসলমান। আর আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে, আজ যে কাফেলাটি শরীয়তের এসব বিধান বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে,

পথ তৈরি করার চেষ্ট করে চলেছে সে কাফেলাটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্যই এসব ফাতওয়ার আয়োজন।

৬০. 'এই ধরনের হিংস্র ও বর্বর পথ অবলম্বন করে'

এই ধরনের মানে কোন ধরনের? যদি বলা হয় এ ধরনের মানে, কাফেরদেরকে হত্যা করা, মুরতাদদেরকে হত্যা করা, তা হলে এ কাজ তো নবী রাসূলগণ বিশেষ করে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই করেছেন, আল্লাহ তাআলা এ ধরনের কাজ করতে আদেশ করেছেন।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। -সূরা তাওবা ৫

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. (سورة البقرة ١٩١).

"আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর এবং তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান"। সূরা বাকারা ১৯১

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

"তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায়

হিজরত না করা পর্যন্ড় তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্যকারীরূপে'' । -সূরা নিসা ৮৯

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.

"তোমরা অচিরেই অন্য লোককে পাবে, যারা তোমাদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং নিরাপত্তা চাইবে তাদের কওমের কাছে। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরানো হয়, তারা সেখানে ফিরে যায়। সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব উপস্থাপন না করে এবং নিজদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি'' । সূরা নিসা ৯১

কিন্তু একে বর্বরতা ও হিংস্রতা বলার উদ্দেশ্য কী? যে এ কাজগুলোকে বর্বরতা হিংস্রতা বলবে সে হয়ত জন্ম থেকে কাফের, আর না হয় এ কথা বলার কারণে সে মুরতাদ।

উল্লেখ্য, একলক্ষ সাহেব এ শিরোনামের অধীনে যে আয়াতগুলোকে উল্লেখ করেছে তা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, দাওয়াত পৌঁছানোর পর মুবাল্লিগের আর কোন কাজ নেই। অতএব আর যা করা হচ্ছে তা হচ্ছে বর্বরতা ও হিংস্রতা। এ পর্যায়ে একজন পাঠকের জন্য এ কথা বুঝে নেয়া খুবই সহজ হবে যে, এ শিরোনামের আয়াতগুলোর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, দাওয়াত পৌঁছানোর পর আর কোন দায়িত্ব নেই। আর শিরোনামের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে দাওয়াতের পর আর যা কিছু করা হচ্ছে তা হল বর্বরতা ও হিংস্রতা। আর তা হচ্ছে কাফের-মুশরিকদেরকে হত্যা করা। অতএব কাফের-মুশরিকদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে যে হুকুম কুরআনে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সে হুকুমের উপর আমল করতে গিয়ে নিজে সরাসরি কাফেরদেরকে হত্যা করার নেতৃত্ব দিয়েছেন এটা হচ্ছে বর্বরতা ও হিংস্রতা। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

এ কথাটি সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ফেলার মত হিম্মত কাফেরদের থাকলেও তাদের দালালদের নেই। কারণ তাদের দুকূলই রক্ষা করতে হয়। তাই তারা এ হামলা করেছে রাসূলের অনুসারীদের উপর। বিভিন্ন রকমের অজুহাত তুলে নিজের জান বাঁচানোর চেষ্টা করে বলতে চেয়েছে, বর্তমান মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদী কর্মকাণ্ডের কোন মিল নেই। কোথায় কোথায় অমিল তা প্রশ্ন করা হলে যা দেখানো হয়েছে এবং যা এ এ ফাতওয়ায় রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক). রাসূল ও সাহাবীগণ কোমলভাবে আদরের সাথে কাফেরদেরকে জবাই করেছেন, আর বর্তমান মুজাহিদগণ কাফেরদেরকে কঠোরভাবে হত্যা করে।
খ). রাসূল ও সাহাবীগণ হাজার হাজার জিহাদী কাফেলার হাতে তরবারী, বর্ষা ও কামান তুলে দিয়ে দাওয়াত ও মুহাব্বতের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর বর্তমান মুজাহিদরা অস্ত্র হাতে নিয়ে কাফের মুশরিকদের ঘাড়ে ও গিরায় গিরায় মেরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

গ). রাসূল ও সাহাবীগণ জিহাদ করেছেন উট, ঘোড়া, তীর ও কামান দিয়ে, আর বর্তমান মুজাহিদরা জিহাদ করছে আগ্নেয়াস্ত্র ও ট্যাংক-কামান দিয়ে।

ঘ). সাহাবায়ে কেরাম কাফের সরদারদেরকে গোপনে হত্যা করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি অনুমতি নিয়ে, আর বর্তমান মুজাহিদরা কাফের সরদারদেরকে হত্যা করছে রাসূলের সরাসরি অনুমতি ছাড়া।

ঙ). বনু কুরাইযার ছয়শত বা নয়শত ইহুদীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে সাহাবায়ে কেরাম জবাই করে করে গর্তে ফেলেছেন তাদের দূর্গ থেকে টেনে এনে এনে, আর বর্তমান মুজাহিদরা কাফেরদেরকে জবাই করছে সাগর পাড়ে নিয়ে।

চ). রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম যেসব কাফের-মুশরিক-নাস্তিকের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন তারা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, আর বর্তমানে মুজাহিদরা যেসব কাফের-মুশরিক-নাস্তিকের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে তারা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের বন্ধু।

ছ). রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম রাতের অন্ধকারে কাফের গোত্রের উপর হামলা করার কারণে মহিলা, শিশু ও অসুস্থরা মারা পড়েছে, আর বর্তমান মুজাহিদরা দিনের বেলায় হামলা করলেও মহিলা, শিশু ও অসুস্থরা মারা পড়ে।

জ). রাসূল ও সাহাবীগণ মিনজানিক দিয়ে শত্রুর দেয়াল ভেঙ্গেছেন, আর বর্তমান মুজাহিদরা গোলা বর্ষণ করে শত্রুর দেয়াল ভাঙ্গছে।

ঝ). রাসূল ও সাহাবীগণ গোত্রের অধিপতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পাঠানোর পর অধিপতি ইসলাম কবুল না করলে পুরা গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, আর বর্তমানে মুজাহিদরা গোত্র ও গোত্রের অধিপতি সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পর হামলা করছে।

ঞ). রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন তারা নিজেদেরকে দ্বীনে হানীফ তথা ইবরাহীম আলাইহিসসালামের ধর্মের অনুসারী মনে করত, এমনিভাবে তারা সত্য ধর্ম আসমানী ধর্মের অনুসারী মনে করত, আর বর্তমান মুজাহিদরা যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে তারা নিজেদেরকে সকল ধর্মের উর্দ্ধে মনে করে এবং নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক ধর্মের অনুসারী মনে করে।

ট). রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন তারা লাত-উয্যার অনুসরণকে ওয়াজিব মনে করত, আর বর্তমানে মুজাহিদরা যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে তারা আবরাহাম লিংকন, রুশো, ভোল্টায়ার, লেনিন, কালমার্কসের অনুসরণকে ওয়াজিব মনে করে।

ঠ). রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন তারা তাদের আহবার (ওলামা), রুহবান (পীরসাহেবান), গোত্রপতি, রাষ্ট্রপতি, দলপতিদেরকে বিধানদাতা মনে করত, আর বর্তমান মুজাহিদরা যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে তারা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্য, স্পিকার, ও জনপ্রতিনিধিদেরকে বিধানদাতা মনে করে।

বলাবাহুল্য, এ পার্থক্যগুলোর কারণে রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের জিহাদী কর্মকাণ্ডগুলো এ যামানায় এসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও কঠোরতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ পার্থক্যগুলোর কারণে একটি ফরয আমল হারামে পরিণত হয় কি না? অথবা এতটুকু পার্থক্যের কারণে যদি কেউ জিহাদকে বর্বরতা, হিংস্রতা, নির্মমতা, কঠোরতা

বলে ব্যক্ত করে তা হলে সে মুরতাদ না মুসলমান? মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। সিদ্ধান্ত দেবেন যিনি কিতাবের রাজা, আর ময়দানের মহারাজা। না শুধু ময়দানে ঘুরে ঘুরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে, আর না শুধু কিতাব পড়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে।

ইসলামী অর্থনীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে যদি চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে শতভাগ অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যকীয় হয় তাহলে জিহাদের মাসআলায় তা কেন প্রয়োজন হবে না। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে যখন তাদের শুধুমাত্র দাবির ভিত্তিতে ফাতওয়া দেয়া যায় না; বাস্তব অবস্থা জানাকে জরুরী মনে করা হয়, তখন জিহাদের মত একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য জিহাদের শত্রুদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমকে যথেষ্ট মনে করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আর যারা শত্রুশিবিরে বসে, শত্রুর পরামর্শে, শত্রুর সহযোগিতায় এবং শত্রুর প্রহরায় এ বিষয়ে কথা বলে তাদের কথা শোনা, তাদের সিদ্ধান্ত মানা মুসলমানের জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে? ওলামায়ে কেরাম যদি তাঁদের আপন পরিচয়ে ইলমের ময়দানে আবির্ভূত হতেন, পারিপার্শ্বিক সকল প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি খবরাখবর নিয়ে সিদ্ধান্তের পথে আগাতেন তাহলে উম্মত কত যে উপকৃত হত। শুধু উপকৃত হওয়া নয়, উম্মত ভয়ংকর একটি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যেত।

৬১. 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ হল দাওয়াত ও মুহাব্বতের পথ'

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে ১. ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ এ দু'টিই, আর কোন পথ ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নয়। ২. অথবা উদ্দেশ্য হতে পারে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এ দু'টিও আছে। ৩. অথবা উদ্দেশ্য হতে পারে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে এ দু'টি পদ্ধতিতে, এ দু'টি চূড়ান্ত পদ্ধতি নয়। ৪. অথবা উদ্দেশ্য হতে পারে দাওয়াত ও মুহাব্বত হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল রূহ। তবে এ দাওয়াত ও মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে শরীয়ত যেভাবে বলেছে সেভাবে। বুদ্ধদেব, দেওয়ানবাগী, কুতুববাগী, মাইজভাণ্ডারী বা আটরশির পদ্ধতিতে নয়। এমনিভাবে হাক্কানী আঞ্জুমানের পদ্ধতিতে নয় যারা সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভার আয়োজন করে এবং উপযুক্ত মেহমান হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ যোগ্যতার বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথির চেয়ার অলংকৃত করেছে।

যদি **প্রথমটি** উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ দাবি ভুল। কারণ ইসলামের বিজয় ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা বলেছেন তা হচ্ছে যারা ঈমান আনবে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকবে এবং দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে। কুরআনের ভাষায় সে পদ্ধতি এভাবে বিবৃত হয়েছে-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. (سورة التوبة ٢٩-٣٣).

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয়। আর ইয়াহূদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরী করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে? তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের[৫] রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র। তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়

---

[৫] এস্থলে أحبار দ্বারা উদ্দেশ্য ইয়াহূদীদের ধর্মপন্ডিতগণ আর رهبان দ্বারা খৃস্টানদের ধর্মপন্ডিতগণ।

তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

(سورة الفتح ٢٧-٢٩).

"অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুন্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে আলমাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ জেনেছেন যা তোমরা জানতে না। সুতরাং এ ছাড়াও তিনি দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান

আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. (سورة الصف ٨-١٣).

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহাসাফল্য। এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও"। -সূরা সফ ৮-১৩

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দ্রষ্টা"। -সূরা আনফাল ৩৯

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. (سورة محمد ١-٦).

"যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বারণ করেছে, তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য, তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। তা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের রবের প্রেরিত হকের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়[৬]। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। অচিরেই তিনি তাদেরকে হিদায়াত দিবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে দিয়েছেন"। সূরা মুহাম্মদ ১-৬

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. (سورة النصر ١-٣).

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে, তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস

---

[৬] অর্থ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া।

তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী''। সূরা নাসর ১-৩

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামকে বিজয় ও প্রতিষ্ঠা করার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা এই।
সহীহ বুখারীর বর্ণনা-

٢٥- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله». (**صحيح البخاري**).

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল -মানুষ এ সাক্ষ্য দেয়া, নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে। তারা যখন এ কাজগুলো করবে তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত, সম্পদ রক্ষা করতে পারবে। তবে ইসলামের অন্য কোন হকের কারণে হলে ভিন্ন কথা এবং তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে''। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫

٧٤٥٨- عن أبي وائل، عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله». (**صحيح البخاري**).

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর বিধান সমুন্নত রাখার জন্য যে যুদ্ধ করবে সে আল্লাহর পথে রয়েছে''। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৫৮

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ ধরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সংক্ষিপ্ত মাদানী জীবনে সাতাশ বা উনত্রিশটি জিহাদ করে গেছেন। সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে-

٣٩٤٩- حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة قيل كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة. (**صحيح البخاري وغيره**).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل ابن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عثمان قال سألت موسى بن أنس كم غزا رسول الله ؟ قال سبعاً وعشرين غزاة ثمان غزوات يغيب فيها الأشهر وسائرهن يغيب فيها الأيام والليالي قلت كم غزا أنس ؟ قال ثمان غزوات. (**دلائل النبوة للبيهقي**).

জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাচ্ছেন তখনও জিহাদের একটি কাফেলা তৈরি করে দিয়ে গেছেন যে কাফেলা ময়দানে পৌঁছার আগেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর সে কাফেলা জিহাদ চালিয়ে গেছে যা আর কখনো বন্ধ হয়নি, বন্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

সহীহ বুখারীর বর্ণনা দেখুন-

সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বব্যাপী ইসলামকে বিজয় করা ও প্রতিষ্ঠিত করার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা এই-

عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"، فقال: **والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة**، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. (**صحيح البخاري**، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: ٧٢٨٤).

ইবনে কাসীরের বর্ণনা দেখুন-

خِلَافَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. بِدَايَةُ خِلَافَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فقام بالامر من بعده أتم القيام الفاروق امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو اول من سمي بامير المؤمنين وكان اول من حياه بها المغيرة بن شعبة.... وقد كتب بوفاة الصديق الى امراء الشام مع شداد بن اوس ومحمد بن جريح فوصلا والناس مصافون

وجيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا وقد امر عمر على الجيوش ابا عبيدة حين ولاه وعزل خالد بن الوليد. (البداية والنهاية ٩-٥٧٥ دار هجر).

এবং এ ধারাবাহিকতার ইতি টানা হয়নি। মুসলমানরা যতদিন মুসলমান ছিল ততদিনই দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এটাই ছিল। এভাবেই অর্ধ পৃথিবী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

এমতাবস্থায় দাওয়াত ও মুহাব্বতকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ বলার বৈধতা কোথায়? বিশেষত যখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জিহাদের মত একটি কঠিন ও কঠোর পথকে এড়িয়ে চলা। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে মুহাব্বত ও দাওয়াতকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ বলার বৈধতা কীভাবে বেরিয়ে আসে?

যে মানুষগুলো আল্লাহকে না চিনে, ইসলামকে না বুঝে জাহান্নামের পথে এগিয়ে চলেছে তাদেরকে ঘাড় ধরে ইসলামের পথে এনে জান্নাতের পথ দেখানোই তো প্রকৃত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। একজন অন্ধ ও বধির মানুষ যদি রাস্তায় চলতে চলতে এমন কোন গর্তের পাড়ে চলে আসে যেখান থেকে সে আর এক কদম আগে বাড়লেই চিরজীবনের জন্য হারিয়ে যাবে তখন তার প্রতি দয়া দেখানোর পদ্ধতি কী? না সে হাতের ইশারা বুঝবে, আর না কোন আহ্বান শুনতে পাবে। তাকে বাঁচানোর একমাত্র পদ্ধতি দ্রুত ধাক্কা দিয়ে গর্তের বিপরীত দিকে ফেলে দেয়া। এতে সে ব্যথাও পাবে, মনে কষ্টও পাবে, যারা দেখবে তারাও একে অন্যায় বলে বিবেচনা করবে। কিন্তু যার চোখ আছে তাকেতো এ কাজটি করতেই হবে। এটাই তার প্রতি সঠিক ভালবাসা। এজন্য জিহাদের এ কঠোর বিধান। আমরা এখন কোন ভালোবাসার কথা বলছি?

ইসলামের ইতিহাসে দাওয়াত ও জিহাদের জন্য একই কাফেলা ছিল। এর জন্য আলাদা আলাদা কাফেলার কোন ধারণা ছিল না। আলোর কাফেলা চলেছে। তাদের প্রথম কাজ কোন জনপদকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। দাওয়াত কবুল না করলে কর দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানো। এতে রাজি না হলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ। তরবারির মাধ্যমে শেষ ফায়সালা। দাওয়াতও হবে আত্মভোলা মানুষগুলোকে জান্নাতের পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং অস্ত্রধারণও হবে তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে। এতে করে শরীরের দুষ্ট অংশটি কেটে ফেলা দেয়া হলে বাকি অংশটি সুস্থভাবে

জান্নাতের পথে চলতে সাহস পাবে। গতি পাবে। এ প্রতিটি কাজই হবে মুহাব্বতের সাথে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ছেড়ে দেয়াকে মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ বলা মানেই হল, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাতলানো পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন ভুল কোন পথে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করা।

আর যদি উদ্দেশ্য হয় **দ্বিতীয়টি** অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এ দু'টিও আছে, তা হলে বলা যায়, এ দাবির গুনাহ আগের দাবির তুলনায় একটু কম। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট থাকা দরকার, বিষয়টি হচ্ছে, মুহাব্বত কোন কাজের নাম নয়। এটা হচ্ছে মনের একটি অবস্থার নাম। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে কাজই করবে সেখানে দ্বীনের প্রতি দরদী হতে হবে। আল্লাহর জন্য ও দ্বীনের জন্য ভালবাসা থাকতে হবে। কাজ হচ্ছে, দাওয়াত ও জিহাদ। আর জিহাদের হুকুম আসার পর দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল, একই জামাত তরবারি হাতে, অস্ত্র হাতে বের হবে। কাফের জনপদে গিয়ে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেবে। দাওয়াত গ্রহণ না করলে বশ্যতা স্বীকার করে নিজেদের হীনতার স্বীকৃতির সাথে অমুসলিম হওয়ার অপরাধে মুসলমানদেরকে কর দেয়ার অঙ্গীকার করবে। যদি তাতে রাযি না হয় তাহলে তরবারির মাধ্যমে ফায়সালা হয়ে যাবে।

এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো পদ্ধতি। নয়-দশ বছর যাবত তিনি তাঁর সাহাবীগণকে এ পদ্ধতির অনুশীলন করিয়ে পরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। এখন যদি কেউ জিহাদের বিপরীতে মুহাব্বত ও দাওয়াতকে দাঁড় করিয়ে দেয় তাহলে বুঝতে হবে তার মতলব ভালো নয়। সে ইহুদী-খৃস্টানদের আহবার ও রুহবানের পদ দখল করার চেষ্টা করছে।

আর যদি উদ্দেশ্য হয় **তৃতীয়টি** অর্থৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে এ দু'টি পদ্ধতিতে, এ দু'টি চূড়ান্ত পদ্ধতি নয়, তাহলে এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, মুহাব্বত ও দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দিয়ে গেছেন। সূচনা বার বার হয় না। এ কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের আদেশ আসার পর জিহাদই দাওয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি জিহাদী হামলার মাধ্যমে খবর যত দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যায় অন্য কোন মাধ্যমে কখনো এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে না। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, বর্তমানে

মুজাহিদ হামলা করতে গেলে হামলা করার আগে ঈমানের দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়। করণ হচ্ছে, ঈমান ও ইসলামের এ খবর সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে। তবে সতর্কতা হিসাবে আক্রমণের আগে একবার দাওয়াত দিয়ে দেয় উত্তম। ওয়াজিব নয়।

আর এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজো দাওয়াত ও মুহাব্বতের মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে। কিন্তু পদ্ধতি তাই হবে যা সাহাবায়ে কেরাম দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মুহাব্বতের সাথে মাদউর কল্যাণ কামনার্থেই তাকে বলা হবে, 'আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে চাই, সকল ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে যেতে চাই এবং বান্দার দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিতে চাই'। কিন্তু এ দাওয়াত ও মুহাব্বত দীর্ঘ মেয়াদী কোন বিষয় নয়। এ হচ্ছে কয়েক মিনিটের বিষয়। কাফের সরদার জিজ্ঞেস করেছিল যদি আমরা তা না করি তাহলে কি হবে? সাহাবী বলেছেন, তাহলে তরবারির মাধ্যমে ফায়সালা হবে। দাওয়াতের সঙ্গে তরবারির বৈপরীত্য কোথায়? আর মুহাব্বতের সাথেই বা তরবারির বৈপরীত্য কোথায়?

আর যদি উদ্দেশ্য হয় **চতুর্থটি** অর্থাৎ দাওয়াত ও মুহাব্বত হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল রূহ, তাহলে এর সঙ্গে এবং তরবারির সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসে কখনো বৈপরীত্য হয়নি এবং হওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। জিহাদী কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক দৃশ্য যত নির্মমই হোক না কেন, যত কঠোরই হোক না কেন, যত হৃদয় বিদারকই হোক না কেন, মূলত এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইসলামের আহ্বান সবার দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা থেকে এ জিহাদের বিধান।

এখন কেউ যদি দাওয়াত, মুহাব্বত ও জিহাদ এ বিষয়গুলোকে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয় তাহলে সে অবশ্যই যিন্দিক। কারণ জিহাদের পদ্ধতি হচ্ছে কঠোরতা ও নির্মমতার পথ। এ পথকে পরিহার করে দাওয়াত ও মুহাব্বতের কথা বলা হচ্ছে। তার মানে এ একলক্ষ সাহেব কঠোরতার পথটিকে অস্বীকার করেতে চায়। অথচ কঠোরতা ও নির্মমতা ছাড়া জিহাদের কোন পদ্ধতি কুরআন, হাদীস, সীরাত, ইসলামের ইতিহাস ও ফিকহের কিতাবাদিতে নেই। অতএব একজন মানুষ জিহাদকে স্বীকার করে আর কঠোরতাকে পরিহার করতে বলে, উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য সাধনের পদ্ধতি কী? বরং তাদের দলিল

উপস্থাপনের পদ্ধতি থেকে বলতে পারি, তারা জিহাদের এ কঠোর পদ্ধতিকে হিংস্রতা, বর্বরতা, কঠোরতা, নির্মমতা বলে ব্যক্ত করছে। অন্তত তাদের এ ফাতওয়া পড়ে মানুষ এটাই বুঝতে পারছে। এর পাঠকরা আমাদেরকে এমনটিই বলছে।

৬২. 'গোটা জীবন এর জ্বলন্ত সাক্ষী'

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত-মুহাব্বত-প্রেম-খেদমত -এর পরে কি আর কিছু নেই? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের গোটা জীবন সাক্ষ্য দেয়, তিনি নবুয়তপ্রাপ্তির পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত গোপনে মানুষদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কার মানুষ যে কুফরীতে লিপ্ত ছিল স্পষ্ট করে সে কুফরী থেকে তাদেরকে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। এরপর প্রকাশ্যে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। জিহাদের হুকুম আসার আগ পর্যন্ত কাফেরদেরকে চাই সে নেতা হোক বা পাতি নেতা হোক বা সাধারন জনগণ হোক সবাইকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। তারা যে মানবরচিত আইনের উপর চলত তা কুফর এ কথা স্পষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে ঈমানের পথে আসতে বলেছেন। তারা যে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রস্তাব দিয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র ইসলাম ধর্মই ধর্ম -একথার দাওয়াত দিয়েছেন। তারা যাকে ঈমান মনে করত তা যে আসলে কুফর সে কথা স্পষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে ঈমানের পথে আসতে বলেছেন। জিহাদের হুকুম আসার আগ পর্যন্ত কাফেরদের সঙ্গে যে আচরণ করতে বলা হয়েছে তিনি সে আচরণই করে গেছেন। সকল জুলুম সয়ে নেয়ার আদেশ করা হয়েছে, তিনি সয়ে নিয়েছেন। হিজরত করতে আদেশ করা হয়েছে, হিজরত করেছেন। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও জিহাদের হুকুম আসেনি, তিনি তা করেননি। নববী জীবনের একটি পর্ব এবং প্রথম পর্ব এভাবে অতিক্রম করেছেন।

হিজরতের পর দ্বিতীয় হিজরীতে জিহাদের আদেশ এসেছে। বার বার দাওয়াত দেয়া, ক্ষমা করে দেয়া, এড়িয়ে যাওয়া সব রহিত হয়ে গেছে। মুসলমানদেরকে পাল্টা আক্রমণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। শিরক-কুফরের মূলোৎপাটন পর্যন্ত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হয়েছে। কাফের-মুশরিকদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে। ঘাড়ে মারতে আদেশ করা হয়েছে। গিরায় গিরায় মারতে আদেশ করা হয়েছে। কুফরী শক্তি নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত

পিটাতে বলা হয়েছে। রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আসতে আদেশ করা হয়েছে। ঘাড় মোটা বদমাশগুলোকে জবাই করে করে গর্তে পুঁতে ফেলতে আদেশ করা হয়েছে।

এ আদেশ আসার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের ক্ষুদ্র জামাতটিকে নিয়ে আদেশ পালনার্থে নেমে পড়েছেন। গুটি কয়েক মুসলমান, আর সারা পৃথিবী কুফরে ঘেরা। এ ক্ষুদ্র কাফেলাটি শেষ হয়ে গেলে এ ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে সেজদা করার মত কোন মানুষ নেই। কিন্তু আল্লাহর হুকুম বলে কথা। ফরয দায়িত্ব আদায় করতেই হবে। সে জন্যই সারা বিশ্বের কুফরী শক্তির সামনে ক্ষুদ্র কাফেলাটি পেশ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে আলোর কাফেলা অস্ত্র হাতে এগিয়ে চলেছে। যে কাফেরদেরকে জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহর রাসূল শতবার তাদের দ্বারস্ত হয়েছেন, শত ভর্ৎসনা শুনে শুনে, হাজার বার লাঞ্ছিত হয়ে আবার তাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন, শত বার গালমন্দ শুনে কোন প্রতিবাদ না করে মাথা নিচু করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে এসেছেন সে কাফেরদেরকে হত্যা করার জন্য আজ সে রাসূল তরবারী নিয়ে, তীর-ধনুক নিয়ে, বর্ষা নিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে পাঠাচ্ছেন, শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে নিয়ে আসার জন্য সাহাবীদেরকে পাঠাচ্ছেন।

যখন থেকে জিহাদের আদেশ এসে গেছে তখন থেকে আর সাধাসাধি নেই, বার বার বলা নেই, গায়ে হাত বোলানো নেই। সুস্পষ্ট করে দাওয়াত এরপরই ফায়সালা তরবারীর মাধ্যমে। এ যে পরিবর্তন, এ যে ব্যবধান সবই আল্লাহর আদেশের ভিত্তিতে। যখন ক্ষমা করার আদেশ ছিল তখন ক্ষমা করেই গেছেন। যখন অস্ত্র ধারনের আদেশ এসেছে তখন অস্ত্রই চালিয়ে গেছেন। রাসূলের জীবনের শেষ পর্যন্ত মানসূখ-রহিত হুকুম আর ফিরে আসেনি, নাসেখ-রহিতকারী হুকুমই বলবৎ থেকে গেছে। উম্মতকে এর উপরই রেখে গেছেন। বলে দিয়ে গেছেন 'কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে'। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অস্ত্র কেয়ামত পর্যন্ত শানিত থাকবে। রাসূলের গোটা জীবন তো এ সাক্ষ্যই বহন করে। মানসূখ-রহিত হুকুম দিয়ে যদি কেউ আবার মদকে হালাল প্রমাণ করতে চায় তাহলে সে মুরতাদ। মানসূখ-রহিত হুকুম দিয়ে যদি কেউ বাইতুল্লাহকে কেবলা হিসাবে অস্বীকার করতে চায় তাহলে সে মুরতাদ। মানসূখ-রহিত হুকুম দিয়ে যদি

কেউ মুশরিকদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন বৈধ প্রমাণ করতে চায় তাহলে সে যিন্দিক, মুলহিদ। মানসূখ-রহিত হুকুম দিয়ে যদি কেউ অস্ত্র পরিচালনাকে অবৈধ বলে প্রমাণ করতে চায় তাহলে সে যিন্দিক, মুলহিদ।

৬৩. وما علينا إلا البلاغ المبين

হিংস্রতা, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা ইসলামে নেই -এ কথা প্রমাণ করার জন্য তো এ আয়াত আসার কথা নয়। এ আয়াত দিয়ে দলিল দেয়ার কথা এ দাবি প্রমাণ করার জন্য যে, সুস্পষ্ট দাওয়াত পৌঁছানোর পর দাওয়াত প্রদানকারীর আর কোন দায়িত্ব নেই। তাহলে এ আয়াতটি এখানে কেন উল্লেখ করা হয়েছে? একজন পাঠক যদি শিরোনামের দাবি এবং এ আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে এ কথা বুঝে নেয় যে, সুস্পষ্ট দাওয়াত দেয়ার পর আর যা করা হবে তা হচ্ছে হিংস্রতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা -পাঠক এ কথা বুঝলে পাঠকের কী দোষ? আর পাঠক এ কথা জানে যে, সুস্পষ্ট দাওয়াতের পর রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম আর যা করেছেন তা হচ্ছে জিহাদ। তাহলে সুস্পষ্ট দাওয়াতের পর আবার জিহাদ করাটা কি হিংস্রতা, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা? পাঠকের এ বুঝ কেন ভুল?

আসলে একটি মিথ্যার জন্য অনেকগুলো মিথ্যা বলতে হয়। আয়াতটিতে কাদের কথা তুলে ধরা হয়েছে? এ কথাটি যাদের মুখের তাদের উপর কি জিহাদ ফরয ছিল? তাদের জন্য কি আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদের কোন বিধান ছিল? এখানে সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার পর আর দাওয়াত দিতে হবে না উদ্দেশ্য? না কি সুস্পষ্ট দাওয়াতের পর জিহাদ করা যাবে না উদ্দেশ্য? না কি সুস্পষ্ট দাওয়াত দেয়ার পর জিহাদ করার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা নেই উদ্দেশ্য? তাফসীরের কিতাবাদি থেকে একটু খতিয়ে দেখা যাক।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

(سورة يس ١٣-١٧).

والقرية انطاكية. إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ بدل من أصحاب القرية، والْمُرْسَلُونَ رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. (**تفسير البيضاوي**).

যারা মানুষদেরকে এ কথা বলেছে তারা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামের পাঠানো কয়েকজন মানুষ যাদেরকে শুধু দাওয়াত দেয়ার জন্যই পাঠানো হয়েছিল। তাদের বেলায় জেহাদের কোন হুকুম ছিল না। সে আয়াতটি এখানে কেন উল্লেখ করা হয়েছে? শিরোনামের সঙ্গে মিলালে তো এ আয়াত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বোঝা যায় তারা বলতে চায়, সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়ার পর অস্ত্রের মাধ্যমে আর যা কিছু করা হবে তা হিংস্রতা, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা। অথচ পূর্ববতী-পরবর্তী সকল নবীর বেলায়ই যখন এ কথা বলা হয়েছে যে, তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌঁছে দেয়া। পৌঁছে দেয়ার পর পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য নবী দায়ী নন। আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসলেও তাদের আর বলার কিছু নেই, আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের উপর হামলা হলেও তাদের কোন ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ একটি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম বায়যাবী রহ. বলেন-

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ تشديد في إيجاب القيام بما أمر به أي الرسول أتى بما أمر به من التبليغ ولم يبق لكم عذر في التفريط. **(تفسير البيضاوي)**.

যার অর্থ হচ্ছে তাবলীগের দায়িত্ব আদায় হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে আর কোন বাধা নেই। যেমন কাফেরদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে এবং আল্লাহ তাআলা তার কি সুন্দর চিত্রায়ন করেছেন-

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (سورة الأنفال ٣١-٣٤).

"আর তাদের উপর যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, শুনলাম তো। যদি আমরা চাই, তাহলে এর অনুরূপ আমরাও বলতে পারি। এতো পিতৃ–পুরুষদের কল্প-কাহিনী ছাড়া কিছু না। আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ, যদি এটি সত্য হয় আপনার পক্ষ থেকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিয়ে আসুন। আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে

আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আযাব দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে। **আর তাদের কী আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না? অথচ তারা মসজিদুল হারাম থেকে বাধা প্রদান করে, আর তারা এর অভিভাবকও নয়।** তার অভিভাবক তো শুধু মুত্তাকীগণ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।

তাফসীরে জালালাইন দেখুন-

[وما لهم] أن [لا يُعَذِّبُهُمْ اللهّٰ] بِالسَّيْفِ بَعْد خُرُوجك وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَعَلَى الْقَوْل الْأَوَّل هِيَ نَاسِخَة لِمَا قَبْلهَا وَقَدْ عَذَّبَهُمْ اللهّٰ بِبَدْرٍ وَغَيْره [وَهُمْ يَصُدُّونَ] يَمْنَعُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللهّٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ [عَنْ الْمَسْجِد الْحَرَام] أَنْ يَطُوفُوا بِهِ [وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ] كَمَا زَعَمُوا [إنْ] مَا [أَوْلِيَاؤُهُ إلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرهمْ لَا يَعْلَمُونَ] أَنْ لَا وِلَايَة لَهُمْ عَلَيْهِ.

দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তারা অস্বীকার করেছে। দায়িত্ব শেষ হয়নি। শান্তির ব্যবস্থা হয়েছে। আর তা হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। যেহেতু তাবলীগ হয়ে গেছে, অতএব এখন তরবারি চালাতে আর কোন বাধা নেই। কিন্তু বলা হচ্ছে, তাবলীগের পর আর যা হবে তা হচ্ছে, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা। এরপরও ঈমানের কোন সমস্যা নেই। যিন্দিককে যিন্দিক বলতে ভয় হয়, কিন্তু যিন্দিককে মুসলমান বলে নিজের আদর্শ বানাতে ভয় হয় না। সুস্পষ্ট দাওয়াতের পর যদি আর করার কিছু না থাকে তাহলে মক্কা, হুনাইন ও তায়েফে কেন অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। সেখানে দাওয়াতের কোন মাত্রা রয়ে গিয়েছিল?

৬৪. لست عليهم بمصيطر

এ আয়াতটি উল্লেখ করে এক লক্ষ সাহেব বলতে চান, দাওয়াত দেয়ার পর আর কোন দায় দায়িত্ব নেই। এরপর আর যা কিছু হবে তা হচ্ছে বর্বরতা, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা। তাহলে দেখা যাক তাফসীরবিদগণ ও ফিকহবিদগণ মোটকথা রাসূল, সাহাবা ও যুগে যুগে দ্বীনের ধারক-বাহকগণ এ আয়াতের উপর কীভাবে আমল করেছেন। এর প্রয়োগ কিভাবে করেছেন।

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢)

[لَسْت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر] وَفِي قِرَاءَة بِالسِّينِ بَدَل الصَّاد أَيْ بِمُسَلَّطٍ وَهَذَا قَبْل الْأَمْر بِالْجِهَادِ. (تفسير الجلالين).

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل". ثم قرأ: [فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر]. (تفسير ابن كثير).

তাফসীরের বক্তব্যগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আয়াতের বিধানটি জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ-রহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতটির উল্লেখ সহই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতি দেয়ার আগ পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলতে থাকবে। সুস্পষ্ট দাওয়াত পৌছানোর পরও দায়িত্ব থেকে যায় -এ বিষয়ে আয়াত ও হাদীসে কোন অস্পষ্টতা নেই। তাহলে এ আয়াত দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে দলিল দেয়া হয়তো মূর্খতা নয়তো ইলহাদ। সংশ্লিষ্ট পক্ষ যেটিকে নিজের জন্য উপযুক্ত মনে করে সেটিকেই গ্রহণ করতে পারে।

এ আয়াত দিয়ে দলিল দেয়ার পর এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, এখানে জিহাদের বিরুদ্ধে বলা হয়নি, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। কারণ, এ আয়াত বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে নয়। এক লক্ষসাহেবের দাবি অনুযায়ী এ আয়াত হচ্ছে এ কথা বোঝানোর জন্য যে, সুস্পষ্ট দাওয়াত দেয়ার পর আপনার দায়িত্ব শেষ। এরপর যা করা হবে তা হচ্ছে, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা।

৬৫. لا إكراه في الدين

উপরে দাবি করা হয়েছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ হচ্ছে দাওয়াত ও মুহাব্বত, প্রেম ও খেদমত এবং কল্যাণের প্রতি দাওয়াত। দলিল দেয়া হয়েছে, لا إكراه في الدين এ আয়াত দিয়ে। ফলাফল হচ্ছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার উল্লিখিত পথগুলো ব্যতীত আর যেসব পথ রয়েছে সেগুলো যবরদস্তির-বাধ্যবাধকতার পথ যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, উপরোল্লিখিত পথগুলোর

মধ্যে জিহাদের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ হিসাবে একলক্ষ সাহেব জিহাদকে অস্বীকার করেন -এ দাবি করার মাঝে অপরাধটা আসলে কোথায়? সর্বোচ্চ অপরাধ হতে পারে, একলক্ষ সাহেব ইসলাম প্রতিষ্ঠার উল্লিখিত পথগুলো ব্যতীত অন্যান্য পথকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা বলেছে। আর আমরা সেটাকে জিহাদ বলছি। কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ফিকহের কিতাবাদিতে কৃত সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে যাওয়ার কারণে আমরা একে জিহাদ বলছি। আর রক্তারক্তি, মানুষ হত্যা, অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদির কারণে একলক্ষ সাহেব একে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা বলছেন। এবার আয়াতটি সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ কি বলেন তা দেখা দরকার। এ ফাতওয়ার আয়োজকরা এ আয়াত থেকে যা উদ্ধার করেছেন তাফসীরবিদগণ তাই বলেছেন? না কি ভিন্ন কিছু বলেছেন?

ইমাম জাসসাস রহ. তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন-

قوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" روي عن الضحاك والسدي وسليمان بن موسى إنه منسوخ بقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقوله تعالى فاقتلوا المشركين. وروي عن الحسن وقتادة أنها خاصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية دون مشركي العرب، لأنهم لا يقرون على الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.

وقيل، إنها نزلت في بعض أبناء الأنصار؛ كانوا يهودا فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام. وروى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير. وقيل فيه أي لا تقولوا لمن أسلم بعد حرب أنه أسلم مكرها لأنه إذا رضي وصح إسلامه فليس بمكره.

قال أبو بكر: لا إكراه في الدين أمر في صورة الخبر، وجائز نزول ذلك قبل الأمر بقتال المشركين، فكان في سائر الكفار كقوله تعالى إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وكقوله تعالى إدفع بالتي هي أحسن السيئة، وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فكان القتال محظورا في أول الإسلام إلى أن قامت عليهم الحجة بصحة نبوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما عاندوه بعد البيان أمر المسلمون بقتالهم. فنسخ ذلك عن مشركي العرب بقوله تعالى: اقتلوا

المشركين حيث وجدتموهم، وسائر الآي الموجبة لقتال أهل الشرك. وبقي حكمه على أهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية، ودخلوا في حكم أهل الإسلام وفي ذمتهم. ويدل على ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقبل من المشركي العرب إلا الإسلام أو السيف.

وجائز أن يكون حكم هذه الآية ثابتا في الحال على أهل الكفر، لأنه ما من مشرك إلا وهو لو تهود أو تنصر لم يجبر على الإسلام وأقررناه على دينه بالجزية، وإذا كان ذلك حكما ثابتا في سائر من انتحل دين أهل الكتاب ففيه دلالة على بطلان قول الشافعي حين قال: من تهود من المجوس أو النصارى أجبرته على الرجوع إلى دينه أو إلى الإسلام، والآية دالة على بطلان هذا القول، لأن فيها الأمر بأن لا نكره أحدا على الدين، وذلك عموم يمكن استعماله في جميع الكفار على الوجه الذي ذكرنا.

فإن قال قائل فمشركو العرب الذين أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتالهم، وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؛ قد كانوا مكرهين على الدين. ومعلوم أن من دخل في الدين مكرها فليس بمسلم، فما وجه إكراههم عليه؟

قيل له: إنما أكرهوا على إظهار الإسلام، لا على الاعتقاد لأن الاعتقاد لا يصح منا الإكراه عليه، ولذلك قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم اموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن القتال إنما كان على إظهار الإسلام، وأما الاعتقادات فكانت موكولة إلى الله تعالى. ولم يقتصر بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على القتال دون أن أقام عليهم الحجة والبرهان في صحة نبوته، فكانت الدلائل منصوبة للإعتقاد وإظهار الإسلام معا، لأن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاد الإسلام فقد اقتضت منه الإظهار والقتال لإظهار الإسلام،

وكان في ذلك أعظم المصالح، منها: أنه إذا أظهر الإسلام وإن كان غير معتقد له فإن مجالسته للمسلمين، وسماعه القرآن، ومشاهدته لدلائل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع ترادفها عليه تدعوه إلى الإسلام، وتوضح عنده فساد اعتقاده. ومنها: أن يعلم الله أن في نسلهم من يوقن ويعتقد التوحيد فلم يجز أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون في أولادهم من

يعتقد الإيمان. وقال أصحابنا فيمن أكره من أهل الذمة على الإيمان أنه يكون مسلما في الظاهر، ولا يترك والرجوع إلى دينه إلا أنه لا يقتل إن رجع إلى دينه ويجبر على الإسلام من غير قتل، لأن الإكراه لا يزيل عنه حكم الإسلام وإذا أسلم وإن كان دخوله فيه مكرها دالا على أنه غير معتقد له لما وصفنا من إسلام من أسلم من المشركين بقتال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إظهار الإسلام عند القتال إسلاما في الحكم، فكذلك المكره على الإسلام من أهل الذمة واجب أن يكون مسلما في الحكم، ولكنهم لم يقتلوا للشبهة. ولا نعلم خلافا أن أسيرا من أهل الحرب لو قدم ليقتل فأسلم أنه يكون مسلما ولم يكن إسلامه خوفا من القتل مزيلا عنه حكم الإسلام فكذلك الذمي.

فإن قال قائل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، يحظر إكراه الذمي على الإسلام، وإذا كان الإكراه على هذا الوجه محظورا وجب أن لا يكون مسلما في الحكم، وأن لا يتعلق عليه حكمه، ولا يكون حكم الذمي في هذا حكم الحربي، لأن الحربي يجوز أن يكره على الإسلام لإبائه الدخول في الذمة، ومن دخل في الذمة لم يجز إكراهه على الإسلام.
قيل له إذا ثبت أن الإسلام لا يختلف حكمه في الإكراه والطوع لمن يجوز إجباره عليه، أشبه في هذا الوجه العتق والطلاق وسائر ما لا يختلف فيه حكم جده وهزله، ثم لا يختلف بعد ذلك أن يكون الإكراه مأمورا به أو مباحا، كما لا يختلف حكم العتق والطلاق في ذلك لأن رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو عتاق ثبت حكمهما عليه وإن كان المكره ظالما في إكراهه، منهيا عنه. وكونه منهيا عنه لا يبطل حكم العتق والطلاق عندنا، كذلك ما وصفنا من أمر الإكراه على الإسلام. (احكام القرآن،٦١٩-٦١٧/ ١ قديمي كتب خانه)

যার সারমর্ম হচ্ছে, আয়াতটি জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ-রহিত হয়ে গেছে। আর কোন কোন কাফেরের ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ না করলে কর দেয়ার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে কাফের হিসাবে বেঁচে থাকতে দেয়া হবে। তবে এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ফিকহের কিতাবাদিতে। ফিকহে হানাফীর হেদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুস সিয়ার' আংশের শুরুতে এ বিষয়ে খুলে খুলে মাসআলা বলা হয়েছে। এখানে মাসআলা বয়ান করা উদ্দেশ্য নয়, তাই ধারাবাহিক কথাগুলো উল্লেখ করা হয়নি। নমুনা হিসাবে সামান্য একটু ইবারত তুলে ধরা হয়েছে।

ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين "لأن كفرهما قد تغلظ، أما مشركو العرب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر، وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما هدى للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة. وعند الشافعي رحمه الله: يسترق مشركو العرب وجوابه ما قلنا.

"وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء" لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين "ومن لم يسلم من رجالهم قتل" لما ذكرنا. (**الهداية**،١\٥٩٥ النسخة الهندية)

হেদায়ার উপরোক্ত ইবারতসহ কিতাবুস সিয়ার অধ্যয়ন করলে যে কোন পাঠকের সামনেই দিবালোকের মত এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সুস্পষ্ট দাওয়াত দেয়ার পর ইসলাম গ্রহণ না করলে কোন কোন কাফেরকে হত্যা করার বিধান রয়েছে, আর কোন কোন কাফেরকে কর দিতে বাধ্য করার বিধান রয়েছে, কর দিতে অস্বীকার করলে হত্যা করার বিধান রয়েছে। এ আয়াত বা অন্য কোন আয়াত বা কোন হাদীসের ভিত্তিতে এমন কোন মাসআলা কেউ বলেননি যে, কাফেরদেরকে সুস্পষ্ট দাওয়াত দেয়ার পর আর কোন দায়িত্ব নেই। দাওয়াত দেয়ার পর আর যা কিছু করা হবে তা বর্বরতা, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা -এমন কোন কথা কোথাও নেই।

কিতাব আমাদেরকে বলছে, ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর দাওয়াত গ্রহণ না করলে তাকে হত্যা করা হচ্ছে জিহাদ এবং তা ফরয দায়িত্ব, একই ফরয দায়িত্বের অধীনে নারী ও শিশুরা হবে গোলাম-বাঁদী। কারো কারো ক্ষেত্রে তার উপর জরিমানা লাগানো হচ্ছে জিযয়া বা করারোপ করা যা ফরয দায়িত্ব। কিন্তু একলক্ষ সাহেব বলছে, এটা হচ্ছে, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা। এ ধারণা পোষণকারীর বিধান কী? এ ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস ও ফিকহের একজন ছাত্রের করণীয় কী?

৬৬. لكم دينكم ولي دين

ঈমান-কুফরের সহাবস্থানের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে, ঈমানের সংজ্ঞার পরিবর্তনে, শাসকদের পরিবর্তনে আজ সে প্রস্তাবেরই বাস্তবায়ন চলছে এ সূরা দিয়ে।
মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে, আপনি কিছু দিন আমাদের মূর্তিগুলোর পূজা করুন, তাহলে আমরাও কিছু দিন আপনার মাবুদের ইবাদত করব। এভাবে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে উঠবে। ধর্মে ধর্মে দূরত্ব দূর হবে। মূর্খদের মূর্খতা এবং অপদার্থদের অপদার্থতার জববা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরা নাযিল করে। আলো-অন্ধকার সহাবস্থানে আসতে পারে না এ কথা বুঝিয়ে দিলেন।

আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পর আবারও সে অপদার্থতা ও মূর্খতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। ব্যবধান হল, আগে ছিল তা কুফরের শিরোনামে, আর আজ চলছে দ্বীনের শিরোনামে। যার দরুন আজ এ প্রস্তাবের প্রস্তাবকরা মূর্তিপূজারীদের দেশে গেলে মূর্তিপূজা করে, মুসলমানদের দেশে আসলে নামায পড়ে। পূজার দিনে রাখিবন্ধন করে, ঈদের দিনে ঈদমোবারক দেয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপ, দালাইলামা, আমেরিকান কংগ্রেস ও হাউস অব কমেন্সের সমন্বয়ে সবার ইহ ও পরকালিন শান্তির বন্দোবস্ত করে চলেছে। একই পোস্টারে দুর্গা পূজা ও ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা চলছে। কোথাও কোন সমস্যা নেই।

মক্কার মুশরিকদের প্রত্যাখ্যাত সে প্রস্তাব যে এক কালে এসে এতটা সমাদৃতি পাবে এবং মুহাম্মদের উম্মত হওয়ার দাবিদারদের মাধ্যমেই হবে তা যদি তাদের জানা থাকত তাহলে তারা শুভেচ্ছার পুষ্পমাল্য বংশধরদের কাছে রেখে যেত উপযুক্ত প্রাপকদের গলায় তা পরিয়ে দেয়ার জন্য।
মুহতারাম ওলামা তলাবার কাছে বিনীত অনুরোধ; এ সূরার প্রেক্ষাপট তাফসীরের কিতাবাদিতে একটু দেখুন! এর হুকুম আহকামুল কুরআন বিষয়ক কিতাবগুলোতে দেখুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

[قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. (سورة الكافرون ١-٦)]

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، فقوله: [قل يا أيها الكافرون] شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش.

وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: [لا أعبد ما تعبدون] يعني: من الأصنام والأنداد، [ولا أنتم عابدون ما أعبد] وهو الله وحده لا شريك له. ف "ما" هاهنا بمعنى "من".

ثم قال: [ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد] أي: ولا أعبد عبادتكم، أي: لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: [ولا أنتم عابدون ما أعبد] أي: لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال: [إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى] ﴿النجم: ٢٣﴾ فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده، وعبادة يسلكها إليه، فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أي: لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: [لكم دينكم ولي دين] كما قال تعالى: [وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون] ﴿يونس:٤١﴾ وقال: [لنا أعمالنا ولكم أعمالكم] ﴿القصص: ٥٥﴾. (تفسير ابن كثير).

[لَكُمْ دِينكُمْ] الشِّرْك [وَلِيَ دِين] الْإِسْلَام وَهَذَا قَبْل أَنْ يُؤْمَر بِالْحَرْبِ. (تفسير الجلالين).

তাফসীরের কিতাবাদি এবং আহকামুল কুরআন বিষয়ক কিতাবাদি স্পষ্ট করে বলে চলেছে, এ সূরা হচ্ছে, ধর্ম-অধর্মের পরস্পরে সম্প্রীতির বিরুদ্ধে। এরপর এককাল পর্যন্ত এতটুকু ছাড় ছিল যে, তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাক, কিন্তু জিহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের জন্য তাদের ধর্ম নিয়ে থাকার অনুমোদনও রহিত হয়ে গেছে। এমন কি যাদের মূর্খতাপূর্ণ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তাদর জন্য হুকুম এসেছে, তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে মুসলমান হয়েই বেঁচে থাকতে হবে। মুসলমান না হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। কর দিয়ে বেঁচে থাকার অনুমতিও তাদের জন্য ছিল না। ইসলাম গ্রহণ না করলেই তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

মানসূখ ও রহিত হুকুম আজ দেড় হাজার বছর পর আবার নাসেখ ও রহিতকারী হিসাবে মঞ্চস্থ হচ্ছে। এমন ব্যক্তিদের হাতে যারা কুরআন তাফসীরের কাজে হাত দেয়ারও আস্পর্ধা দেখায়। ইহুদী-খ্রিস্টানদের ওলামা ও পীর সাহেবরা যে يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ কাজটি করত তার সঙ্গে এর পার্থক্য কোন কোন জায়গায়? ওলামায়ে কেরাম আবেগের কাছে কাবু না হয়ে একটু খতিয়ে দেখবেন।

৬৭. هل يأتي الخير بالشر

এ বিষয়ে দু'টি কথা। **প্রথম কথা** হচ্ছে, একজন মানুষ দাজ্জালের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করার জন্য এখানে যে কাজটি করা হয়েছে সে কাজটিই যথেষ্ট। এখানে হাদীসের অংশবিশেষ এনে যে অর্থ করা হয়েছে তার সঙ্গে হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। হাদীসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, 'ভালো কি মন্দকে টেনে আনতে পারে'? কিন্ত তরজমা করা হয়েছে 'খারাপ পন্থায় কি ভালো আসতে পারে'? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছেন 'ভালো ভালোকেই নিয়ে আসে'। মন্দ সৃষ্টি হয় বহিরাগত কারণে। কিন্তু তরজমা করা হয়েছে 'শুধু ভালো পন্থায়ই ভালো আসতে পারে অর্থাৎ ভাল কিছু প্রতিষ্ঠার জন্য এর পন্থাও ভালো হতে হবে'। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি এখানে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের পূর্বাপর একটু দেখুন, এরপর বিচার করুন। এর সঙ্গে সহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইরশাদুসসারী থেকে আল্লামা কাস্‌তাল্লানী রহ.এর কৃত আলোচ্য

হাদীসের ব্যাখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠক নিজেই একটু বিষয়টি মিলিয়ে দেখুন।

٦٤٢٧- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا -قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك- قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس، فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه، ووضعه في حقه، فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. (**صحيح البخاري**، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها).

(إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله) عز وجل بضم الياء من الإخراج (لكم من بركات الأرض قيل): يا رسول الله (وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا) بفتح الزاي وسكون الهاء وزاد هلال وزينتها وهو عطف تفسيري والزهرة مأخوذة من زهرة الشجرة وهو نورها بفتح النون والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والنبات والزرع وغيرها مما يغتر الناس بحسنه مع قلة بقائه (فقال له رجل): لم أعرف اسمه (هل يأتي الخير الشر)؟ أي هل تصير النعمة عقوبة لأن زهرة الدنيا نعمة من الله فهل تعود هذه النعمة نقمة والاستفهام للإرشاد (فصمت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى ظننا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي حتى ظننت (أنه ينزل عليه) الوحي (ثم جعل يمسح عن جبينه) العرق من ثقل الوحي (فقال) عليه الصلاة والسلام: (أين السائل؟ قال: أنا) يا رسول الله ... (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يأتي الخير إلا بالخير) وإنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع. (**إرشاد الساري للقسطلاني** ٩\٣٥٦ الطبعة الاميرية).

এরপর এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এখানে যে বলা হল, খারাপ পন্থায় ভালো আসতে পারে না সে খারাপ পন্থাটা কী? মানুষ হত্যার পন্থা? শিরোনাম

হিসাবে বাহ্যত এটাই বোঝা যাচ্ছে। কারণ সুস্পষ্ট দাওয়াত পৌঁছানোর পর ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্য যেসব পদ্ধতি ও পন্থা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে খারাপ পন্থা; কারণ সেসব পন্থায় মানুষ হত্যার ব্যাপার রয়েছে। আর একলক্ষ সাহেবের মতে মানুষ হত্যার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ প্রশ্ন আমরা আগেও করেছি, এখন আবারও করছি, মানুষ হত্যাই যদি একটি খারাপ পন্থা হয় তাহলে জিহাদকে ভাল পন্থা বলার কী ব্যবস্থা আপনাদের কাছে আছে। আর যার কাছে জিহাদকে ভাল পন্থা বলার ব্যবস্থা নেই সে নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করার কী সুযোগ আছে? আর তার জন্য এ দাবি করার প্রয়োজনই বা কতটুকু।

আসলে একজন মুসলমান হিসাবে আমি এটাই মনে করি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা, জিহাদ করতে গিয়ে আল্লাহর দুশমন কাফের মুশরিকদেরকে হত্যা করা, তাদের স্ত্রী-মেয়েদেরকে বাঁদী বানানো, তাদের শিশুদেরকে গোলাম বানানো, তাদের হিম্মত ও জৌলুসকে নষ্ট করার জন্য তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, তাদের গাছ-পালা কেটে ফেলা -এসবই ভাল পন্থা। কুরআন, হাদীস, ফিকহ এ কথাই বলে। কারণ তারা আল্লাহর যমিনে বসে বসে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মত আস্পর্ধা দেখাচ্ছে। অতএব এ পন্থাকে যারা খারাপ পন্থা বলবে তারা অসাম্প্রদায়িক খেতাব পেতে পারে, উদার খেতাব পেতে পারে, শান্তিতে নোবেল পেতে পারে, নাইট খেতাব পেতে পারে, বীর মুক্তিযোদ্ধা খেতাব পেতে পারে, কুতুবে বাঙ্গাল খেতাব পেতে পারে, কিন্তু সে মুসলমান হতে পারে না। মুসলমান হতে হলে ইসলামের জিহাদের এ পন্থাকে ভাল পন্থা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একে খারাপ পন্থা বলা যাবে না। একে হিংস্রতা, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। জিহাদের পথকে যারা খারাপ পথ বলবে তারা মুরতাদ।

৬৮. 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে সন্ত্রাসকে যুক্ত করা চরম মুনাফিকী'

অথচ মুসলমানদের প্রত্যেকটি জিহাদী কর্মকাণ্ডকেই এখন সন্ত্রাস বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ প্রত্যেকটি আয়াত ও হাদীসকেই জিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে চলেছে। এ কাজটি যখন আমেরিকা-লন্ডন করছে তখন ইসলাম ধর্মের ধারক-বাহক হওয়ার

দাবিদাররাও করে চলেছে। ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলমানদের যে কাজগুলোকে সন্ত্রাস বলছে, এ ফাতওয়ার আয়োজকরাও সে কাজগুলোকেই সন্ত্রাস বলে প্রমাণ করার সর্বশেষ চেষ্টাটুকু করে ছেড়েছে।

এ ফাতওয়ার আয়োজকদের দৃষ্টিতে বর্তমান পৃথিবীতে জিহাদের কোন অস্তিত্ব নেই। এ নামে যা আছে সব সন্ত্রাস। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি দাওয়াত ও মুহাব্বতের পর আর যা কিছু চলছে সব সন্ত্রাস। এ শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত প্রতিটি আয়াতের উল্লেখ তখনই যথাযথ হবে যখন এ কথা প্রমাণিত হবে যে, সুস্পষ্ট দাওয়াতের পর আর কিছু নেই। অর্থাৎ জিহাদ নেই। ফাতওয়ার আয়োজকরা এ কাজটিই করেছেন। এ ছাড়া মানসূখ-রহিত আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করার আর কোন উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

এরপরও যদি কেউ বলতে চায়, এ আয়াতগুলো উল্লেখ করে একলক্ষ সাহেব জিহাদকে অস্বীকার করতে চাননি, তাহলে প্রশ্ন এসেই যাবে, তারা এ আয়াতগুলো উল্লেখ করে কোন বিষয়টাকে অস্বীকার করতে চায়? কোন কাজটাকে অস্বীকার করতে চায়? উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের সঙ্গেতো সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। সন্ত্রাসের পক্ষেও নেই বিপক্ষেও নেই। এসব আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে, সুস্পষ্ট দাওয়াতের পর দাওয়াত প্রদানকারীর আর কোন দায়িত্ব নেই -এ কথা নবীকে জানিয়ে দেয়া। দাওয়াত দেয়ার পর আর কোন সন্ত্রাস করা যাবে না এ কথাতো আল্লাহ তাআলা নবী বা নবীর প্রতিনিধিকে বলার কথা নয়। বা এসব আয়াতের তাফসীরে কোন মুফাসসির এ ধরনের কথা বলেছেন বলে আমার জানা নেই।

আর মুনাফিকী কাকে বলে? মানসূখ-রহিত আয়াত দিয়ে নাসেখ-রহিতকারী আয়াতের বিপরীতে দলিল দিলে মুনাফিকী হয়? না কি নাসেখ আয়াত দিয়ে মানসূখ আয়াতের বিপরীতে দলিল দিলে মুনাফিকী হয়? খাঁটি মুমিনরা নাসেখের উপর আমল করে না মানসূখ আয়াত খুঁজে খুঁজে সুযোগ তালাশ করে?

মিথ্যাচারের সংজ্ঞা কী? মানসূখ আয়াতকে মুহকাম হিসাবে উপস্থাপন করা মিথ্যাচার? না কি নাসেখ আয়াতকে মুহকাম হিসাবে উপস্থাপন করা মিথ্যাচার? আহলে ইলম দয়া করে ইলমের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন বলে আশা করছি।

৬৯. 'জিহাদ হল... জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া'

জিহাদের এ সংজ্ঞা কোথায় আছে? জিহাদের সংজ্ঞা তো হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের শত শত ও হাজার হাজার জিহাদের ঘটনা। এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেইতো জিহাদের পরিচয় দিয়েছেন

عن عمرو بن عنبسة قال: قال رجل يا رسول الله! .... وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. (**مسند أحمد**، رقم الحديث ١٧٠٢٧). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

"আমর ইবনে আবাসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের পরিচয় কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা"। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭০২৭

واخرج الإمام النسائي عن سلمة بن نفيل الكندي قال : "كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال رجل يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح، وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم بوجهه وقال :كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله". **سنن النسائي. النسخة الهندية ٢/ ١٠٤**

"সালামাহ বিন নুফাইল কিন্দি রা. বলেন: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় এক লোক জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা অশ্বের প্রতি গুরুত্ব কম দিচ্ছে এবং অস্ত্র রেখে দিচ্ছে। তারা একথা বলছে: এখন জিহাদ আর নেই, জিহাদ তো তার বোঝা রেখে দিয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চেহারা ফিরালেন এবং বললেন: তারা মিথ্যা বলেছে, কিতাল তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আর আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর সবসময় কিতাল করতেই থাকবে..."। সুনানুন নাসাঈ ২/১০৪

পাঠক লক্ষ করুন, এখানে সাহাবী প্রশ্ন করেছেন জিহাদ শব্দ উল্লেখ করে অথচ রাসুল সা. উত্তর দিয়েছেন কিতাল শব্দ বলে। তাহলে আমরা এ

হাদিসটি থেকেও বুঝতে পারলাম রাসুল সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ বলতে কিতালই বুঝতেন, তাদের নিকট এদুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না।

হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে দেখুন-

الْجِهَادُ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَهُوَ لُغَةً الْمَشَقَّةُ، وَشَرْعًا بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ مُبَاشَرَةً، أَوْ مُعَاوَنَةً بِالْمَالِ، أَوْ بِالرَّأْيِ، أَوْ بِتَكْثِيرِ السَّوَادِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. **مرقاة المفاتيح**، بداية كتاب الجهاد

وَشَرْعًا بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ. **فتح الباري** في بداية كتاب الجهاد.

وَفِي الشَّرْعِ بذل الْجهد فِي قتال الْكفَّار لإعلاء كلمة الله تَعَالَى. **عمدة القاري، في بداية كتاب الجهاد**

و"الجهاد": بكسر الجيم، أصله لغة: المشقة، وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار. **التوشيح شرح البخاري للسيوطي** في بداية كتاب الجهاد.

كتاب الجهاد والسير: وهو مصدر جاهدت العدو إذا قاتلته ببذل كل واحد منهما أي طاقته في دفع صاحبه، وبحسب الاصطلاح قتال الكفار لتقوية الدين. **شرح البخاري للكرماني**.

কুরআন, হাদীস, সীরাত ও তারীখের আলোকে মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

وَالْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إلَى الدِّينِ الْحَقِّ، وَالْقِتَالُ مَعَ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ الْقَبُولِ بِالنَّفْسِ، وَالْمَالِ.

(البحر الرائق، العناية شرح الهداية، في أول كتاب السير).

"জিহাদ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের দিকে ডাকা এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তার বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করা"। -আলবাহরুর রায়েক, আলইনায়াহ, কিতাবুস সিয়ারের শুরু।

অনুরূপ সংজ্ঞা রয়েছে তুহফাতুল ফুকাহা, বাদাইউস সানায়ে, মাজমাউল আনহুর, আললুবাব, দুররে মুখতার ইত্যাদি কিতাবে। উদ্ধৃতিগুলো বিস্তারিত দেখুন-

فَهُوَ الدُّعَاء إِلَى الدّين الْحق والقتال مَعَ من امْتنع عَن الْقبُول بِالْمَالِ وَالنَّفس، قَالَ الله تَعَالَى {انفروا خفافا وثقالا وَجَاهدُوا بأموالكم وَأَنْفُسكُمْ} وَقَالَ {إِن الله اشْترى من الْمُؤمنِينَ}. (**تحفة الفقهاء ٣\٢٩٣ دار الكتب العلمية**).

وَأَمَّا الْجِهَادُ فِي اللُّغَةِ فَعِبَارَةٌ عَنْ بَذْلِ الْجُهْدِ بِالضَّمِّ وَهُوَ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ، أَوْ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي الْعَمَلِ مِنْ الْجَهْدِ بِالْفَتْحِ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ يُسْتَعْمَلُ فِي بَذْلِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (**بدائع الصنائع**، في أول كتاب السير).

(الْجِهَادُ) فِي اللُّغَةِ: بَذْلُ مَا فِي الْوُسْعِ مِنْ الْقَوْلِ، وَالْفِعْلِ.
وَفِي الشَّرِيعَةِ: **قَتْلُ الْكُفَّارِ** وَنَحْوُهُ مِنْ ضَرْبِهِمْ، وَنَهْبِ أَمْوَالِهِمْ وَهَدْمِ مَعَابِدِهِمْ وَكَسْرِ أَصْنَامِهِمْ وَغَيْرِهِمْ. (**مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢\٤٠٧ دار الكتب العلمية**).

وهو لغة: مصدر جاهد في سبيل الله، وشرعا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله، كما في الشمنى. (**اللباب في شرح الكتاب** في أول كتاب السير).

وَهُوَ لُغَةً: مَصْدَرُ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَشَرْعًا: الدُّعَاءُ إلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ شُمُنِّيٌّ. وَعَرَّفَهُ ابْنُ الْكَمَالِ بِأَنَّهُ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُبَاشَرَةً أَوْ مُعَاوَنَةً بِمَالٍ، أَوْ رَأْيٍ أَوْ تَكْثِيرِ سَوَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ . (**الدر المختار مع حاشية ابن عابدين**، في أوائل كتاب الجهاد).

فَالْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَعَ مَنْ امْتَنَعَ وَتَمَرَّدَ عَنْ الْقَبُولِ إمَّا بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمَالِ. **الفتاوى الهندية ٢ / ١٨٨**

وَالْجِهَادُ اصْطِلاَحًا: قِتَال مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ بَعْدَ دَعْوَتِهِ لِلإِْسْلاَمِ وَإِبَائِهِ، إِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ (٢) . **الموسوعة الفقهية الكويتية**،

মাউসুয়া ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যায় জিহাদের সংজ্ঞা দেয়ার পর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে:

(٣) فتح القدير ٥ • ٣٨٨، والفتاوى الهندية ٣ • ٢٩٩، والخرشي ٣ • ٢١٨، وجواهر الإكليل ٢ • ٣٦١، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣ • ٣٩٨، وحاشية الشرقاوي ٤ • ٤٩٢، وحاشية الباجوري ٣ • ٣٧٩

নিম্নোক্ত ইবারতগুলোতে দেখুন ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ এবং কিতালকে কিরূপ একাকার করে উল্লেখ করেছেন-

والجهاد فريضة محكمة يكفر جاحدها ، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .
أما الكتاب فقوله تعالى :قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ﴿ التوبة : ٢٩ ﴾ إلى غيرها من الآيات في الأمر بقتال الكفار . والسنة قوله عليهالصلاة والسلام :' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ' وقال عليه الصلاةوالسلام : ' الجهاد ماض : أي فرض منذ بعثني الله تعالى إلى يوم القيامة ، حتى يقاتل عصابةمن أمتي الدجال ' وعليه إجماع الأمة. (**الاختيار** في أول كتاب السير).

قال رحمه الله (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى [وقاتلوا المشركين كافة] [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر] وقال [انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم] وقوله عليه الصلاة والسلام [الجهاد فرض ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل] وقوله عليه الصلاة والسلام [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله] الحديث. وعليه إجماع الأمة وكونه فرضا على الكفاية لأنه لم يشرع لعينه إذ هو قتل وإفساد في نفسه وإنما شرع لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه ودفع الفساد عن العباد فإذا حصل من البعض سقط عن الباقين. (**تبيين الحقائق**).

(**كتاب السير**) هو جمع سيرة وهي الطريقة في الأمور وفي الشرع عبارة عن الاقتداء بما يختص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه والسير ها هنا هو الجهاد للعدو وهو

ركن من أركان الإسلام والأصل في وجوبه قوله تعالى [كتب عليكم القتال وهو كره لكم] أي فرض عليكم القتال وهو شاق عليكم وقوله تعالى [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم] وقوله تعالى [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة] أي لا يكون شرك [ويكون الدين كله لله]. (**الجوهرة النيرة** في أول كتاب السير).

আমরা জিহাদের এসব সংজ্ঞাকে বাম হাত দেখিয়ে দিয়ে অভিনব ও অদ্ভুত সংজ্ঞাগুলো কোথায় পাচ্ছি, কেন পাচ্ছি। একলক্ষ সাহেব সংজ্ঞা দিলেন এভাবে। দেড় কোটি মুরিদের পীর জিহাদের সংজ্ঞা দিলেন গণতন্ত্রের কুফরী আইনের অওতায় নির্বাচন করা হচ্ছে জিহাদ। উদ্ধৃতি দিলেন, 'আব্বাজান রহ. বলেছেন'। তাসাওউফের খানকাহ থেকে জিহাদের এমন সংজ্ঞা দেয়া হল যার আঘাত কখনো আল্লাহর দুশমনদের গায়ে লাগবে না। তাবলীগের মারকায থেকে জিহাদের এমন সংজ্ঞা দেয়া হল যে জিহাদে তরবারী তো দূরের কথা একটি ফোমের লাঠিরও কখনো প্রয়োজন হবে না।

পক্ষান্তরে কুরআন, হাদীস, সীরাত, তারীখ ও ফিকহের কিতাবাদিতে আমরা **যে জিহাদ পাই -যার কিছু এখানে দেখানো হল-** সে জিহাদে তরবারী আছে, **রক্ত ঝরানো আছে, হত্যা করা আছে,** রশি দিয়ে বাঁধা আছে, গোলাম বানানো **আছে, বাঁদী বানানো আছে। কিন্তু যে** জিহাদে এসব কিছু আছে তাকে আজ **সন্ত্রাস বলে প্রচার করা হচ্ছে, ফাতওয়া দেয়া হচ্ছে, মানববন্ধন হচ্ছে।** আবার **এসবের মাধ্যমে জিহাদকে অস্বীকার করেছে বললে, মন খারাপ হওয়ার ভানও করা হচ্ছে, মনে কষ্ট নেয়ার অভিনয়ও করা হচ্ছে। আখের জিহাদ ছাড়া এ সমস্যারও কোন সমাধান নেই। সজাগ মানুষকে জাগানোর মত বোকামো আর হয় না।**

৭০. حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة

ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম বক্তব্যটি এখানে কেন আনা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। যে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁকে বলা হয়েছে তা কাফেরদের বিরুদ্ধে কোন জিহাদ নয়। আবার তা কোন সন্ত্রাসও নয়। এটা ছিল মুসলমানদের পরস্পরে খেলাফত টিকানোর লড়াই। যার ব্যাপরে কুরআনের হুকুম হচ্ছে, মুসলামানদের দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মাঝে সন্ধি করে দেয়ার চেষ্টা কর। যদি কোন পক্ষ সীমালঙ্ঘন করে তাহলে সে তার সীমালঙ্ঘন থেকে

ফিরে আসা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে লড়াই কর। এক পক্ষের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের দায়িত্বে এ কথাও আসবে যে, তারা এ খেলাফতকে টিকিয়ে রাখবে। সে কারণে তাঁরা বিদ্রোহী দলের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এক্ষেত্রে কোন পক্ষ হক আর কোন পক্ষ বাতিল এ বিষয়ে যদি কারো অস্পষ্টতা থাকে তাহলে তিনি এ লড়াই থেকে বিরত থাকতে পারেন। কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকার সঙ্গে এ বর্ণনার কী সম্পর্ক?
ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুফর পরাস্ত হয়েছে। এখন জিহাদ ফরযে কেফায়া, তাই এক দল এ ফরযে কেফায়ার দাত্বি পালন করবে, আরেক দল অন্য ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু চলমান পৃথিবীতে যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে, কাফের শক্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, মুসলমানরা সারা পৃথিবীতে আক্রান্ত, কুফর-শিরকের ফিতনা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে সে পরিস্থিতিতে ইবনে ওমরের এ বর্ণনাটি কার পক্ষে এবং কার বিপক্ষে দলিল দেয়ার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

প্রশ্নে রয়েছে সন্ত্রাস ও জিহাদ সম্পর্কে। এখন ইবনে ওমরের এ বর্ণনা দ্বারা কি ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধকে সন্ত্রাস বলা হবে? একলক্ষ সাহেব কী বলতে চান? যদি সন্ত্রাস না বলতে চান তাহলে এ বর্ণনা কেন উল্লেখ করেছেন? আর যদি একে সন্ত্রাস বলতে চান তাহলে মওদূদী ও জামায়াতের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার এ কপট অভিনয়ে কেন মেতে আছেন? মওদূদী কি মুয়াবিয়া রাযি.ও ইবনে যুবায়ের রাযি.কে সন্ত্রাসী বলেছেন? সতরের কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকতে গিয়ে সতর খুলে যায় কি না খেয়াল রাখবেন।

৭১. عن عمران بن حصين

এ বর্ণনা দ্বারা কি এ কথা প্রমাণিত হবে যে, জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়? এ বর্ণনার প্রতিপাদ্য বিষয় তো হচ্ছে, জিহাদের ময়দানে কাফেরদেরকে হত্যা করা চলছে। এর মধ্যে এক কাফের ইসলামের কালেমা পড়ে ফেলেছে। পড়ার পরও তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যা করাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোভাবে নেননি।

প্রথম কথা হচ্ছে, যে সাহাবী ওই লোকটিকে হত্যা করেছিলেন তাকে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন?

একলক্ষ সাহেবের কথায়তো এটাই প্রমাণিত হয়। অন্যথায় জিহাদ ও সন্ত্রাসের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে এই ঘটনা উল্লেখ করার কী অর্থ?

দ্বিতীয়ত এ বর্ণনা থেকে তো এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হত্যা করার বৈধতার মাপকাঠি হচ্ছে ইসলাম গ্রহণ করা আর না করা। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে হত্যা করা হলে গুনাহ হবে, আর ইসলাম গ্রহণ করার আগে তাকে হত্যা না করা হলে গুনাহ হবে। আল্লাহর পথের মুজাহিদরা তো এ দাওয়াতই দিয়ে চলেছে, আর এ কাজই করে চলেছে। কিন্তু এ কাফেলা এবং এ কাফেলার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এত আয়োজন কেন? এত মেহনত কেন? আর এ হাদীসই বা তাদের বিরুদ্ধে দলিল কেন?

এ হাদীসে হত্যার মাপকাঠি দেয়া হল, ইসলাম গ্রহণ করা আর না করাকে। হত্যার মাপকাঠি হল, মুসলিম আর অমুসলিম। কিন্তু এ হাদীস সামনে রেখেই এক লক্ষসাহেব বলছেন, ইহুদী-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-হিন্দু সবার সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রাখতে হবে। সবাইকে ভালোবাসতে হবে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করতে হবে। পোপ ও দালাইলামার সঙ্গে কোলাকুলি করতে হবে। যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলে, কাফেরদেরকে হত্যা করার কথা বলে তাদেরকে সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতে হবে, মানববন্ধন করতে হবে।

এ হাদীসেই বলা হচ্ছে, কলব খুলে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। মুখে ঈমান আনলে সে মুমিন। মুখে কুফরী করলে সে কাফের। কে মুসলমান আর কে কাফের এর মাপকাঠি একজন মানুষের কাছে কথা ও কাজ। কিন্তু আজ কারো ঈমানের দাবির কারণে তাকে মুমিন বলা হলেও তার কুফরীর কারণে তাকে কাফের বলা যাচ্ছে না। বুক খুলে দেখার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। বুক খুলে না দেখে যদি কারো কুফরী কাজ বা কথার উপর ফাতওয়া দেয়া হয় তাহলে তাকে তাকফীরী দল, খারেজী ইত্যাদি নামে ডাকতে দেখা যায়।

এরপর জরুরী একটি কথা যা আগেই বলার দরকার ছিল তা হচ্ছে, এ প্রশ্নটি যে করেছে সে মুসলমান না কাফের? সন্ত্রাস ও জিহাদ এক না ভিন্ন এ কথা সে জানতে চাচ্ছে। যে সমাজে সন্ত্রাসী হচ্ছে কালা জাহাঙ্গীর, পিচ্চি হান্নান, মুরগি মিলন সে সমাজে এ প্রশ্নটি যে করেছে সে আসলে কী জানতে চায়? তার কি আসলেই সন্দেহ আছে যে, ইসলামে এসব সন্ত্রাসীর কর্মকাণ্ড অনুমোদিত কি না? অথবা সে কি এ কথা জানে না যে, একজন মুসলমান

সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস ও জিহাদের মাঝে পার্থক্য জানে? না কি এর মাধ্যমে দাজ্জালীর আরেক ধাপ সে জয় করল। ইসলামের জিহাদকে সন্ত্রাস নাম দিয়ে পরে এর স্বীকৃতি নেয়ার জন্য এ প্রশ্নটি করেছে। প্রশ্নকর্তা-উত্তরদাতা কেউ আসলে সন্ত্রাস নিয়ে পেরেশান নয়। সবাই পেরেশান জিহাদী কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাস হিসাবে প্রমাণ করার জন্য। নচেৎ সন্ত্রাসের পরিচয় নিয়েও কারো কাছে কোন অস্পষ্টতা নেই, জিহাদ ও সন্ত্রাস এক না ভিন্ন এ নিয়েও কারো কাছে কোন অস্পষ্টতা নেই।

৭২. 'কু-রিপুগুলো সংশোধন ... সবচাইতে বড় জিহাদ'

এ বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ১. বড় জিহাদ ও জিহাদ এক কথা নয়, দু'টি ভিন্ন ইবাদত যে দু'টির পরস্পরে কোন বৈপরীত্য নেই। ২. বড় জিহাদের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, জিহাদের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ৩. বড় জিহাদের দ্বারা কখনো জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হয় না। ৪. জিহাদের ময়দানে বড় জিহাদের যে পরিমাণ অনুশীলন হয় তা আর অন্য কোন ময়দানে হয় না। ৫. বর্ণনাটিকে কেউ বলেছেন জাল-ভিত্তিহীন, আর কেউ বলেছেন মুনকার। যা কখনো শত শত আয়াত হাদীসে প্রমাণিত ফরয জিহাদের বিকল্প হতে পারে না। ৬. বড় জিহাদের এমন কোন সীমা নেই যেখানে পৌঁছলে পরে জিহাদ শুরু হবে। ৭. বড় জিহাদ এমন কোন জিহাদ নয় যার জন্য শরীয়তের অন্যান্য বিধান ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে বড় জিহাদের কথা বলে যে উম্মতকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে তা কতক্ষণ চলবে?

যে জিহাদে জান, মাল, ইজ্জত, স্ত্রী-সন্তানের মায়া, বাস্তুভিটার মায়া আল্লাহর দুশমনের বন্দুকের নলের সামনে কুরবান করে দেয়া হয় সেখানে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ হয় না, তাহলে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ কোথায় হয়?

যে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সারা জীবনের ময়দানের জিহাদকে খাট করে অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে দেখানোর পাঁয়তারা চলছে উলূমে হাদীসের বিচারে সে হাদীসের অবস্থান কী তা তাহকীক করার কি কোন প্রয়োজন নেই? নিজের যোগ্যতা না থাকলে যোগ্য কারো শরণাপন্ন হওয়ার কি কোন প্রয়োজন নেই? জিহাদকে অস্বীকার করার মোহে যে মুতাওয়াতির হাদীস অস্বীকার

করার কবলে পড়ছে তার কি কোন খবর আছে? নিজের ঠিকানা যে জাহান্নামে নিজের হাতে তৈরি করা হচ্ছে তার কি কোন খবর আছে?

আসলে দীর্ঘকাল থেকে মুলহিদ ও যিন্দিকদের একটি বড় দল বড় জিহাদের শিরোনামে উম্মতকে জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে চলেছে। উম্মতকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, মনের জিহাদে উত্তীর্ণ না হয়ে অস্ত্রের জিহাদে নামা যাবে না। জিহাদ করতে হলে আবু বকর-ওমরের মত ঈমান লাগবে। বদর যুদ্ধের সৈনিকদের মত ঈমান লাগবে। রাসূলের মত আমীর লাগবে।

উসূলে ইলম ও উসূলে শরীয়তের বিপরীতে, কুরআন, হাদীস ও ফিকহে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানাবলীর বিপরীতে এ ধরনের আরো বহু মনগড়া কথা ও বুলি সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। মানুষ যখন ইলম থেকে দূরে সরে গেছে, আর যারা ইলমের ময়দানে রয়েছে তাদেরকেও জিহাদ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলো পড়তে না দিয়ে, উপযুক্ত ব্যবস্থা না রেখে এ বিষয়ে অজ্ঞতা ও মূর্খতার একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এরপর এখন শরীয়তের বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত কথাগুলোকে নিজস্ব মনগড়া যুক্তির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে, মানুষও তা গিলে নিচ্ছে।

অথচ মনের এ জিহাদ শরীয়তের যে কোন ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রেই কাম্য। কিন্তু অন্য কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে বড় জিহাদের উপর ঐ আমলটি মুলতবি থাকে না, বা ঐ ইবাদত ছেড়ে বড় জিহাদ করতে পরামর্শ দেয়া হয় না। আর যখন জিহাদের ফরয দায়িত্বের কথা সামনে আসে তখন এই মুলহিদ ও যিন্দিক দলের সামনে বড় জিহাদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা বড় জিহাদের কারণে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় করতে পারে না। জিহাদের কর্মকাণ্ডগুলো তাদের কাছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মত মনে হতে শুরু করে।

এখানে একটি কথা পাঠকবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে খুব ইচ্ছে করছে। আর তা হচ্ছে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা আসার পর মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী বলেছিল, মনের জিহাদই সবচাইতে বড় জিহাদ।

৭৩. 'আল্লাহর সন্তুষ্টি'

যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে নিজের সব কিছু হারালো, শেষ পর্যন্ত স্বধর্মের লোকদের কাছেও সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত হল তারা কার সন্তুষ্টি

চায়? কুফরে ঘেরা এ পৃথিবীতে তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে? কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা এসব করবে বলে মনে হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির যারা নসীহত করছে তারা তাদের এ ফাতওয়াটিকেই আল্লাহর দুশমনদের সন্তুষ্টি নিয়ে তৈরি করেছ। তাদের নিজের মুখের স্বীকারোক্তি 'ভ্যাটিকান সিটির পোপ এ ফাতওয়ার ব্যাপারে পজেটিভ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন'। আমেরিকা, লন্ডন, দালাইলামা, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ও কুফরী আইনের প্রহরীদের পরামর্শে এ ফাতওয়া তৈরি করেছে এবং তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর ও সম্মতির চেষ্টা চলছে, কাফেরদেরকে নিয়ে এ ফাতওয়া বিষয়ে সম্মেলন করার চিন্তা চলছে। (দেখুন: মাসিক পাথেয়) প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ নিয়ত (?) পাওয়া যাওয়ার কারণে সেসব দরবারে ফাতওয়াটি খুব সমাদৃত হচ্ছে।

নসীহতটা আবু হুরায়রাকে ইবলীস শয়তান যে দোয়া শিখিয়েছিল তার মতই হয়ে গেল।

৭৪. 'কখনো জিহাদ বলে গণ্য হয় না'

যারা অস্ত্র দিয়ে জিহাদ করবে তারা প্রকৃত মুজাহিদ। তাদের মাঝে কেউ কেউ নিয়তের দুর্বলতার কারণে মেকি মুজাহিদ হতে পারে। কিন্তু যারা মনের জিহাদের মাধ্যমে অস্ত্রের জিহাদকে অস্বীকার করছে, তার বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করছে তারা প্রকৃত মুজাহিদ হওয়ার পদ্ধতি কী? দ্বীনের একটি রুকনকে অস্তিত্বহীন সাব্যস্ত করে সে রুকন আদায়ে কে মুখলিস আর কে মুখলিস নয় তা নিরুপণ করার দায়িত্ব হাতে নেয়ার মানে কী? যারা এ রুকনকে অস্বীকার করে তারাই কি এ দায়িত্ব পালন করবে?

যাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট দাওয়াত দেয়ার পর আর কোন দায়িত্ব নেই তারা অস্ত্রের জিহাদের কোথায় ইখলাস আছে আর কোথায় ইখলাস নেই -এ বিষয়ে কেন আলোচনা করছে তা বোধগম্য নয়। ইখলাসের সাথে অস্ত্র পরিচালনা করলে কি এতে কঠোরতা হবে না? ইখলাসের সাথে আল্লাহর দুশমনের গলায় ছুরি চালালে তা নিষ্ঠুরতা হবে না? ইখলাসের সাথে কাফেরদেরকে হত্যা করলে কি তা মানুষ হত্যা হবে না? যাদের দৃষ্টিতে অস্ত্র চালনাই নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও হিংস্রতা তারা ইখলাসের মাধ্যমে কী করতে চায়? তাদের জন্য এ আলোচনা অবান্তর।

৭৫. 'স্বশস্ত্র যুদ্ধ বা কিতালের অনুমোদন রয়েছে'

এ ক্ষেত্রে জিহাদের অনুমোদন রয়েছে নাকি ফরয দায়িত্ব রয়েছে? না কি দু'টি একই কথা?

এ ফরয দায়িত্ব কার উপর? এ ফরয দায়িত্ব কি নাস্তিক, ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ পর্যায়ক্রমে সকল অমুসলিম ও তাদের দালালদের উপর অর্পিত? যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে নিধন করে যাবে। না কি এ দায়িত্ব মুসলমানদের উপর সকল কুফরী শক্তি ও তাদের দালালদেরকে নিধন করার জন্য? ফাতওয়ার পাঠকরা একটু সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, ফাতওয়ার বুলেট কোন দিক থেকে বের হয়ে কোন দিকে যাচ্ছে? বন্দুক কার হাতে আর বুলেট কার বুকে বিষয়টি একটু ঘোলাটে হয়ে গেছে। নিশ্চয় এতক্ষণ যাকে সন্ত্রাস বলা হয়েছে তার বুকেই বুলেট চালানোর আয়োজন চলছে। ব্যবহৃত শব্দাবলি সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

৭৬. ولو لا دفع الناس بعضهم ببعض

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাবাদিতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক যুগে যদি মুসলিমদের দ্বারা অমুসলিমদেরকে প্রতিহত না করা হত তাহলে অমুসলিমদের প্রাবল্যের কারণে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি হত।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (سورة الحج ٣٩-٤٠).

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ

অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী'' । -সূরা হজ্জ ৩৯-৪০

দেখুন তাফসীরে তাবারী-

وقوله:(وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: **معنى ذلك: ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين.**

ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله:(وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) **دفع المشركين بالمسلمين.**

وقال آخرون: معنى ذلك: **ولولا القتال والجهاد في سبيل الله.**

ذكر من قال ذلك:حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) **قال لولا القتال والجهاد.** (الطبري).

দেখুন তাফসীরে কুরতুবী-

(وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) أَيْ لَوْلَا مَا شَرَعَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قِتَالِ الْأَعْدَاءِ، لَاسْتَوْلَى أَهْلُ الشِّرْكِ وَعَطَّلُوا مَا بَيَّنَتْهُ أَرْبَابُ الدِّيَانَاتِ مِنْ مَوَاضِعِ الْعِبَادَاتِ، وَلَكِنَّهُ دَفَعَ بِأَنْ أَوْجَبَ الْقِتَالَ لِيَتَفَرَّغَ أَهْلُ الدِّينِ لِلْعِبَادَةِ. فَالْجِهَادُ أَمْرٌ مُتَقَدِّمٌ فِي الْأُمَمِ، وَبِهِ صَلَحَتِ الشَّرَائِعُ وَاجْتَمَعَتِ الْمُتَعَبَّدَاتُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أُذِنَ فِي الْقِتَالِ، فَلْيُقَاتِلِ الْمُؤْمِنُونَ. ثُمَّ قَوِيَ هَذَا الامر في القتال بقوله: "وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ" الْآيَةَ، أَيْ لَوْلَا الْقِتَالُ وَالْجِهَادُ لَتَغَلَّبَ عَلَى الْحَقِّ فِي كُلِّ أُمَّةٍ. فَمَنِ اسْتَبْشَعَ مِنَ النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ الْجِهَادَ فَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَذْهَبِهِ، إِذْ لَوْلَا الْقِتَالُ لَمَا بَقِيَ الدِّينُ الَّذِي يُذَبُّ عَنْهُ.

وَأَيْضًا هَذِهِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي اتُّخِذَتْ قَبْلَ تَحْرِيفِهِمْ وَتَبْدِيلِهِمْ، وَقَبْلَ نَسْخِ تِلْكَ الْمِلَلِ بِالْإِسْلَامِ إِنَّمَا ذُكِرَتْ لِهَذَا الْمَعْنَى، أَيْ لَوْلَا هَذَا الدَّفْعُ لَهُدِّمَ فِي زَمَنِ مُوسَى الْكَنَائِسُ، وَفِي زَمَنِ عِيسَى الصَّوَامِعُ وَالْبِيَعُ، وَفِي زَمَنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَسَاجِدُ. (القرطبي).

দেখুন তাফসীরে আবুস সাউদ-

[وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ] **بتسليط المؤمنين على الكفارين في كلِّ عصرٍ وزمانٍ. (أبو السعود).**

দেখুন তাফসীরে রূহুল মাআনী-

لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ، تحريض على القتال المأذون فيه بإفادة أنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم فكأنه لما قيل أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ إلخ قيل **فليقاتل المؤمنون فلولا القتال وتسليط الله تعالى المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان لهدمت متعبداتهم ولذهبوا شذر مذر.** (روح المعاني).

দেখুন তাফসীরে মাযহারী-

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بدل من الناس بِبَعْضٍ اى ببعضهم **بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. (المظهري).**

আয়াতের প্রেক্ষাপট দেখুন-

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. (سورة البقرة ٢٥١).

"অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে যা ইচ্ছা শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল"। -সূরা বাকারা ২৫১

তাফসীরে বায়যাবী দেখুন-

وَلَوْلا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ. ولولا أنه سبحانه وتعالى يدفع بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم، لغلبوا وأفسدوا في الأرض، أو لفسدت الأرض بشؤمهم. (تفسير البيضاوي).

তাফসীরে মাযহারী দেখুন-

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ، قرأ نافع ويعقوب: دفع الله بالألف وكسر الدال هاهنا وفي الحج وفيه مبالغة وقرأ الباقون بفتح الدال وسكون الفاء بلا ألف النَّاس بَعْضَهُمْ يعنى الكفار بدل بعض من الناس **بِبَعْضٍ يعنى بالمؤمنين لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ يعنى لغلب المشركون الأرض– فأفسدوا فيها فخربوا البلاد وقتلوا العباد وظلموهم وهدمت صوامع وبيع ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وصدوا الناس عن الإيمان بالله وعبادته كذا قال ابن عباس ومجاهد، فيه دليل على أن العلة لافتراض الجهاد دفع الفساد.** (المظهري).

কিন্তু এখন যারা অমুসলিমদেরকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে প্রমাণিত করার জন্য ফাতওয়ার আয়োজনও করা হয়েছে। যদি তাই না হয় তাহলে এ আয়াত ও হাদীস দিয়ে কাদেরকে মুজাহিদ ও মুসলিম প্রমাণিত করতে চেষ্টা চলছে তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। ইতিমধ্যে কুফরী আইনের প্রহরীদেরকে শহীদ বলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাদের জন্য দোয়া-মোনাজাতের আয়োজনও চলছে খুব ঘটা করে।

৭৭. 'অনুমোদন'

আয়াত ও হাদীসে স্বশস্ত্র যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও এ ফাতওয়ায় আদেশকে বার বার অনুমোদন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার চেষ্ট চলছে। কুরআন, হাদীস, ফিকহ দেখে এ মূর্খতা দূর করা দরকার। পর্যায়ক্রমে আয়াত, হাদীস ও ফিকহের ইবারতগুলো সংক্ষেপে এক নজর দেখুন, নিজে ধোঁকা খাওয়া এবং অন্যকে ধোঁকা দেয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন।

দেখুন আয়াত-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (سورة البقرة ٢١٦).

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হল, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না"।
-সূরা বাকারা ২১৬

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.

"আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কেন একটি সূরা নাযিল করা হয়নি? অতঃপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোন সুস্পষ্ট সূরা নাযিল করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের উলে- খ থাকে, তখন তুমি দেখবে যাদের অন্ড়রে ব্যাধি রয়েছে তারা তোমার দিকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য''। -সূরা মুহাম্মদ ২০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্ড়ায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান''। -সূরা তাওবা ৩৮-৩৯

দেখুন হাদীস-

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله». **(صحيح البخاري، رقم الحديث : ٣٦).**

"আমাকে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ...''। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫

দেখুন ফিকহের ইবারত-

كتاب السير:السير جمع سيرة وهي الطريقة في الأمور وفي الشرع تختص بسير النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه.

قال: "الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين" أما الفرضية فلقوله تعالى: [وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً] ﴿التوبة: ٣٦﴾ ولقوله عليه الصلاة والسلام "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" وأراد به فرضا باقيا وهو فرض على الكفاية لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام "فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه" لأن الوجوب على الكل ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية "إلا أن يكون النفير عاما" فحينئذ يصير من فروض الأعيان لقوله تعالى: [انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً] ﴿التوبة: من الآية ٤١﴾. (الهداية، كتاب السير).

ধোঁকা খাওয়া ও দেয়ার লাগাম টেনে ধরুন। দু'টির একটিও মুমিনের সিফাত নয়।

৭৮. 'অনেক শর্তের সাথে শর্তযুক্ত'

শর্তগুলো কি এমন যা কখনো পাওয়া যাবে না? পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে পাওয়া যাবে না? যদি কখনো কোন ভূখণ্ডে না পাওয়া যায় তাহলে একটি ফরয বিধানের অস্তিত্ব কীভাবে লাভ করবে? আর শর্তগুলো যদি এমন হয়, যেমন নামাযের জন্য অযু শর্ত। এমতাবস্থায় কোন অপদার্থ যদি বলে, আমার যেহেতু অযু নেই সেহেতু আমার উপর নামায ফরয নয়। আর ফরয নামাযের দায়িত্ব থেকে এভাবে অব্যাহতি নিয়ে নিল যে, সে কখনো অযুই করল না। বিষয়টি হাস্যকর মনে হলেও বাস্তব সম্ভবত এর ব্যতিক্রম নয়।

বড় বড় বিভিন্ন দরজায় টোকা দেয়ার পর এখন বলতে হিম্মত হয় যে, প্রজন্মের পর প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিষয়টিকে তলিয়ে দেখার সুযোগ পায়নি। শর্তের পাহাড় দেখানো হয়। উদ্ধৃতি চাওয়া হলে বাতাসের উদ্ধৃতি দিয়ে সন্তুষ্ট

করার চেষ্টা করা হয়। শর্তগুলো পুরা করাও যে উম্মতের উপরই ফরয, তা উম্মত বে-মালুম ভুলে গেছে। ছোট-বড় প্রায় সকল দরবার থেকে একটি আওয়াজ শোনা যায়, জিহাদ করতে হলে আমীর লাগবে। কথার ভাবে মনে হয় আমীর কোন নবী-রাসূলের নাম যা নির্বাচন করা উম্মতের কাজ নয়, এটা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ যদি আকাশ থেকে কোন আমীর পাঠান তাহলে পরে উম্মতের উপর জিহাদ ফরয হবে।

এভাবে একেকটি শর্তের কথা বলে বলে এত ধমকানো হয় যেন শরীয়তের আর কোন আমলে কোন শর্ত নেই। যত শর্ত সব জিহাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ এতকাল পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে, এরপরও কোন আল্লাহর বান্দা একটু কিতাবের পৃষ্ঠাটা উল্টে দেখে না যে, আসলে এ আমলটি সম্পাদন করতে গেলে এমন কী শর্ত রয়েছে যা না পাওয়ার কারণে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয আমল সম্পাদন করাই যাচ্ছে না। কুরআন, হাদীস, সীরাতের পৃষ্ঠা উল্টালেই শুধু জিহাদ আর জিহাদ, কিন্তু বাস্তব জীবনে তার অস্তিত্বের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। এ নিয়ে কারো একটু প্রশ্নও জাগে না। উপরন্তু ছিন্ন-ভিন্ন দুয়েকটি ছিটেফোটা দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দেয়ার জন্য, মানববন্ধন করার জন্য সবাই উঠেপড়ে লেগে যাই।

আসলে মুসলমানদের জীবন থেকে যখন শরীয়তের কোন একটি রুকন বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন তার অস্তিত্ব প্রমাণিত করাই এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমলী রূপরেখা না থাকলে শুধু উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বিধানকে অস্তিত্বে, আপন অবয়বে ফিরিয়ে আনা অনেক কষ্টকর বিষয়। বিলুপ্ত আমলের উপর শত্রুপক্ষ ও তাদের দালালরা বালু ঢেলে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনের ধারক-বাহক হওয়ার দাবিদাররাও সমানে সমানে সঙ্গ দিয়ে চলেছে।

৭৯. 'বাড়াবাড়ি'

যখন জিহাদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি, জিহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করার জন্যই কেউ প্রস্তুত নয়, বিভিন্ন শর্তের ভিড়ে তার অস্তিত্ব বিপন্ন, তখন বাড়াবাড়ি নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ আসে কীভাবে? এ ফাতওয়ার আয়োজকদের দাবি হচ্ছে, সুস্পষ্ট দাওয়াতের পর দাওয়াত দানকারীর আর কোন দায়িত্ব নেই, এরপর আর যা কিছু করা হয় তা বর্বরতা, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা। তারা তো মূলত জিহাদের বিধান বহাল থাকার রাস্তাই খোলা রাখেনি। জিহাদের মধ্যে বাড়াবাড়ির বিষয়টি তাদের আলোচনায় আসবে কেন? এ আলোচনা আসবে

যারা জিহাদের আমলে রত রয়েছে। তাদের কোন কাজে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, আর কোন কাজ সঠিক মত হচ্ছে তা আলোচনায় আসতে পারে।

আর কোন ব্যক্তি বা দল যদি জিহাদকে মানতে না চায় তা হলে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে হত্যা করলেও বাড়াবাড়ি মনে হবে, বন্দি করে এনে গোলাম বানালেও বাড়াবাড়ি মনে হবে, শুধু অমুসলিম হওয়ার অপরাধে কর দিতে বাধ্য করলেও বাড়াবাড়ি মনে হবে, নারীদেরকে বাঁদি হিসাবে ব্যবহার করলেও বাড়াবাড়ি মনে হবে, শিশুদেরকে গোলাম বানালেও বাড়াবাড়ি মনে হবে। কিন্তু এগুলো ছাড়া জিহাদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী?

৮০. 'সীমালঙ্ঘন'

সীমালঙ্ঘন হওয়ার জন্য আগে সীমা নির্ধারণ করতে হবে। আর সীমা নির্ধারণ করার আগে জিহাদ করা এ সময়ের একটি ফরয আমল তা স্বীকার করতে হবে। এ জিহাদের আমলী রূপরেখা দিতে হবে। কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার পর, কাজে নামার পর সীমা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এসব আলাপের জন্য আলাপ করার সময় এখন নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সাহাবারা ঘর থেকে বিদায় নিয়ে, ওয়ারিসদেরকে ওসিয়তনামা লিখে দিয়ে, পিঠে অস্ত্র বেঁধে, রাসূলের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় নসীহত গ্রহণ করতেন। রাসূর তাঁদেরকে বলতেন, জিহাদ করতে গিয়ে কি করা যাবে, আর কি করা যাবে না। সীমা বাতলে দিতেন, সীমালঙ্ঘন না করতে উপদেশ দিতেন।

আর একলক্ষ সাহেব সীমালঙ্ঘন বিষয়ক নসীহত করছেন, জিহাদের বিধানকে অস্তিত্বহীন প্রমাণিত করে, জিহাদের কর্মকাণ্ডকে বর্বরতা, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা বলে, দাওয়াত দেয়ার পর আর কোন দায়িত্ব নেই এ কথা প্রমাণিত করে, সকল ধর্মের জন্য ভলোবাসার কথা বলে। সর্বোপরি ইহুদী-খ্রিস্টানদের সুরে সুর মিলিয়ে, তাদের হাতে হাত রেখে, তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পোপ ও দালাইলামার সন্তুষ্টি অর্জন করে বিশ্বের সকল জিহাদী কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে; জিহাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না বলে নসীহত করছেন। সীমা যদি জাতিসংঘ ঠিক করে দেয়, ইহুদী-খ্রিস্টানরা ঠিক করে দেয়, সুশিল সমাজ (?) ঠিক করে দেয়, ওপেন সেক্সের কর্মকর্তারা ঠিক করে দেয়, সমকামীদের নেতারা ঠিক করে দেয়, যাদের কাছে অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা নেই তারা ঠিক করে দেয়, আবু জাহাল-ওতবা-শায়বা-উমাইয়া ইবনে খালাফ

ঠিক করে দেয়, সর্বোপরি ইবলিস শয়তানের নেতৃত্বে সকল কুফরী শক্তি মিলে সীমা ঠিক করে দেয় তাহলে কি ইসলামের জিহাদ সম্ভব?

ইবলিস বাহিনী থেকে ফাতওয়ার পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য যেভাবে দৌড়-ঝাঁপ চলছে, তাতে এ কথা একেবারেই স্পষ্ট যে, ইবলিসের দেয়া ছক অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী জিহাদের (?) প্রস্তুতি চলছে। যে জিহাদে মুসলমানরা নিধন হতে থাকবে, আর অমুসলিমরা শহীদ (?) হতে থাকবে। জিহাদের কর্মকান্ড পরিচালনাকারীরা জাহান্নামে (?) চলে যাবে, তাদের জন্য হুর নয় জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করবে (?), আর যারা কুফরী আইনের প্রহরী, যারা জিহাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তারা শহীদ (?) হয়ে যাবে!

৮১. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

এ সীমা কুরআন, হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদির আলোকে নির্ধারিত হবে? না কি জাতিসংঘ সনদের আলোকে ও কুফরী সংবিধানের আলোকে নির্ধারিত হবে? এ সীমা মানসূখ-রহিত আয়াত-হাদীস দিয়ে নির্ধারিত হবে? না কি নাসেখ-রহিতকারী মুহকাম আয়াত-হাদীস দিয়ে নির্ধারিত হবে?

এখানে আয়াতের যে অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র লড়াইয়ের আদেশ প্রদান। যার অর্থ হচ্ছে, জিহাদে নামার পর যেন কোন প্রকার সীমালজ্ঘন না হয়। কিন্তু এক লক্ষসাহেব বোঝাচ্ছেন, জিহাদে অবতীর্ণ হওয়াটাই একটা সীমালজ্ঘন। কাফের-মুশরিকদেরকে হত্যা করাটাই সীমালজ্ঘন। এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তির কাছ থেকে সীমা নির্ধারণ বিষয়ক বয়ান শোনার প্রয়োজনটা কী? এ হলো এক কথা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ আয়াতে যে সীমা দেয়া হয়েছে সে সীমা সম্পর্কে তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও মুজতাহিদগণের ঐক্যমত রয়েছে যে, এ আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে জিহাদের পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে। পুরা আয়াতটি দেখুন এবং সংক্ষেপে তাফসীরে জালালাইনের উদ্ধৃতিটুকু দেখুন-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. (سورة البقرة ١٩٠).

[وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ] أَيْ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ [الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ] الْكُفَّار [وَلَا تَعْتَدُوا] عَلَيْهِمْ بِالِابْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ [إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ] الْمُتَجَاوِزِينَ مَا حَدّ لَهُمْ وَهَذَا مَنْسُوخ بِآيَةِ بَرَاءَة أَوْ بِقَوْلِهِ [وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ] وَجَدْتُمُوهُمْ [وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ] أَيْ مِنْ مَكَّة وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَام الْفَتْح [وَالْفِتْنَة] الشِّرْك مِنْهُمْ [أَشَدّ] أَعْظَم [مِنْ الْقَتْل]. (تفسير الجلالين).

৮২. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

এ বিষয়ে তিনটি কথা। প্রথম কথা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা যে পরিমাণ আক্রান্ত, কাফেরদেরকে কি সে পরিমাণ আক্রমণ এখনো করা হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এ প্রসঙ্গ এখানে আসার প্রয়োজন হল কেন?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাফসীরবিদ ও আহকামুল কুরআন বিশারদগণ এ বিষয়ে কী বলেন? জিহাদ সম্পর্কে সর্বশেষ হুকুম কী? এবং সে সম্পর্কিত আয়াত কী? এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা কি আমাদের দায়িত্বে পড়ে? না কি পড়ে না? এ বিষয়ে কি আমরা আসলেই অজ্ঞতার শিকার? যদি অজ্ঞতা না হয়ে থাকে তাহলে তো সমস্যা আরো অনেক বড়। বিপরীত বিষয়গুলো যেভাবে তুলে আনা হচ্ছে, সে হিসাবে তো মনে হয় না অজ্ঞতার কোন সূত্র থাকতে পারে। যাই হোক, আয়াতটির হুকুম যে মানসূখ এবং জিহাদের পরবর্তী আয়াতগুলোই যে মুহকাম সে বিষয়টি আমরা তাফসীর ও আহকামুল কুরআন বিষয়ক কিতাবাদি থেকে দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

[وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين (١٢٦) واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون (١٢٧) إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (١٢٨)]

يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين: أنه قال في قوله تعالى: [فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به] إن أخذ منكم رجل شيئا، فخذوا منه مثله.

وكذا قال مجاهد، وإبراهيم، والحسن البصري، وغيرهم. واختاره ابن جرير.

وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين، فأسلم رجال ذوو منعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية، ثم نسخ ذلك بالجهاد. (تفسير ابن كثير).

তৃতীয় কথা হচ্ছে, ফিকহে হানাফীর কিতাবাদিতে আয়াতটি জিনায়াত বা দন্ডবিধি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জিহাদের কোন আলোচনায় আয়াতটি দিয়ে দলির দেয়া হয়নি। তাই কাফেরদের আক্রমণ অনুযায়ী মুসলামনরা আক্রমণ করবে এমন কোন কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। বরং এর আগে অন্যান্য আয়াতের আলোকে দেখানো হয়েছে যে, কাফের কাফের হওয়ার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে, তারা হামলা শুরু করলেও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে, তারা শুরু না করলেও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে এবং তা হবে কুফুর ও শিরক মূলোৎপাটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। তারা যে পরিমাণ মুসলমানকে মারবে মুসলমানরা তাদের সে পরিমাণ মারবে এমন বিধান এ আয়াতে বলা হয়নি।

৮৩. 'সন্ত্রাস সৃষ্টির পথ কি বেহেশতের পথ না জাহান্নামের পথ?'

এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, এ প্রশ্নটি আসলে সন্ত্রাস সম্পর্কে নয়। যে কমিটি এ প্রশ্নগুলো করেছে তারা যদি প্রকৃতিস্থ হয়ে থাকে তাহলে তারা এ বিষয়ে জানতে চাইবে কেন? 'ফাসাদ করা কি বেহেশতে যাওয়ার পথ', 'মদ পান করা কি বেহেশতে যাওয়ার পথ', 'যিনা করা কি বেহেশতে যাওয়ার পথ' - একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে এগুলো প্রশ্ন হয় কীভাবে, ইস্তেফতা হয় কীভাবে? আবার এর উপর একলক্ষ স্বাক্ষর কেন প্রয়োজন হবে?

তাই বলছিলাম, এটা আসলে সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রশ্ন নয়। যদি সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রশ্ন হত তাহলে প্রশ্ন হত, এ দেশে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন তার কর্মী-সমর্থকরা যে সারা দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন আসত, 'কালা জাহাঙ্গীর, সুইডেন আসলাম, এরশাদ শিকদার, মুরগি মিলন, পিচ্চি হান্নান, প্রকাশ, বিকাশ, গোফরান ডাকাত, বনদস্যু ও জলদস্যু এরা সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে বেড়ায় -এটা কি বেহেশতে যাওয়ার পথ?' কিন্তু এ প্রশ্ন তখন করা হয়নি, এখনো করা হচ্ছে না। কারণ এ প্রশ্ন করলে সাধারণ মুসলমানরাও বলবে, লোকটা মনে হয় গাধা। কোন দারুল ইফতায় গিয়ে এ ইস্তিফতা নিয়ে হাজির হলে দারুল ইফতার লোকেরা নিশ্চয় তার

মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালার ব্যবস্থা করবে। আর এমন কোন ইস্তিফতা নিয়ে যদি কেউ এক লক্ষ স্বাক্ষর নেয়ার জন্য দেশে দেশে ঘুরে তাহলে সবাই মিলে তাকে অনুরোধ করে নয়তো হাত-পা বেঁধে পাবনা পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু আজ এ প্রশ্ন করেও কেন প্রশ্নকর্তারা সমাদৃত? কারণ এ প্রশ্ন সন্ত্রাস সম্পর্কে নয়। এ প্রশ্নের সরল বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, সারা বিশ্বে আজ জিহাদের নামে যা চলছে তা সন্ত্রাস কি না? মুজাহিদ নামে যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে তারা সন্ত্রাসী কি না? এর জবাবে এক লক্ষ স্বাক্ষর পড়েছে, হ্যাঁ! এরা সন্ত্রাসী। এ স্বাক্ষরকারীরা সেসব লোক যাদেরকে জিহাদের ফরয হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অনায়াসে বলে দেন, জিহাদ করার মত শক্তি আমাদের নেই। যদি বলা হয়, একটি কাফেলাতো কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে, তখন জবাব আসে এরা হচ্ছে সন্ত্রাসী। অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকলে সন্ত্রাসী, আর সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ বিষয়ক ফরয কোন দায়িত্ব নেই। তার মানে জিহাদের অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনা নেই।

এসব স্বাক্ষরকারীদের আরেক ধরনের একটি মূল্যায়নও বড় চমকপ্রদ। মুজাহিদ বাহিনী যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে হেরে যায় বা শহীদ হয়ে যায় তখন মন্তব্য হল, কী লাভ হয়েছে? শক্তি নেই সামর্থ্য নেই। এমন লড়াইয়ে নামা আত্মহত্যার শামিল। এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বরং ইসলামের ক্ষতি করল। আর যদি মুজাহিদ বাহিনী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে যায় তখন মন্তব্য হল, এত বড় শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা জিতল কীভাবে?! নিশ্চয় এরা ইহুদী-খ্রিস্টানদের দালাল। আমাদেরকে জিহাদ জিহাদ খেলা দেখাচ্ছে।

মোটকথা, এ অসভ্য মানুষগুলোর দৃষ্টিতে ইসলামী জিহাদের কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। উটপাখির মত বালুতে মুখ লুকিয়ে, আর কম্বলের নীচে শুয়ে শুয়ে এরা একবিংশ শতাব্দীর ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের জিহাদের মূল্যায়ন করে। আর বৃদ্ধাঙ্গুল চুষে চুষে অপেক্ষা করছে, আকাশ থেকে আমীর আসবে, মঙ্গল গ্রহে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে, তখন সে আমীরের পতাকা তলে তারা পৃথিবীর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে? এর আগ পর্যন্ত শান্তির পৃথিবীতে বসে বসে জিহাদের চিন্তা করাটাই অপরাধ, সন্ত্রাসী চিন্তা-ভাবনা।

কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে কোন কৌশল গ্রহণ করাই অপরাধ, সন্ত্রাসী তৎপরতা। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাই অপরাধ, সন্ত্রাস। তাদের জন্য অস্ত্রে ধার দেয়া অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ডের প্রস্তুতি। তাদের জন্য একটি তীর সোজা করা অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড। তাদের জন্য ধনুক তৈরি করা অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড। কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ঘোড়া লালন করা অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একজন মুজাহিদ সংগ্রহ করা অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড। জিহাদের ফরয বিধান জানার জন্য কোন কিতাব পড়া অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড। জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য আয়াত হাদীস শোনানো অপরাধ, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড।

অপরাধ নয় শুধু কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বিরত রাখার জন্য যে কোন কৌশল গ্রহণ করা। বরং সে কাজ হচ্ছে বেহেশতে যাওয়ার পথ। আয়াত ও হাদীসকে দুমড়ে মুচড়ে অপব্যাখ্যা করেও যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত রাখা যায় তাহলে এটা হচ্ছে জীবনের সবচাইতে বড় নেক কাজ।

যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে পরবর্তী আলোচনায় উল্লিখিত আয়াতগুলো কুরআনে কাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে দেখুন, এরপর একটু দেখুন, এ ফাতওয়ায় এগুলো কাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

৮৪. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

কোন তাফসীরের প্রয়োজন হবে না। পাঠক শুধুমাত্র আয়াতের আগ-পর দেখলেই বুঝতে পারবেন এ আয়াতটিতে কে কাকে সম্বোধন করে কথাটি বলেছেন। কুরআন থেকে দেখুন-

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ

قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. (سورة القصص ٧٦-٨١).

"নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার কওমভুক্ত। অতঃপর সে তাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দান করেছিলাম যে, নিশ্চয় তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের উপর ভারী হয়ে যেত। স্মরণ কর, যখন তার কওম তাকে বলল, দম্ভ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না। সে বলল, আমি তো এই ধনভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছি আমার কাছে থাকা জ্ঞান দ্বারা। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা ছিল তার থেকে শক্তিমত্তায় প্রবলতর এবং জনসংখ্যায় অধিক। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। অতঃপর সে তার কওমের সামনে জাঁকজমকের সাথে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবন চাইত তারা বলল, আহা! কারূনকে যেমন দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তেমন থাকত! নিশ্চয় সে বিরাট সম্পদশালী। আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা শুধু সবরকারীরাই পেতে পারে। অতঃপর আমি কারূন ও তার প্রাসাদকে মাটিতে দাবিয়ে দিলাম। তখন তার জন্য এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।"

দেখুন, যে কথাটি কারূনকে বলা হয়েছে, যে আয়াতটি আল্লাহর ঘোষিত শত্রুর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে সে আয়াতটি আজ ব্যবহৃত হচ্ছে কারূনের শত্রুর ব্যাপারে। কারূনের উত্তরসূরিদেরকে ধ্বংস করার জন্য যারা নিজের জীবন কুরবান করে চলেছে আজ তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে ঐ আয়াত যে আয়াত আল্লাহ তাআলা কারূনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

তাহলে এ প্রয়োগকারীরা কারা?!

৮৫. أم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাদেরকে ঈমানদার বলেছেন, আর কাদেরকে মুফসিদূন ফিল আরদ বলেছেন? আর একলক্ষ সাহেব কাকে মুমিন বলছে, আর কাকে মুফসিদ ফিল আরদ বলছে একটু দেখুন। কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো দেখুন, আল্লাহ আআলা বলছেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

"আর আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আমি কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব? আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে"। -সূরা সোয়াদ ২৭-২৯

এখানে কাফেরদরেকে 'মুফসিদ ফিল আরদ' বলা হয়েছে। মুসলমানদের কোন গোষ্ঠীকে মুফসিদ ফিল আরদ বলা হয়নি। কিন্তু আজ এ আয়াতটিই ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব মুজাহিদদের ক্ষেত্রে যার মুফসিদূন ফিল আরদকে দমন করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনে চলেছে। একলক্ষ সাহেব আজ সে মুফসিদূন ফিল আরদের সমর্থন, স্বাক্ষর ও সহযোগিতা নিয়ে আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে মুফসিদূন ফিল আরদ হিসাবে প্রমাণিত করার জন্য নিরলস অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

একটু ভাবুন। এখানে দু'টি শিরোনাম। একটি হচ্ছে সালেহূনের আরেকটি হচ্ছে মুফসিদূনের। একটি হচ্ছে মুত্তাকূনের আরেকটি হচ্ছে ফুজ্জারের। এক লক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে কোন তালিকায় কাদের নাম আসবে। একলক্ষ সাহেবের ফাতওয়ার পক্ষে ভ্যাটিকান সিটির পোপ পজেটিভ মন্তব্য করেছেন, পজেটিভ মন্তব্যের জন্য দালাইলামাকে দাওয়াত করবেন ভাবছেন (মাসিক পাথেয়)। জাতিসংঘ মহাসচিবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দৌড়ঝাঁপ চলছে (মাসিক পাথেয়)। আমেরিকান কংগ্রেস, হাউস অফ কমেন্সের সন্তুষ্টি অর্জনের

প্রচেষ্টা চলছে (মাসিক পাথেয়)। গিনিস বুকের সমর্থনের জন্য আবেদন করা হয়ে গেছে (মাসিক পাথেয়)। এ পরিস্থিতিতে একলক্ষ সাহেব এ অমুসলিম এবং মুসলমানদের ঘোষিত শত্রুদেরকে সালেহূনের তালিকায় রাখবেন না মুফসিদূনের তালিকায় রাখবেন? মুত্তাকূনের তালিকায় রাখবেন না ফুজ্জারের তালিকায় রাখবেন?

সিদ্ধান্ত আপনাদের, সিদ্ধান্ত একলক্ষ সাহেবের।

৮৬. إن الله لا يصلح عمل المفسدين

আল্লাহ তাআলা এখানে মুফসিদ কাকে বলেছেন। একলক্ষ সাহেব এ আয়াতটি কার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে? আসুন এর ফায়সালা আমরা কুরআন থেকেই নেই। আল্লাহ তাআলা বলছেন-

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.

“অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও হারূনকে ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছে। আর তারা ছিল অপরাধী কওম। অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য এল, তারা বলল, নিশ্চয় এটি সুস্পষ্ট যাদু। মূসা বলল, তোমরা কি সত্যকে এ রকম (যাদু) বলছ, যখন তা তোমাদের কাছে এল? এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা সফল হয় না। তারা বলল, তুমি কি এসেছ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফেরাতে এবং যেন যমীনে তোমাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়? আর আমরা তো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই। এবং ফির‘আউন বলল, তোমরা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, তোমরা যা ফেলবার ফেল। অতঃপর যখন তারা (তাদের

রশি ও লাঠি) ফেলল, তখন মূসা বলল, তোমরা যা আনলে, তা যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের আমল পরিশুদ্ধ করেন না। আর আল্লাহ তাঁর বাণীসমূহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে"। -সূরা ইউনুস ৭৫-৮২

দেখুন, মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থানকারী ফেরাউন ও তার যাদুকর বাহিনীকে আল্লাহ তাআলা মুফসিদূন বলে উল্লেখ করেছেন। এখন একলক্ষ সাহেব মুফসিদূন বলছে যারা ফেরাউন বাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে।

তাহলে এ একলক্ষ সাহেব কারা?!

কোন কোন পাঠক একটু বিরক্ত হতে পারেন যে, এখানে এসব আয়াত উল্লেখ করে একলক্ষ সাহেব কারূন, ফেরাউন ও নমরুদের শত্রুদেরকে মুফসিদ বলেনি, মুফসিদ বলেছে যারা কারূন, ফেরাউন ও নমরুদের মত ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদেরকে।

যে পাঠকগণ এ বিষয়ে আমাদের উপর বিরক্ত হচ্ছেন তাদের বিরক্তি সত্ত্বেও আমরা কয়েকটি কারণে তাদের উক্ত বিশ্লেষণের সঙ্গে একমতে হতে পারছি না। কারণগুলো উপরের আলোচনায় এসে গেছে। এরপরও আলাদা করে কারণগুলো আবার তুলে ধরছি-

এক. কুরআন মাজীদের কোথাও কোন মুসলমানের জিহাদী তৎপরতাকে ফাসাদ বলা হয়নি এবং কোন মুজাহিদকে মুফসিদ বলা হয়নি। যদি তাদের সে কার্যক্রমে কোন ভুলও থাকে।

দুই. জিহাদের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এ যুগের কারূন, ফেরাউন ও নমরুদের ভাষার সঙ্গে একলক্ষ সাহেবের ভাষার কোন ব্যবধান নেই।

তিন. একলক্ষ সাহেবের এ সকল কার্যক্রমের উপর এ যুগের কারূন, ফেরাউন ও নমরুদের সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে। এটা ফেরাউনরাও মনে করে, একলক্ষ সাহেবও মনে করে।

চার. যুদ্ধের চলমান ময়দানে ফেরাউনদের বিরুদ্ধে যারা আছে তাদেরকেই মুফসিদ বলা হচ্ছে। তাদের কার্যক্রম ফেরাউনদের ফাসাদের মত হওয়ার সম্ভাব্য পদ্ধতি কী?

৮৭. 'অত্মহত্যা ও আত্মঘাত'

প্রথম কথা হচ্ছে, যারা আত্মত্যাগমূলক হামলা-ইস্তিশহাদ ও আত্মহতা-ইনতিহার -এর মাঝে পার্থক্য করতে জানে না এমন মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি। স্বাক্ষর করেছে মাত্র এক লক্ষ। এ দূর্ভিক্ষের কারণ স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যারা আত্মত্যাগমূলক হামলাকে নির্দ্বিধায় আত্মহত্যা বলতে পছন্দ করে থাকেন তারা যদি এ সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করে, সাবেক ফুকাহায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য দেখে পরে সিদ্ধান্ত দিতেন তাহলে ভুলের সম্ভাবনাটা কমে আসতো। দয়া করে বিষয় ও বক্তব্যগুলো একটু লক্ষ করুন-

ক. সাধারণ মৃত্যুও একটি মৃত্যু, আর শাহাদাতের মৃত্যুও একটি মৃত্যু। কিন্তু সাধারণ মৃত্যুর কামনা হারাম, আর শাহাদাতের মৃত্যুর কামনা একটি নেক আমল। পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে নিয়তের মধ্যে। আত্মত্যাগমূলক ইস্তিশহাদী হামলা হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণের জন্য, আর আত্মহত্যা হচ্ছে, জীবনের উপর অতিষ্ট হয়ে জীবন থেকে পালানোর জন্য। উদ্দেশ্যের এ আকাশ-পাতাল ব্যবধানের কোন প্রভাব কি মাসআলার উপর পড়বে না। একটু ভেবে দেখুন।

খ. আত্মহত্যা কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে পারে না। আর আত্মত্যাগমূলক হামলার উদ্দেশ্য কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

গ. অত্মহত্যাকারীরা অস্ত্র দিয়ে নিজেকে আঘাত করে এবং শুধু নিজেকেই হত্যা করার জন্য হামলা করে। আর আত্মত্যাগমূলক হামলাকারীরা শত্রুর উপর হামলা করে, তবে হামলা এমন হয় যা থেকে নিজেকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব।

ঘ. অত্মত্যাগমূলক হামলার ক্ষেত্রে এমনও হতে দেখা যায় যে, দু'চার সেকেন্ড সময় পাওয়া গেলে হামলাকারী বেঁচেও আসতে পারে এবং বাঁচার চেষ্টাও তারা করে থাকে। তারা বেঁচে থাকতে চায় দ্বীনের জন্য, আবার মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে চায় দ্বীনেরই জন্য।

ঙ. রেলগাড়ি আসছে। এক ব্যক্তি ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে রেলগাড়ির চাকার নীচে ফেলে দিল। সে মারা গেল। রাসূলের গায়ের দিকে তীর আসছে। কোন সাহাবী ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে তীরের সামনে ফেলে দিল। তাঁর গায়ে তীর লেগে

তিনি মারা গেলেন। দু'টি মৃত্যুর আকৃতিতে কোন ব্যবধান নেই, হুকুমে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এটা কেন?

চ. একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। তাকে তীর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হল। দুনিয়া-আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে শাস্তি ভয়াবহ। একজন মুসলমানকে কাফেররা ঢাল বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে হলে এ মুসলমানের গায়ে তীর নিক্ষেপ করতে হবে। কোন বিকল্প নেই। তার গায়ে তীর নিক্ষেপ করা হল। সে মুসলমান মারা গেল। একই কাজ। হুকুম ভিন্ন। কেন? একটু এ বিষয়ক অধ্যায়গুলো দেখুন।

ছ. নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া শুধু বৈধই নয়; বরং উত্তম -এমন কথা হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের কিতাবাদিতে স্পষ্টভাবেই রয়েছে।

দেখুন ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহর আসসিয়ারুল কাবীর ও ইমাম সারাখসী রাহ. কৃত তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ-

﴿بَابُ مَا يَسَعُ الرَّجُلُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا أَهْوَى إِلَى الْهَلَاكِ﴾

٢٩٦٣- وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا حَمَلَ عَلَى أَلْفِ رَجُلٍ وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ يَطْمَعُ أَنْ يَظْفَرَ بِهِمْ أَوْ يَنْكَأَ فِيهِمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِفِعْلِهِ النَّيْلَ مِنْ الْعَدُوِّ.

٢٩٦٤- وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، وَبَشَّرَ بَعْضَهُمْ بِالشَّهَادَةِ حِينَ اسْتَأْذَنَهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطْمَعْ فِي نِكَايَةٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ هَذَا الصَّنِيعُ. لِأَنَّهُ يُتْلِفُ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا نِكَايَةٍ فِيهِ لِلْمُشْرِكِينَ.

٢٩٦٥- وَفِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ يَسَعُهُ الْإِقْدَامُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الْقَوْمَ يَقْتُلُونَهُ وَأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّقُ جَمْعُهُمْ بِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ هُنَاكَ مُسْلِمُونَ مُعْتَقِدُونَ لِمَا

يَأْمُرُهُمْ بِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنَّ فِعْلَهُ يَنْكِي فِي قُلُوبِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا لَا يُظْهِرُونَ ذَلِكَ، وَهَا هُنَا الْقَوْمُ كُفَّارٌ لَا يَعْتَقِدُونَ حَقِيقَةَ الْإِسْلَامِ وَفِعْلُهُ لَا يَنْكِي فِي بَاطِنِهِمْ، فَيُشْتَرَطُ النِّكَايَةُ ظَاهِرًا لِإِبَاحَةِ الْإِقْدَامِ.

٢٩٦٦- وَإِنْ كَانَ لَا يَطْمَعُ فِي نِكَايَةٍ وَلَكِنَّهُ يُجَرِّئُ بِذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُظْهِرَ بِفِعْلِهِ النِّكَايَةَ فِي الْعَدُوِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى طَمَعٍ مِنْ النِّكَايَةِ بِفِعْلِهِ جَازَ لَهُ الْإِقْدَامُ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَطْمَعُ فِي النِّكَايَةِ فِيهِمْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي إِرْهَابِ الْعَدُوِّ وَإِدْخَالِ الْوَهَنِ عَلَيْهِمْ بِفِعْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ وُجُوهِ النِّكَايَةِ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَبْذُلُ نَفْسَهُ لِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ. (شرح السير الكبير).

আরো দেখুন ইমাম জাসসাস রাহিমাহুল্লাহর আহকামুল কুরআন-

وقوله تعالى (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). قال أبو بكر: قد قيل فيه وجوه. أحدها ما حدثنا محمد بن بكر ...... عن أسلم أبي عمران قال غزونا بالقسطنطينية، وعلى الجماعة عبدالرحمن بن الوليد، والروم ملصوق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار؛ لما نصر الله نبيه، وأظهر دينه الإسلام، قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد.قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.

فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية في ذلك نزلت. وروي مثله عن ابن عباس، وحذيفة، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والضحاك....

فأما حمله على الرجل الواحد يحمل على حلبة العدو؛ فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية؛ فإني أكره له ذلك، لأنه عرض نفسه

للتلف من غير منفعة للمسلمين، وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين.

فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، ولكنه يجرىء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل؛ فيقتلون وينكون في العدو- فلا بأس بذلك إن شاء الله. لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم، فكذلك إذا طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك، وأرجو أن يكون فيه مأجورا. وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه.وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، ولكنه مما يرهب العدو؛ فلا بأس بذلك. لأن هذا أفضل النكاية، وفيه منفعة للمسلمين.

والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره. وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيده إلى التهلكة بحمله على العدو، إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على المسلمين. فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) وقال: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) وقال: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله.

وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أنه متى رجا نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء. قال الله تعالى: (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور). وقد روي عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله". وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".

وحدثنا محمد بن بكر ... عن عبدالعزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر ما في الرجل شح هالع، وجبن خالع". وذم الجبن

يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدين. وإن أيقن فيه بالتلف. والله تعالى أعلم بالصواب. (أحكام القرآن للجصاص).

... عن صهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك، إنى قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان فى طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه، وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسنى أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل حبسنى الساحر.

فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أى بني! أنت اليوم أفضل مني. قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلي، فإن ابتليت فلا تدل علي .

وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمى، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى. فقال إنى لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك، أى بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمئشار، فوضع المئشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المئشار فى مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل.

فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال اذهبوا به فاحملوه فى قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك، إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس فى صعيد واحد وتصلبنى على جذع، ثم خذ سهما من كنانتى، ثم ضع السهم فى كبد القوس، ثم قل باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس فى صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم فى كبد القوس، ثم قال باسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم فى صدغه، فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود فى أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها. أو قيل له اقتحم. ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه! اصبري، فإنك على الحق». (صحيح مسلم، بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ وَالسَّاحِرِ وَالرَّاهِبِ وَالْغُلَامِ)

٢٧٩٧- حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل». **(صحيح البخاري، بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ).**

এ বিষয়ে জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ বিন্নুরী টাউন পাকিস্তানের ফাতওয়া দেখুন

"অত্মাৎসর্গ হামলার বিষয়ে সাপ্তাহিক 'যরবে মুমিন' ৫ ও ১১ ই রবিউল আওয়াল ১৪৩১ হিজরী, ৯ ও ১৫- ই জুন ২০০০ সালে একটি ফাতওয়া প্রচার করে। নওজোয়ান মুজাহিদ আফাক আহমাদ শহীদ রহ কর্তৃক এক ভয়ংকর আত্মোৎসর্গ বোমা হামলায় শ্রীনগরের ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে ছোটখাট এক কিয়ামত ঘটে যায়। এরপর থেকেই নানা মহল থেকে প্রশ্ন আসে, এধরনের হামলার শরয়ী বিধান কী? আফগান ও কাশ্মীর জিহাদের ২০ বছরের ইতিহাসে এধরণের হামলা ছিলো প্রথম। ইতঃপূর্বে আর কখনো আত্মোৎসর্গ হামলা হয়নি । তাই এধরণের হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আসাটা ছিল স্বাভাবিক। উক্ত বিষয়ে 'যরবে মুমিন' তার প্রিয় পাঠকদের সঠিক অবগতির জন্য পাকিস্তানের নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতায় এ মর্মে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে- নিজের গাড়ীতে বোমা ও বিস্ফোরক ভর্তি করে অথবা নিজের শরীরের সাথে বোমা বেঁধে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিংবা অন্য কোন যালিম-কাফেরদের উপর হামলা করে নিজের জীবন শেষ করে দেয়া বৈধ হবে কি না?

কেউ কেউ এরকম হামলাকে আত্মহত্যা নামে অভিহিত করায় অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এধরণের হামলা যদি জায়েয হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে জিহাদ বলা যাবে কি না?

উচ্চতর গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদের স্বনামধন্য মুফতি সাহেবগণ সম্মিলীতভাবে ঐতিহাসিক ফাতওয়াটি লিখিত আকারে প্রকাশ করেন। ফাতওয়ার জবাব ছিল এই, এধরণের হামলা শুধু জায়েযই নয় বরং এটা হচ্ছে জিহাদ ও শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা। ফাতওয়ায় এধরণের হামলার ভূয়সী প্রশংসা করে হামলাকারী মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠ শহীদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত ফাতওয়া থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে আসে, আল্লাহর পথে জীবনবাজী রাখা এবং জীবন কুরবান করার চেয়ে উত্তম কোন সুরত ও নমুনা হতে পারে না। যারা এটাকে আত্মহত্যা মনে করেন তারা জ্ঞানহীনতা ও

স্বল্পজ্ঞানেরই পরিচয় দেন। শুধু তাই নয় বরং আত্মহত্যার ব্যাখা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। কারণ আত্মহত্যাকারী দুনিয়ার বালা-মুসীবত ও জ্বালা-যন্ত্রণায় বিরক্ত হয়ে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়, তারপর আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী নিজের জীবন ধ্বংস করে। কিন্তু আত্মোৎসর্গ হামলার বিষয়টি এর সর্ম্পূণ বিপরীত। আত্মোৎসর্গ হামলাকারীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বিধান জিহাদের আমলের মাধ্যমে কুফুরী শক্তিকে নাস্তানাবুদ করা, কাফেরদের মাঝে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা, মুসলমানদের বীরত্ব প্রকাশ করা এবং অবিস্মরণীয় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া।

দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দলিলের আলোকে এ পরামর্শ দেয়া হয়েছে, বর্তমান যুগে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার জন্য যখন প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও তাদের দোসর কাফেররা জোট গঠন করেছে, বিশ্ব মানচিত্র থেকে ইসলামের নাম ও নিশানা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে, আর এক্ষেত্রে কাফের প্রধানরা নিজেদেরকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে নিরাপদ মনে করে ক্রমশ মুসলমানদের উপর যুলুম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে মুজাহিদদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমান যুদ্ধ সরঞ্জাম না থাকায় কাফেরদের বর্বরতা ও পাশবিকতা বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য এধরণের হামলার কোন বিকল্প নেই। তাই এধরণের হামলাকে আধুনিক প্রযুক্তি অনুযায়ী আরো উন্নত করা উচিত, যাতে বর্তমানযুগে প্রযুক্তির ধ্বজাধারী কাফেররা এ হামলা মুকাবিলা করার সাহস না পায়।

ফাতওয়া অনুযায়ী এ রকম অকুতোভয় হামলার পেছনে ঈমানী শক্তি, দ্বীন রক্ষার প্রেরণা, ইসলামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার আত্মাভিমান, জিহাদের জযবা আর শাহাদাতের অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়। যালেম কাফেরদের আতংকিত করে তোলার নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত এবং বীর-বাহাদুরী প্রকাশের চূড়ান্ত সীমা এই হামলার বিকল্প আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআন হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, খাইরুল কুরুন-সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদগণের অবস্থা, এবং ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব থেকে দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে আফাক শহীদ রহ. এর আত্মোৎসর্গমূলক হামলাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইসলামের হেফাজত এবং বীরত্ব ও বাহাদুরীর সবশ্রেষ্ঠ মর্যাদা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এই ফাতওয়াটি জামেয়া বিন্নুরী টাউনের ফাতওয়া বিভাগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী [যিনি বর্তমানে বাংলেদেশে হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতী] জামিয়ার শাইখুল হাদীস ও ফাতওয়া বিভাগের পরিচালক মুফতী নিযাম উদ্দীন শামযায়ী এবং মুফতী আব্দুল মজিদ দ্বীনপুরী প্রমূখ উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর ও সীলসহ প্রকাশ করা হয়।" দেখুন, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ই'তিরাযাত আওর ইলমী জায়েযা, মাওলানা ইলয়াস ঘুম্মান, পুণ্যের সন্ধানে, পৃষ্ঠা: ২০৫-২০৭

এ বিষয়ে মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর ফাতওয়া দেখুন

আত্মোৎসর্গের শর'য়ী বিধান:

মাওলানা আব্দুর রহিম নওগাঁ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার নিমিত্তে কখনো কখনো জিহাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে সবই হতে হবে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মনীতির আলোকে। বলা বাহুল্য যে, জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। যুগের গতির সাথে জিহাদের কৌশল পরিবর্তন হতে থাকে। তার মাঝে বহুল প্রচলিত একটি কৌশলের নাম 'আত্মোৎসর্গ হামলা'। এ কৌশলের হুবহু নজীর পূর্ববর্তী কিতাবে বিস্তারিত না থাকায় শর'য়ী ব্যাখ্যার দিক থেকে কিছুটা জটিলতার রূপ নিয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে শরী'আতের আলোকে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

ইসলাম যেভাবে একজন মানুষেকে সম্মান করে। তেমনি একজন মানুষের জীবনকেও পূর্ণ মর্যাদা দেয়। বরং শরী'আতের মৌলিক উদ্দেশ্যের মাঝে মানুষের জান সংরক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। তাইতো কোন ব্যক্তি নিজের জানকে বাঁচানোর নিমিত্তে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। এবং যুদ্ধ করে করে নিহত হলে তাকে শাহাদাতের মর্যাদাও দিয়েছে। সর্বোপরি ইসলাম চায়না একজনের জান বিনষ্ট হয়ে যাক। তাইতো ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে, যেন কোন ব্যক্তি নিজের জান নিজেই ধ্বংস না করে। আত্মহত্যা ও আত্মহত্যাকারীর ব্যাপারে অনেক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- من قتل نفسه بشيئ عذب به يوم القيامة.

"যদি কেউ কোন জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ জিনিস দ্বারাই তাকে আযাব দেয়া হবে।" সহীহ মুসলিম:১/৭২

শরী'আতে আত্মহত্যার কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে জিহাদে নিজের জান ব্যবহার করার উৎসাহ ও হুকুম দেয়া হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পরিবর্তে মুমিনের জান মাল ক্রয় করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"আল্লাহ তা'আলা ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাঁদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে; অতঃপর মারে ও মরে।" (সূরা তাওবা: ১১১)

অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, মুমিনদের জান মাল দ্বীনের স্বার্থে ব্যবহার হবে। জান-মাল ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে যার চূড়ান্ত পর্যায় হলো জিহাদে অংশগ্রহণ করা। জিহাদে অংশগ্রহণ করে জান মাল ব্যবহারের দু'টি রূপ হতে পারে।

১. এমনভাবে জিহাদে অংশ নেয়া যে, সে কাফেরের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে নিরাপদে ফিরে আসার সম্ভাবনা হলেও থাকে। যেমন নববী যুগে থেকে এখন পর্যন্ত সাধারণত যে পদ্ধতি চালু আছে তাতে এক পর্যায়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসতে পারত কেউবা আল্লাহর কাছে চলে যেত।
এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। বরং অবস্থাভেদে কখনো ওয়াজিব বা ফরয হয়ে থাকে।

২. কাফেরের ক্ষতি ও ধ্বংস করার জন্য এমনভাবে নিজেকে পেশ করা যে, পুনরায় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নাই। যেমন, বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি রূপ 'আত্মোৎতসর্গ' হামলা।

এ পদ্ধতিতে দু'টি দিক রয়েছে। এক. যেহেতু নিরাপদে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। যেমনটি প্রথম পদ্ধতির মাঝে ছিল সেহেত এটা বাহ্যত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার আওতায় পড়ে। যা সর্বাবস্থায় নিষেধ। দুই. ইসলাম জিহাদে নিজেকে পেশ করার ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআন ও

হাদীসে সুস্পষ্ট কোন সীমা রেখা বলে দেয়া হয়নি। বরং আয়াত ও হাদীসের ব্যাপকতা এবং কিছু সাহাবীর আমল থেকে অনুমতির দিকটা বুঝে আসে। তাই এ পদ্ধতিও কুরআন হাদীসের ব্যাপকতার মাঝে পড়ে। যার সার সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কুরআনের আলোকে 'আত্মোৎসর্গ'

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

"মানুষদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তার বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান"। (সূরা বাকারা: ২০৭)

অর্থাৎ যারা জিহাদের ময়দানে জীবন বিলিয়ে নিজেকে বিক্রয় করে থাকে। (রুহুল মা'আনী: ২/৯৬, মাকতাবায়ে এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান)

আল্লামা কুরতুবী রাহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। আল্লাহর রাস্তার প্রত্যেক মুজাহিদ, শহীদ হওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী এবং খারাপ কাজে বাধাদানকারী সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে কুরতুবী: ৩/১৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন)

ইবনে কাসীর রহ. এ মতটিকে অধিকাংশ মুফাসসিরদের মত বলেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৩৬৯ দারু ইবনুল জাওযী, কায়রো)

ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের ব্যাখা করতে গিয়ে নকল করেন, একবার হিশাম ইবনে আমের রাযি. শত্রু বাহিনীর দুই কাতারের মাঝে হামলা করলে কিছু লোক তার বিরোধিতা করে। তখন হযরত ওমর রাযি. হযরত আবু হুরাইরা রাযি. সহ অন্যান্যরাও আপত্তিকারী ব্যক্তিদের মত প্রত্যাখান করে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

"মানুষদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তার বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান"। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৩৬৯ দারু ইবনুল জাওযী, কায়রো)

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন- فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ.

"সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের সম্পর্কে দায়ী করা হবে।" (সূরা নিসা: ৮৪)

তাবে'য়ী আবু ইসহাক রাহ. বলেন, একবার আমি হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কোন ব্যক্তি একাই মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে, তবে সে কী ঐ ব্যক্তির অন্তভুর্ক্ত হবে, যে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়? উত্তরে তিনি বলেন, না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন– فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ.

"সুতরাং তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২৩৮ দারু ইবনুল জাওযী, কায়রো)

হাদীসের আলোকে 'আত্মোৎসর্গ'

উহুদের দিন অনেক সাহাবায়ে কেরাম একা শত্রুর মাঝে ঢুকে আক্রমণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। যেখানে নিশ্চিত মৃত্যর আশঙ্কা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসাও করেছেন। যেমন আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقى فى الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة.

"উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাতজন আনসারী ও দুইজন কুরাইশী সাহাবী ছিলেন। এক সময় মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসল, তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে তাদেও প্রতিহত করবে? তার জন্য জান্নাত রয়েছে, অথবা সে জান্নাতে আমার সাথী হবে। তখন এক আনসারী সাহাবী সামনে এগিয়ে লড়াই করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন অতঃপর আবার তারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসলো একে একে সাতজনই শহীদ হয়ে গেলেন। (সহীহ মুসলিম: ২/১০৭)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل.

"উহুদের দিন এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন- আমি যদি নিহত হই, তবে আমি কোথায় যাব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতে। তখন তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো নিক্ষেপ করে প্রচন্ড বেগে হামলা করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন"। (সহীহ বুখারী: ২/৫৭৯)

وبلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس، على أسنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة. فاقتحم إليهم، وشد عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة.

"হযরত বারা বিন মালেক রাযি. মুসায়লামা কায্যাবের সাথে যুদ্ধের দিন সাথীদেরকে বর্শায় আগায় ঢাল রেখে তাঁকে তার উপর বসিয়ে বাগানের মধ্যে ছুড়ে দিতে বললেন। অতপর তিনি তাদের মাঝে প্রচন্ড বেগে আক্রমণ করলেন এবং তাদের হত্যা করে বাগানের দরজা খুলে দিলেন"। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১২৪, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন)

'আত্মোৎসর্গ' ও ফুকাহায়ে কেরাম

আত্মোৎসর্গ হামলার একটি রূপ হলো বিপুল সংখ্যক কাফেরের মাঝে ঢুকে পড়া। আর এভাবে হামলা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, যে কোনভাবে মুসলমানদের উপকার ও কাফেরের ক্ষতি হলে এরকম হামলা করা যাবে। যেমন ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ. ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মত এভাবে উল্লেখ করেন-

فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك، لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين،

وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرِّئ المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون

وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم... وأرجو أن يكون فيه مأجورا. وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه، وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو، فلا بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين.

"ইমাম আবু হানিফা রাহ. এর শাগরিদ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী রাহ. সিয়ারে কাবীরে উল্লেখ করেন, একজন লোক যদি এক হাজার লোকের উপর হামলা করে এতে কোন অসুবিধা নেই। যদি তার নিজের মুক্তির আশা রাখে কিংবা শত্রুদের আহত করার আশাবাদী হয়। আর যদি সে নিজের মুক্তি বা শত্রুদের ক্ষতির আশাবাদী না হয়. তাহলে আমি তার জন্য এ কাজটিকে অপছন্দ করি। কেননা এতে মুসলমানদের কোন ফায়দা ছাড়া নিজেকে ধ্বংসের জন্য পেশ করা হয়।

একজন ব্যক্তির জন্য এ ধনণের হামলা তখনই সমীচীন হবে যখন সে তার হামলা দ্বারা নিজে নিরাপদে ফিরে আসা বা মুসলমানদের উপকার হওয়ার আশা রাখবে। যদি এমন আশা না থাকে, কিন্তু শত্রুদের ক্ষতি পৌঁছানোর জন্য তার মত হামলা করার প্রতি অন্যদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে হলে শ'রয়ী কোন সমস্যা নেই। কেননা যদি শত্রুদের ক্ষতি করার আশা থাকে, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার আশা না থাকে, তাহলেও আমি তাদের উপর হামলা করতে কোন অসুবিধা মনে করি না। এবং আমি আশা করি এই হামলার কারণে সে প্রতিদান পাবে। আর যখন হামলার দ্বারা কোন ফায়দাই না হয়, তখন আক্রমণ করা মাকরূহ। আর যদি নিজের মুক্তির বা তাদের ক্ষতির কোন আশা না থাকে কিন্তু এর দ্বারা শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করা যায় তাহলে এ হামলাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটাই তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি এবং এতে মুসলমানদের উপকারও নিহিত আছে।" (আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ১/৩২৭, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন)

ইমাম জাস্সাস রাহ. ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মত সমর্থন করে বলেন-

والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيده إلى التهلكة بحمله على العدو إذ لم يكن عندهم

في ذلك منفعة وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على المسلمين فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به ... ﴿عند ربهم يرزقون﴾ وقال: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله. اه

"ইমাম মুহাম্মদ রাহ. যে সকল সূরত বর্ণনা করেছেন এগুলো সহীহ। এগুলো ব্যতীত ভিন্ন সূরত জায়েয নেই। আর উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে ঐ ব্যক্তির কথাকে, যে আবু আইয়ূব রাযি. এর বরাতে বর্ণিত হাদীসে ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে শক্রদের উপর হামলা করে। যখন তাদের নিকট এতে কোন ফায়দা না হয়। যখন বিষয়টি এমনই তখন দ্বীন ও মুসলমানদের কোন ফায়দা ছাড়া নিজের জীবনকে ধ্বংশ করা উচিৎ নয়। আর যখন নিজেকে ধ্বংশ করার মধ্যে দ্বীনের ফায়দা থাকে, তখন এটা হবে এমন এক মর্যাদাপূর্ণ কাজ, যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন) তারা (যারা দ্বীনের ফায়দার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে) তাদের প্রতিপালকের নিকট রিযিক প্রাপ্ত হবে।" (সূরা আল ইমরান: ১৬৯)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'কিছু মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে।' (সূরা বাকারা: ২০৭)

এ ধরণের আরো অনেক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে।" (আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ১/৩২৭-৩২৮, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন)

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. ইলাউস সুনানে এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় কায়েম করে বলেন-

واما مسئلة حمل الواحد على العدو الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم.

"বিশাল বাহিনীর উপর একাই আক্রমণ করার মাসআলা সম্পর্কে জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম রাহ. এর মত হলো, যদি তার বিরত্বের কারণে তার মাঝে প্রবল ধারণা হয়যে, সে দুশমনের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করতে পারবে, এধরণের সৎ উদ্দেশ্যে হলে, তা জায়েয আছে। আর যদি শুধু ধ্বংশমূলক হামলা হয় তাহলে জায়েয হবে না। বিশেষ করে যদি তার কারণে মুসলমানদের মাঝে দূর্বলতা চলে আসে।" (ই'লাউস সুনান: ১২/২৮-২৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন)

আল্লামা শামী রাহ. শরহুস সিয়ারের উদ্ধৃতিতে বলেন-

ذكر في شرح السير أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم ؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين.

"নিহত হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা সত্ত্বেও একা এক ব্যক্তি শত্রুর উপর হামলা করতে পারবে, যদি সে দুশমনকে হত্যা, আহত অথবা পরাস্ত করার মাধ্যমে কোন ক্ষতি করতে পারে। কেননা অনেক সাহাবী রাযি. উহুদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এ ধনণের হামলা করেছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করেছেন। আর যদি এ ধারণা হয় যে, সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে তার জন্য তাদের উপর হামলা করা জায়েয হবে না। কেননা তার এই হামলার দ্বারা দ্বীনের কোন ফায়দা হয় না।" (ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/২০৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ)

আত্মোৎসর্গের শর্তসমূহ

উপরোল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আত্মোৎসর্গ হামলা জায়েয। তবে কিছু শর্তের সাথে।

১. নিয়ত সহীহ হওয়া। তথা ই'লায়ে কালিমাতল্লাহ, দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি লক্ষ্য হতে হবে। যদি দুনিয়াবী কোন ফায়দা হাসিলের জন্য হয়, তাহলে জায়েয হবে না।

২. আক্রমণকারীর প্রবল ধারণা থাকা যে, তার এই হামলার দ্বারা শত্রুর ক্ষতি সাধিত হবে।

৩. যে কোনভাবে তার হামলা দ্বারা মুসলমানদের উপকার হতে হবে।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

কেউ কেউ একটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আত্মোৎসর্গ হামলাকে আত্মঘাতী বলে থাকেন। আথচ উভয়টার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে সংশয় ও তার নিরসন নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।" (সূরা বাকারা: ১৯৫)

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা অনেকে আত্মোৎসর্গ হামলা নাজায়েয হওয়ার দলীল পেশ করে বলেন, আত্মোৎসর্গ হামলা আত্মহত্যার অন্তর্ভূক্ত। অথচ অনেক সাহাবী এ ধরনের ব্যাখ্যার আপত্তি করে অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন আবু ইমরান আসলাম রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبدالرحمن بن الوليد، والروم ملصوق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار؛ لما نصر الله نبيه، وأظهر دينه الإسلام، قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد.

"আমরা মদিনা থেকে কুসতুনতিনিয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করলাম। আর রোমানরা শহরের প্রাচীর ঘেষে অবস্থান নিয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ছিলেন দলের সেনাপতি। এক ব্যক্তি শত্রুদের উপর হামলা করলো, তখন লোকেরা বলতে লাগল, থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তিতো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তখন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. বললেন, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা আনসারী সাহাবার ব্যপারে, যখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে সাহায্য করলেন তখন আমরা বললাম,এখন আমরা আমাদের সম্পদের মধ্যে এবং সেগুলো দেখাশোন করবো, তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন

তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দিয়ো না। সুতরাং ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হলো, নিজেদের সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা, তা দেখাশোনা করা এবং জিহাদ ছেড়ে দেয়া।" (সূনানে আবু দাউদ: ১/৩৪০, হাদীস নং ২৫১৪, হাদীসদি সহীহ)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম জাস্‌সাস রাহ. বলেন-

فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية في ذلك نزلت. وروي مثله عن ابن عباس، وحذيفة، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والضحاك. وروي عن البراء بن عازب وعبيدة السلماني الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو اليأس من المغفرة بارتكاب المعاصي.

"হযরত আবু আইয়ুব রাযি. সংবাদ দিলেন যে, নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যেগ করা। আর আয়াতটি এ ব্যপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস, হোযাইফা রাযি. হাসান, কাতাদা, মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক রাহ., থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত বারা বিন আযিব ও আবিদা সালমানী বলেছেন যে, নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার অর্থ হলো, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া।" (আহকামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস: ১/৩২৭, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন)

সুতরাং এ আয়াত দিয়ে আত্মোৎসর্গ হামলা অবৈধ হওয়ার দলীল পেশ করার সুযোগ নেই। স্বয়ং সাহাবারাও আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ প্রযোজ্য মনে করেন নি। তাই কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের উপর এমনভাবে আক্রমণ করে যে, তার মধ্যে শতভাগ মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে, তবুও সে আত্মহত্যাকারী বলে গণ্য হবে না। বরং সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। যেমন পূর্বে প্রমাণাদিসহ আলোচিত হয়েছে।

সত্যায়নে

(দস্তখত)

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহু

প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম

(দস্তখত)

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহু

মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী

হাটহাজারী

২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হি.

(দস্তখত)

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহু

মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী

১২ জুমাদাল উলা ১৪৩৫ হি.

(সূত্র, হাটহাজারীর দারুল ইফতা থেকে ১৪৩৪-১৪৩৫ হিজরীতে প্রকাশিত গ্রন্থ 'দরসূল ফিকহ'; পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৬৪)

এসকল বক্তব্যের আলোকে এবং শত্রুর বর্তমান অবস্থা হিসাবে বিচার করলে আশা করি আত্মত্যাগমূলক ইস্তিশহাদী হামলা ও আত্মহত্যার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৮৮. عن سهل بن سعد ...فقتل نفسه .৮৮

এ ঘটনায় যা রয়েছে তা হচ্ছে, আত্মহত্যার ঘটনা। যে হামলা লোকটি শুধু নিজের উপর করেছে এবং শুধু নিজেকে হত্যা করার জন্যই করেছে। এর দ্বারা সে শত্রুর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছাই করেনি। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আত্মত্যাগমূলক হামলা, যার দ্বারা আল্লাহর দুশমনদের উপর হামলা করা হবে, তবে হামলার পদ্ধতি এমন যে হামলা করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব শত্রুর উপর এমন হামলা করা বৈধ কি না এ বিষয়ে ৮৭ নং টীকায় শরুহুস সিয়ারিল কাবীর ও আহকামুল কুরআনের উদ্ধৃতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শরহুস সিয়ারিল কাবীর ও আহকামুল কুরআন জাসসাসের বক্তব্য থেকে আমাদের সামনে এতটুকু কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রুর ভিতরে ঢুকে পড়ে তাহলে মৃত্যুর মুখে নিজেকে এভাবে ঠেলে দেয়াটা কয়েকটি স্তর পর্যন্ত সাওয়াবের আমল হিসাবে পরিগণিত হবে।

ক. যদি সে মনে করে সে মরে যাওয়া নিশ্চিত তবে এর দ্বারা মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হবে।

খ. যদি সে মনে করে সে মরে যাওয়া নিশ্চিত তবে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত না হলেও কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গ. যদি সে মনে করে তার মরে যাওয়া নিশ্চিত এবং এর দ্বারা মুসলমানদের বিজয়ও অর্জিত হবে না, তাদের কোন ক্ষতিও হবে না, তবে তারা আতঙ্কিত হবে।

ঘ. যদি সে মনে করে তার মরে যাওয়া নিশ্চিত এবং এর উল্লিখিত কোন উদ্দেশই অর্জিত হবে না, তবে সে মনে করে এর দ্বারা মুসলমানরা সাহসী হয়ে উঠবে এবং তারা অগ্রসর হতে উৎসাহবোধ করবে।

মোটকথা, তার এ কাজ দ্বারা যদি মুসলমানরা কোন না কোনভাবে উপকৃত হবে ধারণা করে সে নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তাহলে তা সাওয়াবের কাজ হবে। সুতরাং দ্বীনী কোন ফায়দা সামনে না রেখে যে আত্মহত্যা হয় তার সঙ্গে ইস্তিশহাদী হামলাকে তুলনা করার ক্ষেত্রে হাদীস, সীরাত, তারীখ ও ফিকহের কিতাবাদীর উপর একবার নজর বুলিয়ে যাওয়া চাই।

৮৯. أو قتل لنفسه

আত্মহত্যা-ইন্তিহার ও আত্মত্যাগমূলক ইস্তিশহাদী হামলার পার্থক্য বোঝার জন্য ৮৭, ৮৮ নং টীকা দু'টি দেখুন। আত্মহত্যা হারাম হওয়ার উপরতো এক লক্ষের বেশি উদ্ধৃতিই পাওয়া যাবে। এক লক্ষ স্বাক্ষর তো নস্যি।

৯০. يقتل نفسه بالخنق

যে সকল সাহাবায়ে কেরাম আত্মত্যগমূলক হামলা করে শহীদ হয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জানাযার নামায পড়েছেন। যারা শহীদ হওয়ার জন্য শত্রুর ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আল্লাহর রাসূল তাঁদের জানাযার নামায পড়েছেন।

আত্মহত্যা যে শহীদের মৃত্যু নয় -এ বিষয়ে কি কারো কোন সন্দেহ আছে? আত্মহত্যা হল কবীরা গুনাহ। কিন্তু এত স্পষ্ট বিষয়টিও এভাবে বার বার বলতে হচ্ছে কেন? যেখানে অস্পষ্টতা ও মূল সন্দেহ সে বিষয়টি দলিলের আলোকে স্পষ্ট করা চাই। তা না করে মুখ দিয়ে একবার যে কথা বের হয়ে গেছে সে কথাই বার বার আওড়াতে থাকার কি অর্থ হতে পারে!

৯১. وعن أبي هريرة ...فقتل نفسه

প্রত্যেকটি দলিলই আত্মহত্যা সম্পর্কে। এসব দলিল এবং তার বক্তব্যের সঙ্গে কারো কোন বিরোধ নেই। তাই এটা আলোচনার কোন বিষয় নয়। এ নিয়ে কথা লম্বা করারও কোন মানে হয় না। এখানে আলোচনার বিষয় হচ্ছে, আত্মহত্যা-ইন্তিহার ও আত্মত্যাগমূলক ইস্তিশহাদী হামলার মাঝে পার্থক্যকে স্পষ্ট করা। এ বিষয়ে বহু কিতাব রচিত হয়েছে। দলিলের আলোকে বিষয়টিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একজন আলেমের দায়িত্ব হবে, বিষয়টিকে ইলমীভাবে সমাধান করার চেষ্টা করা। পাশাপাশি নিম্নোক্ত তথ্যটি মনে রাখতে হবে-

আমেরিকাভিত্তিক পরিচালিত মুস্তাশরিক-প্রাচ্যবিদদের একটি ভয়ংকর সংস্থা রেন্ড ওয়াশিংটন কর্পোরেশন (যার পরিচালকের তত্ত্বধানে এক লক্ষ সাহেবের ছেলে মাকতূম কাউন্টার টেররিজমের (সন্ত্রাস প্রতিরোধ) উপর বিশেষ কোর্স করে এসেছে -মাসিক পাথেয়)। তার ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে যে সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করেছে তার গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, মুজাহিদদের

আত্মত্যাগমূলক ইস্তিশহাদী হমলাকে আত্মহত্যা হিসাবে সাব্যস্ত করে ফাতওয়া আকারে মুসলমানদের মাঝে তা প্রকাশ করা।
পারিপার্শিক যে কোন পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, একজন আলেমে দ্বীন হিসাবে, একজন দরদী মুসলমান হিসাবে, একজন দ্বীনের যিম্মাদার হিসাবে, ইলমের আমানতের খাতিরে বিষয়গুলোকে মাসাদিরে শরীয়াহ এবং আমাদের মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের ইজতিহাদ ও ইস্তিমবাতের আলোকে বিশ্লেষণ করা চাই।

এ বিষয়ে আমাদের কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয় যে, মুজাহিদগণের কাফেলা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এত ত্যাগ দিয়ে চলেছে। একজন মানুষ নিজের জীবনকে শেষ করে দিল এবং সে ঘোষণা করতে থাকল, আমি দ্বীনের জন্য জীবন ত্যাগ করছি। এরপরও আমাদের সন্দেহ কাটছে না যে, তারা দ্বীনের জন্যই করছে। তাদের নিয়তের উপর অন্যায় হামলা না করে শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোন ভুল আছে কি না তা খতিয়ে দেখা অবশ্যই ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব।

এ ক্ষেত্রে একটি সবিনয় অনুরোধ, ওলামায়ে কেরাম এ দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে, একজন আত্মত্যাগকারী মুজাহিদের সামনে ময়দানের ও শত্রু শিবিরের যে বাস্তবতা রয়েছে আমাদের সামনে হুবহু সে বাস্তবতা সেভাবে আছে কি না?
দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে, আমরা যে মনে করছি, কিছু যুবক ফেসবুক ও সামাজিক গণমাধ্যমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে, আবেগ তাড়িত হয়ে এমন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে -বিষয়টি কি আসলেই এমন? গবেষণা ও বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য বলছি, আমার জানামতে মুজাহিদ কাফেলারগুলোর নিজস্ব তত্ত্বধানে লক্ষাধিক কিতাব-পত্রে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের সার্বক্ষণিক ইলমী তত্ত্বধান রয়েছে। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে তার শরয়ী অবস্থান নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য নির্ধারিত ফিকহী মজলিস রয়েছে। এ তথ্যগুলো আমাদের কাছে না থাকার জন্য আমরা দায়ী। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দায়ী নয়।

এ ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করার মত কোন পথ যদি আমাদের না থাকে তাহলে একজন যিম্মাদার হিসাবে এতটুকু করতে পারি যে, দাজ্জালী গণমাধ্যমের তথ্যের উপর নির্ভর না করে বাস্তব পরিস্থিতির যতটা কাছাকাছি

যাওয়া সম্ভব যাওয়ার চেষ্টা করা। এরপর সরাসরি শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির আলোকে, উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইফতার আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করা। আশা করি সত্য গোপন থাকবে না।

মনে কিছু না নিলে একটি তিক্ত সত্য কথা বলে ফেলি। যাদের সঙ্গে পড়াশোনার কোন সম্পর্ক নেই তাদেরকে নিয়ে কথা বলে আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। এমনিভাবে যারা জ্ঞানপাপী, শত্রুর দালালিতে সিদ্ধহস্ত তাদেরকে নিয়েও আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু যাঁরা বাস্তবেই মুখলিস ও বিদগ্ধ আলেম তাঁরা এবং তাঁদের ব্যাপারে আমরা দু'টি কথা স্বীকার করে নিলে এ সমস্যার সমাধান দ্রুত এগিয়ে যেত। একটি কথা হচ্ছে, আমাদের মুখলিস বিদগ্ধ আলেমগণ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ ও তালাকের মাসআলা নিয়ে যে পরিমাণ সময় ও মেধা ব্যয় করেছেন সে পরিমাণ বা তার শত ভাগের এক ভাগও জিহাদের মাসআলার পেছনে ব্যয় করেননি। এ না করার পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণও আছে, আবার বহু পরিমাণে অযৌক্তিক কারণও আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, জিহাদের বাস্তব ময়দানের সঙ্গে আমাদের মুখলিস ও বিদগ্ধ আলেমগণ একেবারেই পরিচিত নন। এটা দুর্ভাগ্যক্রমে। এর অন্য কোন কারণ স্পষ্ট নয়।

এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, তাহলে কি আপনি এ দু'টি বিষয়েই সিদ্ধহস্ত? বা আপনি আপনাকেই এসব বিষয়ে সচেতন মনে করছেন, আর সবাইকে অসচেতন মনে করছেন? বিষয়টি আসলে এরকম নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, মুজাহিদ কাফেলাগুলোর সঙ্গে ওলামায়ে কেরামের এমন এক বিশাল জামাত রয়েছে যাঁরা এ বিষয়ক গবেষণাকে তাদের শাস্ত্রীয় ব্যস্ততা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এরই পাশাপাশি তারা বছরের পর বছর চলমান শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে লড়াই করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক মানের এমন আলেম রয়েছেন যিনি বার বছর সশস্ত্র জিহাদ করার পর আরো দশ বছর ব্যাপী সময় ব্যয় করে হাজার হাজার পৃষ্ঠার কিতাব লিখেছেন। লিখনীর ক্ষেত্রে কখনো কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তগুলোকে এড়িয়ে যাননি।

গবেষক ও লেখকদের অনেকেই এ আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন যে, সি.এন.এন., রয়টার্স ও আলজাযিরার মত আন্তর্জাতিক মানের সংবাদ মাধ্যমগুলো আমার নখদর্পণে। প্রতিদিন নয়, প্রতি মুহূর্তের পৃথিবী আমার সামনে। আর আমাকে অসচেতন মনে করছে এমন এক ব্যক্তি যে পাহাড়ী গুহায় জীবন কাটায়,

ফেসবুক দেখে জিহাদ শিখে। সংবিধান ও পার্লামেন্ট শব্দ বানান করতে বললে বনান করতে পারবে না।

এ পর্যায়ে আমি ছোট্ট একটি ঘটনার প্রতি পাঠক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি আবেগ তাড়িত না হয়ে ঘটনাটিকে বিবেচনায় নেবেন-

সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বী মাওলানা আহমদ শফী দামাত বারাকাতুহুমের নেতৃত্বে নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে অবরোধের ঘোষণা করা হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ ওলামা-তালাবা শাপলা চত্বরে জড়ো হয়েছেন। এ জড়ো হওয়ার শরয়ী অবস্থান কী? ফলাফল কী? এটা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, সে ভয়ংকর রাতে ওলামা-তালাবা কী পরিস্থিতির শিকার হয়েছে? আর পরের দিন পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কী খবর এসেছে? সে ঘটনাস্থল থেকে যারা মাত্র দুই তিন কিলোমিটার দূরে ছিল তারাও পর্যন্ত পত্রিকা ও টিভির খবরের মাধ্যমে জানতে পেরেছে, ওলামা তালাবা সেখানে কুরআন জ্বালিয়ে ছারখার করে ফেলেছে। তাদের তাণ্ডবে মতিঝিলসহ আশপাশের এলাকা ছারখার হয়ে গেছে। এদেশেরই বৃহৎ জনগোষ্ঠী উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ওলামা তালাবার কথা বিশ্বাস করেনি, তারা বিশ্বাস করেছে পত্রিকা ও টিভির খবর। বছরের পর বছর পেরিয়ে আজো পর্যন্ত তারা ওলামা তালাবাকে তিরস্কার করে বলে, তোমরা তো তারাই যারা কুরআন পুড়িয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলে।

পাঠক একটু লক্ষ করুন! দেশের মাটিতে বসে, দু'চার কিলোমিটার দূরে বসে দেশের মানুষ ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে এ কথা বিশ্বাস করতে পেরেছে যে, তারা কুরআন পুড়িয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পাশের দেশের মানুষ তা কেন বিশ্বাস করবে না? এক হাজার কিলোমিটার দূরের মানুষ তা কেন বিশ্বাস করবে না? পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরের মানুষ কেন তা বিশ্বাস করবে না? দশ হাজার কিলোমিটার দূরের মানুষ কেন বিশ্বাস করবে না যে, মাওলানা আহমদ শফী ও তার অনুসারী লক্ষ লক্ষ ওলামা তালাবা এমন এক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে ইসলামে কুরআন থাকতে পারবে না, কুরআনকে জ্বালিয়ে দিতে হবে।

আর এ খবর যখন সরাসরি ইহুদী-খ্রিস্টান পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমের পাইপ দিয়ে বিশ্বের মানুষের ঘরে ঘরে পৌছাবে তখন এ খবরের চেহারা কেমন হবে

একটু কল্পনা করুন। আমরা কাদের খবর কাদের মাধ্যমে নিচ্ছি? কোন খবরকে বিশ্বাস করছি, কোন খবরকে বিশ্বাস করছি না।

একটু ভাবুন! দ্বীনের খাতিরেই ভাবুন! দ্বীনের উসূলের ভিত্তিতেই ভাবুন! ইলমের উসূলকে সামনে রেখেই ভাবুন। যে দু'টি দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে সে দু'টি দুর্বলতাকে মেনে নিতে কষ্ট হলে দুর্বলতাদু'টি কাটিয়ে ফেলুন। কাফেলায় শরীক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে নেমে পড়ুন। আমরা কেউ কারো পর নই। আমাদের বাইরের সকল শক্তি আমাদের সবার পর। আমরা শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল করে ফেললে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছত্রে ছত্রে আদর্শ হিসাবে কোথাও মওদূদীবাদ, কোথাও শিয়া মতবাদ, কোথাও মুনকিরীনে হাদীস, কোথাও হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদী-খ্রিস্টান, আবার কোথাও নাস্তিক্য মতবাদকে গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। তাই একলক্ষ সাহেব আসলে কোন মতবাদের অনুসারী তা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আর না হয় ইসলামের ও ইসলামের ইলমের মূলনীতিতে আসতে হবে।

৯২. 'ইসলামের দৃষ্টিতে গণহত্যা কি বৈধ?'

স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, গণহত্যা কী? কোন কোন গণহত্যার ব্যাপারে ফরয হুকুম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٤٧)। অতএব গণহত্যা দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। যদি উদ্দেশ্য হয় অনেক কাফেরকে এক সঙ্গে হত্যা করা তাহলে তা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই। যারা মনে করে জিহাদ ফরয তাদের দৃষ্টিতে এ গণহত্যা অবশ্যই জায়েয। যাদের দৃষ্টিতে জিহাদই অবৈধ তাদের দৃষ্টিতে যে কোন কাফেরকে হত্যা করাই না জায়েয।

আর যদি গণহত্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, যে কাফের যুদ্ধে লিপ্ত আছে আর যে নেই উভয় রকমের কাফেরকে হত্যা করা। তাহলে এর উত্তর হল, জিহাদের সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে কুফর-শিরক অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। অতএব যে ঈমান আনবে না তার বিরুদ্ধেই জিহাদ হবে। আর জিহাদ মানে হত্যা। সুতরাং যোদ্ধা অযোদ্ধা পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন নেই। কাফেরের রক্ত হালাল হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে, সে কাফের হওয়া।

একজন কাফের এ হত্যা থেকে বাঁচার পদ্ধতি হচ্ছে, হয়ত সে মুসলমান হয়ে যাবে, নয়তো সে কাফের হওয়ার অপরাধে হীনতার স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমানদেরকে কর দিয়ে বেঁচে থাকবে, নয়তো সে বন্দি হয়ে মুসলমানদের গোলাম হয়ে থাকবে। বেঁচে থাকার জন্য চতুর্থ কোন ব্যবস্থা শরীয়তে রাখা হয়নি।

আর যদি গণহত্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদেরকেসহ হত্যা করা, তাহলে এ বিষয়ে ফিকহের মাসআলা হচ্ছে, যদি এদেরকে আলাদা করা সম্ভব না হয়, বা তাদেরকে আলাদা করতে গেলে মুসলমানরা কাফেরদের হাতে পরাজিত হবে, বা মুসলমানদের অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। ফাতাওয়া শামীতে মাসআলাটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

(قوله بنصب المجانيق) أي على حصونهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نصبها على الطائف رواه الترمذي نهر، وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار قلت: وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة (قوله وحرقهم) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني: والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمجانيق وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فمالهم أولى نهر، وقوله: بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم، لكن جواز التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك، بلا مشقة عظيمة فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز؛ لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين. (كتاب الجهاد، مَطْلَبٌ فِي أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ نَدْبًا)

ফাতাওয়া শামীতে যে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি এই-

سمعت قتيبة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن رجل، عن ثور بن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. (جامع الترمذي ٤١ – أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٧ – باب ما جاء في الأخذ من اللحية).

আর যদি গণহত্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, অমুসলিমদেরকে মারতে গিয়ে নিরপরাধ মুসলমানদেরকেও মেরে ফেলা, তাহলে এ বিষয়ে মাসআলাটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে মুসলমানদেরকে ঢাল বানানোর মাসআলার অধীনে।

তবে এখানে মুসলমানাদের দুই অবস্থা। হয়ত কাফেররা তাকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করেছে। এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মুসলমানকে বাঁচানোর চেষ্টা করা জরুরী। তবে যদি তাকে বাঁচাতে গেলে মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে বা বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকে সহ হামলা করার অনুমতি রয়েছে, যেভাবে এর আগেও মাসআলাটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর যদি কাফেররা তাকে ঢাল না বানায়; রবং সে নিজেই কাফেরদের সঙ্গে উঠাবসা বা বসবাস করে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার এ অবস্থানটাই শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়। যার ফলে এ পরিস্থিতিতে কাফেরদের উপর আক্রমণ করলে যদি মুসলমান আক্রান্ত হয় তাহলে সে জন্য হামলাকারী মুজাহিদরা দায়ী হবে না। এ বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে-

٢٦٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا». (سنن أبي داود بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ، وكذا رواه الترمذي والنسائي وأصحاب السنن الآخرون).

হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন-

(٤٧٨٠) لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَاعَدَ مَنْزِلُهُ عَنْ مَنْزِلِ الْمُشْرِكِ وَلَا يَنْزِلَ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي إِذَا أُوقِدَتْ فِيهِ نَارُهُ تَلُوحُ وَتَظْهَرُ لِلْمُشْرِكِ إِذَا أَوْقَدَهَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِهِمْ وَإِنَّمَا كُرِهَ مُجَاوَرَةُ الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا أَمَانَ وَحَثَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَالتَّرَائِي تَفَاعُلٌ مِنَ الرُّؤْيَةِ يُقَالُ تَرَاءَى

الْقَوْمُ إِذَا رَأَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَرَاءَى لِيَ الشَّيْءُ أَيْ ظَهَرَ حَتَّى رَأَيْتُهُ وَإِسْنَادُ التَّرَائِي إِلَى النَّارَيْنِ مَجَازٌ مِنْ قَوْلِهِمْ دَارِي تَنْظُرُ إِلَى دَارِ فُلَانٍ تُقَابِلُهَا يَقُولُ نَارَاهُمَا مُخْتَلِفَتَانِ هَذِهِ تَدْعُو إِلَى اللهِ وَهَذِهِ تَدْعُو إِلَى الشَّيْطَانِ فَكَيْفَ تَتَّفِقَانِ وَالْأَصْلُ فِي تَرَاءَى تتراءى فَحذف إِحْدَى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا. (حاشية السيوطي على سنن النسائي، كتاب البيوع).

হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন-

﴿٤٧٨٠﴾ فاستعصموا بِالسُّجُود أَي طلبُوا لأَنْفُسِهِمْ الْعِصْمَة بِإِظْهَار السُّجُود فَقتلُوا على بِنَاء الْمَفْعُول بازدحام الْقِتَال بِنصْف الْعقل بعد علمه بِإِسْلَامِهِمْ وَجعل لَهُم النّصْف لأَنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بَين ظهراني الْكفَّار فَكَانُوا كمن هلك بِجِنَايَة نَفسه وَجِنَايَة غَيره فَسقط حِصَّة جِنَايَته من الدِّيَة وَإِنِّي بَرِيء أَي من اعانته أَو من ادايته بعد هَذَا ان قتل أَلا لَا تَرَاءَى ناراهما هُوَ من التراائي وَهُوَ تفَاعل من الرُّؤْيَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ وَكَانَ أَصله تتراءى بتاءين حذفت إِحْدَاهمَا أَي لَا يَنْبَغِي للْمُسلمِ أَن ينزل بِقرب الْكَافِر بِحَيْثُ يُقَابل نَار كل مِنْهُمَا نَار صَاحبه حَتَّى كَأَن نَار كل مِنْهُمَا ترى نَار صَاحبه. (حاشية السندي على سنن النسائي، كتاب القسامة والقود والدية).

এরপর গণহত্যার আর এমন কোন পদ্ধতি রয়েছে যা নাজায়েয এবং মুজাহিদগণ সে নাজায়েয পদ্ধতিতেই গণহত্যা চালায়!

৯৩. 'মানুষের গণহারে হত্যা'

বার বার মানুষ শব্দ দিয়ে বিষয়টিকে জটিল করে তোলার চেষ্টা চলছে। মুজাহিদদের জিহাদী কার্যক্রম মানুষের বিরুদ্ধে নয়। জিহাদের সকল কর্মকাণ্ড দূর অতীত কাল থেকে আজো পর্যন্ত সব সময় মানুষের স্বার্থেই পরিচালিত হয়ে আসছে। তাদের সকল কর্মকাণ্ড সব সময় আল্লাহর দুশমন কাফেরদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আল্লাহর দুশমন কাফেরদেরকে একলক্ষ সাহেব সব সময় মানুষ বলতে বেশি পছন্দ করেন। আর তাদেরকে মানুষ উপাধি দিয়ে

বিষয়টিকে অন্য দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। অথচ মানুষদের স্বার্থেই আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহর এ ব্যবস্থা, জিহাদের ব্যবস্থা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নিরপরাধ মানুষ শব্দের অর্থ অমুসলিম ও আল্লাহর দুশমন। আল্লাহকে ও আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর নবীকে গালি দেয়া যেন কোন অপরাধ নয়।

৯৪. 'সন্দেহের বশবর্তী হয়েও'

আল্লাহর দুশমনদেরকে যারা হত্যা করছে তাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া চলছে। সন্দেহের উপর হত্যার সুযোগ কোথায়? আর মাসআলা চলছে জিহাদের। পাঠকদেরকে নিয়ে যাওয়া হল দণ্ডবিধির মাঠে। জিহাদের অধ্যায়গুলো যখন আমাদের অধ্যয়নে নেই তখন এমন দুর্ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। আমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাকের মাসআলা পড়ে দ্বীনের সাতাত্তর শাখার সমাধান করার চেষ্টা করছি। তাছাড়া উপায়ও নেই। কারণ জিহাদ অধ্যায় অধ্যয়ন করাও জঙ্গিবাদী মানসিকতার পরিচায়ক। সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচায়ক। জিহাদ বিষয়ক বই লেখা, কেনা, বিক্রয় করা, পড়া, কাউকে পড়ানো, বোঝানো -এসবই জঙ্গিবাদী হওয়ার লক্ষণ। এজন্য একলক্ষ সাহেব তার মাসিক পত্রিকায় অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছে, সন্তান কোন সাম্প্রদায়িক বা জঙ্গিবাদী বই পড়ে কি না সে দিকে লক্ষ রাখার জন্য এবং যথাসাধ্য বিরত রাখার জন্য।

এমতাবস্থা ফাতওয়া কিসের আলোকে দেয়া হবে? নিশ্চয় যে বইগুলোতে জিহাদের কোন আলোচনা নেই সেগুলোর আলোকে।

৯৫. ادرؤا الحدود عن المسلمين

যে আদালতে অপরাধী প্রকাশ্যে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেও বিচারপতির সন্দেহ থেকে যায়, সে অপরাধীর অপরাধ নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত হওয়ার উপায় কী? আর আলোচনা চলছে গণহত্যা সম্পর্কে যা জিহাদের একটি অংশ। দলিল চলছে মুসলমানদের উপর দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের নীতিমালা সম্পর্কে। দলিলের দুর্ভিক্ষ প্রকট আকার ধারন করেছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাদের সন্দেহ কবে কাটবে? সমকামিতার বৈধতার জন্য যে নেতা আন্দোলন করে চলেছে সে মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের

সন্দেহ কাটছে না। যে বলেছে, ঢাকা শহরের মসজিদগুলোকে শৌচাগার বানানো উচিত সে মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। যে আল্লাহ ও তাঁর নবীকে সুস্পষ্ট শব্দে গালি দিল, আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করল সে মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। যে কোন ধর্মের পক্ষে নয় সে মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। যে ধর্মের উর্ধ্বে উঠে এসে রবিন্দ্রনাথের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে বলল সে মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। অইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের প্রবেশকেও যারা বেআইনী মনে করে তারা মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। মূর্তি স্থাপনের বিরোধিতা করাকে যারা অবৈধ মনে করছে তারা মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। সর্বধর্মীয় প্রর্থনা সভার যারা আয়োজন করছে এবং তা বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করছে তারা মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়ন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এ বিশ্বাস যারা রাখে, এ আইন যারা করে, এ আইন যারা বাস্তবায়ন করে তারা মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। মুসলমানদের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি, রাষ্ট্রপ্রধান, ধর্মমন্ত্রী, আইন প্রণেতা অমুসলিম হলে কোন সমস্যা নেই যাদের ধারণা তারা মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। যারা মনে করে ইসলামী শরীয়তের আইন বর্তমান পৃথিবীতে চলা সম্ভব নয় তারা মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না। যারা শান্তির জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল তারা মুরতাদ কি না -এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ কাটছে না।

আমরা আসলে কোন ধর্মের লোক সম্ভবত -এ বিষয়েও আমাদের সন্দেহ কাটছে না।

সন্দেহবায়ু রোগে যারা আক্রান্ত তারা আসলে এসব বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। যাদের সন্দেহ কেটে গেছে, যারা কাফেরদের কুফরী দেখতে পাচ্ছে তারা কাজ করে যাক। মুসলমান নামধারী একটি দলইতো ইবলিস শয়তান কাফের কি না এ বিষয়ে সন্দিহান ছিল। পরবর্তীতে তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে, ইবলিস শয়তান আসলে কাফের নয়; বরং সে হচ্ছে প্রকৃত মুওয়াহহিদ। কারণ সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে হলেও আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা থেকে বেঁচে থেকেছে। সন্দেহ রোগের ওষুধ বই লিখা নয়, ওয়ায

করা নয়, পিঠে হাত বোলানো নয়। এর ওষুধ তাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তরবারীর মাধ্যমে দিয়েছেন।

৯৬. إن الحد لا يثبت عند قيام الشبهة

এ ফাতওয়াদাতাদের আমলতো চলছে এ কথার উপর যে, لا يقام الحد عند التيقن أيضا নিশ্চিত হওয়ার পরও দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা যাবে না। তাহলে এ প্রসঙ্গে তারা আলোচনা করছেন কেন? যাই হোক এ সন্দেহ শুবহার কি কোন শুরু শেষ আছে? একজন যিনাকারের বিরুদ্ধে চার জন সাক্ষ্য দেয়ার পরও যদি সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, হতে পারে এরা শত্রুতাবশত সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাহলে শুধু এ সম্ভাবনার কারণে কি বিচারপতি শাস্তি বাস্তবায়ন না করার অধিকার রাখবে? যিন্দিক ও মুলহিদদের সব সময় দাবি থাকে তারা মুসলমান। এরপরও তাদের উপর শাস্তি বাস্তবায়িত হয় কি না? বোঝা যাচ্ছে, নিজ থেকে তৈরি করা কোন সন্দেহ এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়ত যতটুকু শুবহাকে শুবহা হিসাবে ধর্তব্য করেছে ততটুকুই ধর্তব্য হবে। এর বাইরে অমূলক সন্দেহ করা মানেই হচ্ছে যিন্দিক ও মুলহিদদের জন্য রাস্তা খুলে দেয়া।

ইসলামের ইতিহাসে এমন মুসলমানও অতীত হয়েছে বা বর্তমানে আছে যারা ফেরাউন কাফের কি না এ বিষয়ে সন্দিহান। আবু তালেব কাফের কি না এ বিষয়ে সন্দিহান। বারাক ওবামা কাফের কি না এ বিষয়ে সন্দিহান। তাসলিমা নাসরিন কাফের কি না এ বিষয়ে সন্দিহান। লতীফ সিদ্দীকী কাফের কি না এ বিষয়ে সন্দিহান। ড. হুমায়ন আযাদ কাফের কি না এ বিষয়ে সন্দিহান। জিহাদকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা বললে কাফের হবে কি না এ বিষয়ে সন্দিহান। কাফেরদেরকে কাফের বলা যাবে কি না এ বিষয়ে সন্দিহান।

অথচ দলিলের আলোকে যে কাফের হওয়া প্রমাণিত তাকে কাফের মনে না করাকে কুফরী বলা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, আল্লামা কাশ্মীরী রহ. রচিত 'ইকফারুল মুলহিদীন' কিতাবটি।

৯৭. أن أقيمها بالشبهات

এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, আমল চলছে নিশ্চিত অপরাধের অপরাধীর সঙ্গে ভালোবাসার। যে পৃথিবীতে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার লড়াই অপরাধ এবং সে লড়াইয়ের বিরুদ্ধে ফাতওয়ার আয়োজন, সে পৃথিবীতে এসব উদ্ধৃতি দিয়ে কোন মুসলমানের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা চলছে? না কি আল্লাহর দুশমন কাফের মুরতাদদের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা চলছে? বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে। আর আমরাও কামনা করি, কুফরী আদালতগুলো এমন আদালতে রূপান্তরিত হোক যে আদালতে শরীয়তের এ উসূল ও নীতিমালা প্রয়োগ করা যাবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা সাধারণত কাফের ও মুরতাদদের কুফরী ও ইরতিদাদগুলো তলিয়ে দেখতে আগ্রহবোধ করি না, পাছে তাদের বাস্তব অবস্থাটা ধরা পড়ে যায়। আর ধরা পড়ে গেলেই তাকে কাফের মুরতাদ ফাতওয়া দিতে হবে। অনেকের ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, তাদের সামনে সকল দলিল প্রমাণ তুলে ধরার পর সে বলেছে, আপনার যেহেতু বুঝে এসেছে সেহেতু এটা আপনার দায়িত্বে পড়ে, আমার যেহেতু বুঝে আসেনি সেহেতু আমার দায়িত্বে আসে না। বললাম, তাহলে আপনি এ প্রমাণগুলো অস্বীকার করেন। বললেন, অস্বীকার করতে পারব না, তবে আমার বুঝে আসেনি। বললাম, কোন কথাটায় আপনার সন্দেহ? বললেন, আপনাকে বোঝাতে পারব না। বললাম, আমার বুঝশক্তি কম হওয়ার কারণে না কি দলিল না থাকরা কারণে? বললেন, আমাকে বিষয়টি আরো বুঝতে হবে। বললাম, আমার কাছে এ মুহূর্তে যে উপাদানগুলো সেগুলোর একটা সমাধানতো হয়ে যাওয়া দরকার। বললেন,আমি আরো দেখি।

পরে দেখা গেছে মাসের পর মাস এমন কি বছরও গড়িয়ে গেছে, তিনি আর দেখেননি। সন্দেহ দূর করার কোন ব্যবস্থা নেননি। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে, তিনি মূলত সন্দেহের মাঝে থাকতেই পছন্দ করেন, যাতে কখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না হয়। কারণ, সিদ্ধান্তে পৌঁছলেই কার্যকর করার দায়িত্ব এসে যাবে। সে বাস্তবায়নটা মন গ্রহণ করতে চায় না।

এমন পরিস্থিতির মুখোমুখীও আমরা হচ্ছি যখন ইসলামের জন্য যাদের জীবন কুরবান বলে ধারণা করা হয়, তাদের কোন কোন কথায় এমন সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে যে, তারা মনে মনে কামনা করেন ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত না

হোক। কারণ ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে যিনার শাস্তি হিসাবে সবার সামনে যিনাকারীকে পাথর মেরে মেরে হত্যা করা হবে। আর এ দৃশ্য তার সহ্য হবে না। শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত কোন শিরচ্ছেদের বিধানের কথা শুনলেই সে কেঁপে ওঠে। চুরির কারণে হাত কেটে দেয়ার কথা শুনলেই সে কেঁপে ওঠে। একশত বেত্রাঘাতের কথা শুনলেই সে কেঁপে ওঠে। তারা যেন এ আয়াতের কথা ভুলেই গেছে-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (سورة النور ٢).

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে"। -সূরা নূর ২

অনেকের কথাবার্তা থেকে এমনও সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে যে, তাদের কামনা কুরআনে কারীমে যদি জিহাদ সম্পর্কে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে এত স্পষ্ট আয়াতগুলো না থাকত তাহলে ভালো হত। এখন এ আয়াতগুলো থাকার কারণে এগুলোর সঠিক কোন জবাব দেয়া যাচ্ছে না, বা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এসব মানুষের ব্যাপারেও আমাদের সন্দেহ কাটে না।

তাহলে শুবহাত দূর করার কোন ব্যবস্থাতো আখের লাগবে। আমরা শুবহা দূর করার ব্যবস্থা নিব? না কি শুবহা জিইয়ে রাখার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা করব? আমাদের দায়িত্ব কী?

৯৮. 'ইসলাম কি সমর্থন করে?'

সমর্থন করে কি না? এ বিষয়টি আমরা ইসলামী শরীয়ত থেকে নেব? না কি জাতিসংঘ থেকে নেব? যদি ইসলাম থেকে নেব হয় তাহলে ৯২ নং টীকায় যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর আলোকে আমরা বিষয়টিকে বিচার করতে পারি। আর যদি জাতিসংঘের মানবাধিকার নীতির আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে এ দায়িত্ব একলক্ষ সাহেবের উপর থাকলেই ভালো হয়।

৯৯. 'কিতাল বা স্বশস্ত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যখন মুসলিম দল বের হত'

কিতাল বা স্বশস্ত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুসলিম দল বের হওয়া জিহাদ না সন্ত্রাস? এ বের হওয়ার জন্য অস্ত্রে ধার দেয়া, অস্ত্র জোগাড় করা জিহাদ না সন্ত্রাস? এ কিতাল ও স্বশস্ত্র যুদ্ধের জন্য মুসলিম যুবকদেরকে তৈরি করা জিহাদের প্রস্তুতি না সন্ত্রাসের প্রস্তুতি? এ কিতাল ও স্বশস্ত্র যুদ্ধের জন্য মুসলিম যুবকদেরকে কলা কৌশল সেখানো জিহাদের প্রস্তুতি না সন্ত্রাসের প্রস্তুতি? এ কিতাল ও স্বশস্ত্র যুদ্ধের জন্য তৈরিকৃত বই-পত্র জিহাদের বই না সন্ত্রাসের বই। এ কিতাল ও স্বশস্ত্র যুদ্ধের মানসিকতা জিহাদের মানসিকতা না সন্ত্রাসের মানসিকতা?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর কী এবং একলক্ষ সাহেবের এ ফাতওয়া কিসের বিরুদ্ধে?

১০০. أن رسول الله كان إذا بعث جيشا

এরকম বাহিনী পাঠানো বৈধ কি না? এর বৈধতার ব্যাপারে একলক্ষ সাহেবের কী খেয়াল তা পরিষ্কার হওয়ার পর এর নিয়ম-নীতি নিয়ে আলোচনার একটা ফলাফল পাওয়া যেত। যে বাহিনীর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন, যে বাহিনীকে অবৈধ প্রমাণিত করার জন্য এত আয়োজন, সে বাহিনীর খুটিনাটি ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে কেন আলোচনা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

এ বাহিনীগুলো কি আল্লাহর দুশমন অমুসলিমদের সঙ্গে জিহাদের ময়দানে ভালোবাসা ভালোবাসা খেলত? সেখানে রক্তারক্তি হত না কোলাকুলি হত? কঠোরতা হত না সৌহার্দ্য হত? যে বাহিনী ও কাফেলার বৈধতার উপর আপত্তি সে বাহিনী ও কাফেলার উদ্ধৃতি দিতে একটু লজ্জাবোধ হওয়ার দরকার ছিল।

১০১. ولا مريضا ولا راهبا ولا تقطعوا مثمرا

কোন কোন ক্ষেত্রে কি এর অনুমতিও দেয়া হয়নি? বিষয়গুলোর কিতাবভিত্তিক আলোচনা হবে। হাওয়াই কথায় এসব বিষয়ে সমাধানে পৌঁছা সম্ভব নয়। আলোচনার ধারাবাহিকতায় সবার আগে আসবে, জিহাদ একটি ফরয আমল কি না? দ্বিতীয়ত এ ফরযটি কাদের উপর? তৃতীয়ত এর কৌশলগত পদ্ধতি কী? এরপর কাজে নামতে গিয়ে যখন জিহাদের কাফেলা অস্ত্র নিয়ে

অপারেশনে বের হবে তখন চতুর্থ নম্বরে এর বিধি-নিষেধের বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

যারা প্রথম তিনটি পর্বকে অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে চতুর্থ নম্বরের এ বিষয়টি নিয়ে অলোচনা করতে আমার ধর্মীয় মর্যাদাবোধে আঘাত লাগছে। এ জন্য যারা প্রথম তিনটি বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রথম তিনটি বিষয়ে আল্লাহর বিধানের সঠিক উপলব্ধি রাখে এবং প্রথম তিনটি পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেকে ও অপর মুসলমানকে তৈরি করেছে এবং তৈরি করে চলেছে -শুধু তাদের জন্য এবং তাদের সমীপে চতুর্থ বিষয়টি নিয়ে কিছু নিবেদন করতে চাই। মাসআলাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা মূলত ফিকহের মুতাওয়াল কিতাবাদি থেকেই নিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে গবেষণার সুবিধার্থে যে দু'য়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা হবে তা দেখার আগে ফিকহে হানাফীর সর্বাধিক সমাদৃত কিতাব হেদায়ার কিছু উদ্ধৃতির উপর সামান্য নজর বুলিয়ে নিলে ভালো হবে।

হেদায়া কিতাবে রয়েছে-

"ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة" مبالغة في الإنذار ولا يجب ذلك لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون وعهد إلى أسامة رضي الله عنه أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق والغارة لا تكون بدعوة قال: "فإن أبوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم" لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة "فإن أبوا ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه والمدمر على أعدائه فيستعان به في كل الأمور قال: "ونصبوا عليهم المجانيق" كما نصب رسول الله عليه الصلاة والسلام على الطائف"وحرقوهم" لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق اليوبرة قال: "وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم" لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت والغيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروعا.

"ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر" لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره لانسد بابه "وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا

عن رميهم" لما بينا "ويقصدون بالرمي الكفار" لأنه إن تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا والطاعة بحسب الطاقة وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفروض بخلاف حالة المخمصة لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذار الضمان. (**الهداية، كتاب السير، باب كيفية القتال**).

"ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعدا ولا أعمى" لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف والشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى لأن المبيح عنده الكفر والحجة عليه ما بينا وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الصبيان والذراري وحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال "ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت" قال: "إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة" لتعدي ضررها إلى العباد وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا لشره ولأن القتال مبيح حقيقة "ولا يقتلوا مجنونا" لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح. (**المصدر السابق**).

এ ইবারতগুলো এবং এর মত আরো শত শত ইবারতের আলোকে বলা যায়:

ক. যে মুকাতিল বা মুহারিব হবে তাকে হত্যা করা যাবে, সে যেই হোক।

খ. শুধু ঐ ব্যক্তিই মুকাতিল বা মুহারিব নয় যে সরাসরি অস্ত্র ধারণ করেছে। বরং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত মুহারিব ও মুকাতিলের অন্তর্ভুক্ত যে সমর্থন ও মতামত দিয়েও সহযোগিতা করেছে।

গ. মুকাতিল বা মুহারিবকে মারতে গেলে যদি গায়রে মুকাতিল ও গায়রে মুহারিবকে বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে গায়রে মুকাতিল ও গায়রে মুহারিবকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। এমন কি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে মারতে হলে তাকেও মারার অনুমতি রয়েছে।

ঘ. কাফেরদের দম্ভ ও জৌলুস নষ্ট করে দেয়ার জন্য, তাদের মাঝে বিশৃংখলা

সৃষ্টি করার জন্য হাদীসের আলোকে মিনজানিকের ব্যবহার, রাতের বেলায় হামলা করা, আগুন লাগিয়ে দেয়া, পানি ছেড়ে দেয়া, গাছ কেটে ফেলা ইত্যাদির অনুমতি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, পরিস্থিতির বিবেচনায় গায়রে মুকাতিল ও গায়রে মুহারিবের উপর হমলার অনুমতি রয়েছে।

ঙ. বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধের যে অস্ত্রগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই এমন যা দ্বারা হামলা করতে গেলে মুকাতিল ও গায়রে মুকাতিলকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। তাই শত্রু হামলা করবে পারমাণবিক বোমা দিয়ে, যে হামলায় একটি দেশ ভূগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। আর আমরা হামলা করব- একটি ছুরি নিয়ে শুধু ঐ ব্যক্তিকে ধরে এনে জবাই করে দেব যে বোমা হামলা করতে গিয়ে সর্বশেষ বাটনে চাপ দিয়েছে। কারণ এর আগ পর্যন্ত যারা যাই করেছে তাদের কেউ এ হামলায় সরাসরি জড়িত নয়। - এমন কথা আমাদের কুরআন, হাদীস ও ফিকহ বলেনি।

চ. যে রাষ্ট্রপ্রধানরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং যুদ্ধ করে চলেছে তাদেরকে যারা ভোট দিয়েছে এবং যুদ্ধ করার জন্য সমর্থন ও শক্তির যোগান দিয়েছে তাদেরকে গায়রে মুকাতিল ও গায়রে মুহারিব অসহায় সাধারণ নাগরিক বলার আগে তথ্য-উপাত্তগুলো আবার দেখে নেয়া দরকার।

১০২. 'ইবাদতরত মানুষকে হত্যা করা কী ধরনের অপরাধ?'

এখানে সম্পূরক প্রশ্ন হতে পারে, হত্যা অপরাধ করার কারণে না কি ইবাদত করার কারণে? দ্বিতীয় সম্পূরক প্রশ্ন, মূর্তীর সামনে সেজদা, যিশুর সামনে সেজদা এগুলোকেই কি ইবাদত বলা হচ্ছে? উত্তরের শব্দাবলী তো এমনটিই বলছে।

১০৩. 'উত্তরঃ যে কোন অবস্থায় খুন করা অপরাধ'

তার মানে- যুদ্ধরত অবস্থায় কাফেরকে হত্যা করা অপরাধ, বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তাকে হত্যা করা অপরাধ, মুসলমানদেরকে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়া অবস্থায়, মোটকথা যে কোন অবস্থায় খুন করা অপরাধ ও অন্যায়। বক্তব্যতো এমনটিই বলছে। বাকি এর ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন।

এখানে আরেকটু অতিউৎসাহ প্রকাশ পাওয়ার কারণ স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন করা হয়েছে, ইবাদতরত মানুষকে হত্যা করা কী ধরনের অপরাধ। উত্তর দেয়া হয়েছে, যে কোন অবস্থায় হত্যা করা অপরাধ। যাই হোক এটা আমাদের মাথা ঘামানোর মত কোন বিষয় নয়। বাকি একটু সন্দেহ হয়, তাই সামান্য টাচ্ করা হয়েছে।

১০৪. 'উপাসনারত কাউকে হত্যা করা সবচে জঘন্য এবং মারাত্মক অপরাধ'

তার মানে ক্রুসেডাররা যখন তাদের ধর্মীয় আদেশ মত ইবাদত হিসাবে মুসলমানদের উপর হামলা করে তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের উপর হামলা করা, তাদেরকে হত্যা করা সবচাইতে জঘন্য অপরাধ। কারণ এটা তাদের উপাসনা। যুদ্ধের ময়দানে কাফেররা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতার জন্য লাত-ওজ্জা-সরস্বতী-দুর্গার কাছে প্রর্থনায় বসে যায় তাহলে তাদের উপর হামলা করা এবং তাদেরকে হত্যা করা সবচাইতে জঘন্য অপরাধ। কোন মহল্লায় হামলা করতে গেলে তারা যদি ইসলামের কালেমা না পড়ে মূর্তির পূজায় লেগে যায় তাহলে তাদের উপর হামলা করা এবং তাদেরকে হত্যা করা সবচাইতে বড় অপরাধ।

কিন্তু আসলেই কি এসব ক্ষেত্রে হামলা করা ও হত্যা করা সবচাইতে জঘন্য অপরাধ? না কি কোন কোন ক্ষেত্রে হামলা করা ফরযও। আর যদি বলা হয়, এসব বিষয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। তাহলে আমরা বলতে পারি, ব্যাখ্যা ছাড়া এতবড় কথা বলা হল কেন যার দ্বারা একটি ফরয বিধানকে অস্বীকার করা হয়েছে?

আর এ উদ্ভট দাবিকে প্রমাণিত করার জন্য নীচে যেসব দলিল উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এ দাবির কী সম্পর্ক? চলুন দেখি সে দলিলগুলো।

১০৫. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم

উত্তর দেয়া হয়েছে, উপসনারত কাউকে হত্যা করা সবচে জঘন্য এবং মারাত্মক অপরাধ। দলিল দেয়া হয়েছে, 'যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে তার পরিণাম জাহান্নাম'। দাবি ও দলিলের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা গেল না।

আর একলক্ষ সাহেব কি আসলেই মনে করে যে, মুজাহিদদের সকল আয়োজন মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য? যদি এমনটি মনে না করে থাকে তাহলে এ প্রশ্ন, এ উত্তর এবং এ দলিল উপস্থাপনের মানে কী? তবে স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদদেরকে যদি কেউ মুসলমান মনে করে তার হত্যাকারীকে জাহান্নামী মনে করে তাহলে তার হুকুম কী? এমনিভাবে ভাস্কর্যে অর্ঘ্য দেয়া ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করাকে যদি কেউ ইবাদত মনে করে এবং সে সময় হামলা করাকে সবচে জঘন্য অপরাধ মনে করে তাহলে তার হুকুম কী? সর্বধর্মীয় প্রার্থনাসভায় একই সঙ্গে সবাই মিলে সকল ধর্মের আলোকে প্রার্থনা করতে বসে সে প্রার্থনাকে যদি কেউ ইবাদত মনে করে এবং তাদের উপর হামলা করাকে সবচাইতে জঘন্য অপরাধ মনে করে তাহলে তার হুকুম কী? আসলে এ সকল প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতাদের পরিচয় স্পষ্ট হওয়া দরকার সবার আগে।

১০৬. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

আয়াতে উল্লিখিত إلا بالحق এর একটি তালিকা একলক্ষ সাহেবের কাছে আছে কি না? না কি إلا بالحق এর কোন প্রয়োগ ক্ষেত্রে নেই। উত্তরের শুরুতেই যেভাবে ঢালাওভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যে কোন অবস্থায় খুন করা অপরাধ, সে হিসাবে আর আশা করা যায় না যে, إلا بالحق এর কোন প্রয়োগ ক্ষেত্র থাকতে পারে। অথচ এর তালিকা কি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত? কুরআনের ভাষা যদি হয় وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٩) তাহলে إلا بالحق এর তালিকা এত ছোট হয় কীভাবে?

এত শত দুর্বলতার মাঝেও আজো পর্যন্ত মুজাহিদ কাফেলাগুলো যাদেরকে হত্যা করে চলছে তাদের তালিকা বের করে একটু তদন্ত করে দেখুন তারা কারা, মুকাতিল ও মুহারিব দলের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক!

স্বঘোষিত নাস্তিকদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে যারা গালি দেয় তাদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, যারা আইন ও বিচার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এবং আল্লাহর আইনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে তাদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, যিনাকে যারা যিনা না বলে বৈধ পেশা হিসাবে আখ্যা দিয়েছে তাদেরকে হত্যা করা যাদের

দৃষ্টিতে হারাম, যারা প্রকাশ্য যিনা ও সমকামিতার বৈধতার জন্য আন্দোলন করছে তাদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, গায়রে মাহরামের সঙ্গে যিনার বাজার গরম করে যারা এখন মাহরামের সঙ্গে যিনার আয়োজন করছে এবং এর সকল কৌশল তৈরি করছে, প্রচার করছে তাদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, কুফরী আইনে চলার জন্য যারা মুসলমানদেরকে বাধ্য করছে তাদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, কোন ধর্মের পক্ষ না নিয়ে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেয়ার জন্য যারা বাধ্য করছে তাদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, কুফরী আইন বাস্তবায়নের জন্য যারা শপথ করেছে এবং তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তাদেরকে হত্যা করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অস্ত্র ধারণ করা যাদের দৃষ্টিতে হারাম -তাদের কাছে নিশ্চয় إلا بالحق এর কোন প্রয়োগ ক্ষেত্র থাকার কথা নয়।

১০৭. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا

কুফরী আইনের প্রহরীরা যখন মুজাহিদ কাফেলার উপর হামলা করে এবং মুসলমানদেরকে হত্যা করে তখন তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াত প্রয়োগ করাকে বৈধ মনে করা হয় না। আয়াত প্রয়োগের এ ক্ষেত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মুজাহিদরা যখন কাফেরদের উপর, কাফেরদের দালালদের উপর, নাস্তিকদের উপর হামলা করে তাদেরকে হত্যা করে তখন এ আয়াতকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার সর্বোত্তম ক্ষেত্র মনে করা হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, তাহলে এ একলক্ষ সাহেব কে ও কারা?

আর আরেকটি কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে সবার ভুল মাফ হওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্পষ্ট কুফর শিরককে ব্যাখ্যা করে বৈধতা দেয়ার হাজারো আয়োজন চলছে। মুজাহিদদের জন্য কি দু' একটি ভুলের কোটাও খালি নেই?

১০৮. 'গির্জা, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদিতে হামলা করা কি বৈধ?'

এ জায়গাগুলোতে যদি আল্লাহর দুশমনরা আশ্রয় নেয় তাহলেও কি তাদেরকে মারা যাবে না? এ উপাসনালয়গুলো কি মসজিদে হারামের হুকুমে? অথচ মসজিদে হারামেও তো কিছু সময়ের জন্য হালাল ছিল। অন্যান্য মসজিদে তো এ বিধান নেই।

আর বর্তমান অবস্থাতো হচ্ছে, এ উপসনালয়গুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুহারিব ও মুকাতিলদের সকল ষড়যন্ত্রের কার্যালয়। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে অমুসলিমরা ইসলামবিরোধী যত রকমের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তার সবই এ সকল উপসনালয় থেকে করে থাকে। তাহলে এসব উপাসনালয়ে হামলা করা এবং এগুলো ধ্বংস করার বৈধতা খুব অস্বাভাবিক বিষয় নয়। ফিকহের কিতাবাদিতে এসব বিষয়ে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। কখন হামলা করা যাবে আর কখন যাবে না সব বিস্তারিত বলা আছে। এসব বিষয়ে ঢালাও কথা বলার মানসিকতা পরিহার করা দরকার। কমপক্ষে যারা নিজেদেরকে যিম্মাদর ভাবতে পছন্দ করে তাদের জন্যতো তা খুবই জরুরী। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফিকহের কিতাবাদি দেখার অনুরোধ রইল। এখানে বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নেয়ার জন্য ইমাম জাসসাস রহ. এর আহকামুল কুরআন থেকে সামান্য উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الْمَذْكُورَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُهْدَمَ عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّةٌ أَوْ عَهْدٌ مِنْ الْكُفَّارِ وَأَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَجَائِزٌ لَهُمْ أَنْ يَهْدِمُوهَا كَمَا يَهْدِمُونَ سَائِرَ دُورِهِمْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ إِذَا صَارَتْ مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يُهْدَمْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ وَأَمَّا مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا بِالْجِزْيَةِ فَإِنَّهُ مَا صَارَ مِنْهَا مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ من فيها الصَّلَاةِ فِي بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ وَلَا تُهْدَمُ عَلَيْهِمْ وَيُؤْمَرُونَ بِأَنْ يَجْعَلُوهَا إِنْ شَاءُوا بُيُوتًا مَسْكُونَةً. (أحكام القرآن للجصاص في بيان أحكام سورة الحج ٣٧-٤١).

এ ইবারত দেখে কারো কারো হয়ত সাহস উঁকি দেবে। কারণ, উপসনালয় ভাঙ্গার অনুমতি থাকলেও তা রয়েছে দারুল হরবে। আর পৃথিবীতে এখন কোন দারুল হরব নেই। অতএব এ অনুমতিরও কোন প্রয়োগ ক্ষেত্র নেই।

এ মানুষগুলো আসলে কল্পনাবিলাসী। এ জীবনে কখনো দারুল হরব কাকে বলে আর দারুল ইসলাম কাকে বলে এ নিয়ে ভাবারও সুযোগ পায়নি। কখনো কোন কিতাবের পৃষ্ঠা খুলে দেখেনি। কখনো এ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হলে খড়কুটো আকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছে। তাহকীক তো বহু দূর। এ প্রসঙ্গে আশা করি পরবর্তীতে আলোচনার সুযোগ হবে।

১০৯. 'মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিমকে যদি'

ইসলামী শরীয়তের আলোকে ক্রিতদাস না হয়ে বা অমুসলিম হওয়ার অপরাধে হীনতার সাথে কর আদায় না করে কোন অমুসলিম মুসলিম সমাজে বসবাস করার সম্ভাব্য পদ্ধতি কী? শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী? ফিকহে ইসলামীর পরিভাষায়তো মুসলিম সমাজ নামে কোন পরিভাষা নেই। পরিভাষা আছে দারুল ইসলাম। এ বিষয়ক কোন মাসআলার মীমাংসার দরকার হলে তার মাপকাঠি হবে দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হিসাবে। কোন অমুসলিমের সঙ্গে কী আচরণ হবে তা নির্ধারণ হবে দারুল ইসলাম ও দারুল হরব হিসাবে। 'মুসলিম সমাজ' বলে পানি ঘোলা করে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, ভুল শিক্ষিত ও উল্টা শিক্ষিতদেরকে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু এর দ্বারাতো সমস্যার সমাধান হবে না। কাশি দিয়ে আওয়াজ হয়তো ঢেকে দেয়া যাবে, কিন্তু গন্ধ ঢাকার ব্যবস্থাতো এর দ্বারা হবে না।

১১০. 'বেহেশতের গন্ধও পাবে না'

কারণ কী? দলিল কী? হাদীস ও সীরাততো বলে অমুসলিম যদি মুসলমানদের দুশমনীতে লিপ্ত থাকে, মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে জবাই করে দিতে হবে। এ দুশমনীর কারণে মদীনার শত শত অমুসলিমকে জবাই করে দেয়া হয়েছে। শত শত অমুসলিমের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেশান্তর করে দেয়া হয়েছে। শত শত অমুসলিমকে গোলাম-বাঁদী বানানো হয়েছে। এখন তাদেরকে হত্যা করা হলে বেহেশতের গন্ধ পাওয়া যাবে না কেন? তখন যাঁরা এ কাজগুলো সম্পাদন করেছিলেন তাদের ব্যাপারে একলক্ষ সাহেবের কী মত? একটি ফরয ওয়াজিব দায়িত্ব আদায় করলে কেন বেহেশতের গন্ধ পাওয়া যাবে না? তা হলে বেহেশত কাদের জন্য?

১১১. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض

এ আয়াতে কাদের দ্বারা কাদেরকে প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে? এ বিষয়ে আমরা তাফসীরের কিতাবাদির শরাণাপন্ন হতে পারি। তাফসীরে আবুস সাউদে এসেছে–

{وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} بتسليط المؤمنين على الكفارين في كلّ عصرٍ وزمانٍ

যার অর্থ হচ্ছে জিহাদ। কাফেররা আজীবনই মুমিনদের ইবাদতখানাগুলো ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জিহাদের মাধ্যমে

মুমিনদের দ্বারা কাফেরদেরকে প্রতিহত করে মুমিনদের ইবাদতখানাগুলো রক্ষা করেছেন।

তাফসীরে বায়যাবীতে এসেছে–

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. لَهُدِّمَتْ لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل،

যার অর্থ দাঁড়ায় যেখানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হবে তা রক্ষা করার পদ্ধতি হচ্ছে মুমিনরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে, আর এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ইবাদতখানাগুলো রক্ষা করবেন। এ জিহাদের বিরুদ্ধেই কিন্তু একলক্ষ সাহেবের এ ফাতওয়ার আয়োজন। মুমিনরা কাফেরদেরকে কেন প্রতিহত করবে এর উপর আপত্তি। কাফেরদের প্রতিহত করার সকল আয়োজন হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। কাফেরদের প্রতিহত করার সকল চিন্তা-ভাবনাই হচ্ছে সন্ত্রাসী চিন্তা-ভাবনা। কাফেরদের প্রতিহত করার কলা কৌশল এবং মাসআলা-মাসায়েল জানার চেষ্টা করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

অবাক কাণ্ড হচ্ছে, এ আয়াতটি উল্লেখ করেও কীভাবে আয়াতের এত গুরুত্বপূর্ণ অংশকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সমস্যাটা অজ্ঞতার নয়। সমস্যা আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে আছে।

আর এ কথা ভাবারও সুযোগ হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দ্বারা কাফেরদেরকে প্রতিহত করে যে ঘরগুলোকে রক্ষা করেছেন সে ঘরগুলোতে কী হত? সেগুলোতে কি আল্লাহর দুশমন কাফের মুশরিকদের দুশমনি চলত, না একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হত?

তাফসীরে জালালাইনে এর ব্যাখ্যা এসেছে–

[يُذْكَر فِيهَا] أَيْ الْمَوَاضِع الْمَذْكُورَة [اسْم اللّٰه كَثِيرًا] وَتَنْقَطِع الْعِبَادَات بِخَرَابِهَا

যার অর্থ হল, এ ঘরগুলোতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হত। যে ঘরগুলো কফেরদের আখড়া। যে ঘরগুলো কুফর শিরকের কারখানা সে ঘরগুলো কাফেররা কেন ধ্বংস করতে যাবে? আর মুসলমানরা কেন কাফেরদেরকে প্রতিহত করে কফেরদের আড্ডাখানাগুলো রক্ষা করতে যাবে? এ রক্ষা কার জন্য করবে?

এ স্পষ্ট কথাগুলো নিয়ে ভাবার সময় নেই। কিন্তু এ আয়াত থেকে কুরতুবী রহ. একটি মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছেন তা ভাবার সুযোগও হয়েছে এবং সময়ও পাওয়া গেছে। ভাবার সময় হয়নি যে, এটা আয়াতের মূল তাফসীর নয়, আয়াত থেকে উদ্ঘাটিত একটি শাখাগত মাসআলা, যে মাসআলা নিয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

১১২. صوامع وبيع وصلوات ومساجد

এগুলো আসলে কী? এবং এগুলো কখন রক্ষা করতে হয়? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দরকার। তাফসীরের কিতাবাদিতে বিষয়টি এভাবে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম পূর্ববর্তী প্রত্যেক যামানায় যে ইবাদতখানাগুলো ছিল সেগুলোকে রক্ষা করা হয়েছে মুমিনদের মাধ্যমে কাফেরদেরকে প্রতিহত করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা এভাবে কাফেরদেরকে প্রতিহত করেছেন কারণ, সেসব ইবাদতখানায় যত দিন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হত তত দিন কাফেররা তা ধ্বংস করে দিতে চাইত। তখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিহত করে এসব ইবাদতখানা রক্ষা করেছেন।

এ ঘরগুলোকে যখন আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেছেন তখন এগুলো আল্লাহর দুশমনদের আখড়া ছিল না। এগুলো ছিল খালিস আল্লাহর বান্দাদের ইবাদতের জায়গা। আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই। তাফসীরের কিতাবাদি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে তাফসীরবিদগণ এ আয়াত থেকে এ মাসআলাও উদ্ঘাটন করেছেন যে, ইসলাম পরবর্তীতে দারুল ইসলামে যদি যিম্মীদের কোন ইবাদতখানা থাকে তাহলে তা রক্ষা করার দায়িত্বও মুসলমানদের উপর ন্যস্ত থাকবে। আর এ মাসআলা একান্তই দারুল ইসলামের, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে শতভাগ ইসলামী আইনে, আর কাফেররা সেখানে থাকবে মুসলমানদেরকে কর দিয়ে। আর সে কর আয়কর নয়। এ কর হচ্ছে অমুসলিম হওয়ার অপরাধে হীনতার সাথে যে কর আদায় করার হুকুম কুরআনে দেয়া হয়েছে। নিজের কল্পনাপ্রসূত কিছু এখানে উদ্দেশ্য নয়।

এবার দেখুন তাফসীরবিদগণের তাফসীরের কিছু নমুনা-

দেখুন তাফসীরে কাশশাফ-

دفع الله بعض الناس ببعض: **إظهاره وتسليطه المسلمين منهم على الكافرين بالمجاهدة**، ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم، وعلى متعبداتهم فهدموها، ولم يتركوا للنصارى بيعا، ولا لرهبانهم صوامع، ولا لليهود صلوات، ولا للمسلمين مساجد. (**الكشاف للزمخشري**).

দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর:

وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود، وهي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. (**تفسير ابن كثير**).

দেখুন, তাফসীরে রূহুল মাআনী:

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ، تحريض على القتال المأذون فيه بإفادة أنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم فكأنه لما قيل أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ إلخ قيل فليقاتل المؤمنون فلولا القتال وتسليط الله تعالى المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان لهدمت متعبداتهم ولذهبوا شذر مذر. (**تفسير روح المعاني للآلوسي**).

দেখুন, আহকামুল কুরআন জাসসাস-

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ فِي أَيَّامِ شَرِيعَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِيَعٌ فِي أَيَّامِ شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَسَاجِدُ فِي أَيَّامِ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (**أحكام القرآن للجصاص**).

১১৩. ‘মন্দির অগ্নি উপাসকদের’

এখানে আনুবাদটি সঠিক করা হয়নি। দেখুন তাফসীরে ওসমানী। তাফসীরে ওসমানীতে আয়াতটির তরজমা এভাবে করা হয়েছে-

‘আর যদি আল্লাহ মানুষের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হত- (রাহেবদের) খানকাহ, গীর্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ যেগুলিতে আল্লাহর নাম অধিক

পরিমাণে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করবে; নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী'। (সূরা হজ্জ ৪০)

১১৪. لأن هؤلاء في مأمن المسلمين

কোন কাফের মুসলমানদের নিরাপত্তার অধীনে থাকার অর্থ হচ্ছে তারা মুসলমানদের আশ্রয়ে থাকা। বর্তমানে যে ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে সেখানে কে কার অধীনে আছে? যেসব এলাকার জন্য এ মাসআলার উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে সেসব এলাকার কাফেররা কি এ কথা মানতে প্রস্তুত আছে যে, তারা মুসলামানদের আশ্রয়ে আছে? যেসব দেশে মুসলমান-কাফেরদের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে সমান বলে, যেসব দেশে কুফরী আইন চলবে এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেছে, যেসব দেশে ইসলামী আইন চলবে না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেছে সেসব দেশে কাফেররা মুসলমানদের নিরাপত্তার অধীনে থাকার মানে কী? যেসব দেশে মুসলমানরা কাফেরদের করুনার ভিখারী সেসব দেশের কাফেরদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা এবং ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ বক্তব্যকে উল্লেখ করা শরীয়ত নিয়ে তামাশা করা ছাড়া আর কি হতে পারে?

১১৫. المنع من هدم كنائس أهل الذمة

পাঠক কষ্ট করে তাফসীরে কুরতবীর বক্তব্যটুকু আরেকটু বিস্তারিত দেখুন-

(وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) أَيْ لَوْلَا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قِتَالِ الْأَعْدَاءِ، لَاسْتَوْلَى أَهْلُ الشِّرْكِ وَعَطَّلُوا مَا بَيَّنَتْهُ أَرْبَابُ الدِّيَانَاتِ مِنْ مَوَاضِعِ الْعِبَادَاتِ، وَلَكِنَّهُ دَفَعَ بِأَنْ أَوْجَبَ الْقِتَالَ لِيَتَفَرَّغَ أَهْلُ الدِّينِ لِلْعِبَادَةِ.

فَالْجِهَادُ أَمْرٌ مُتَقَدِّمٌ فِي الْأُمَمِ، وَبِهِ صَلَحَتِ الشَّرَائِعُ وَاجْتَمَعَتِ الْمُتَعَبَّدَاتُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أُذِنَ فِي الْقِتَالِ، فَلْيُقَاتِلِ الْمُؤْمِنُونَ. ثُمَّ قَوِيَ هَذَا الامر في القتال بقوله: "وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ" الْآيَةَ، أَيْ لَوْلَا الْقِتَالُ وَالْجِهَادُ لَتَغَلَّبَ عَلَى الْحَقِّ فِي كُلِّ أُمَّةٍ. فَمَنِ اسْتَبْشَعَ مِنَ النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ الْجِهَادَ فَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَذْهَبِهِ، إِذْ لَوْلَا الْقِتَالُ لَمَا بَقِيَ الدِّينُ الَّذِي يُذَبُّ عَنْهُ. وَأَيْضًا هَذِهِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي اتُّخِذَتْ قَبْلَ تَحْرِيفِهِمْ وَتَبْدِيلِهِمْ، وَقَبْلَ نَسْخِ تِلْكَ الْمِلَلِ بِالْإِسْلَامِ إِنَّمَا ذُكِرَتْ لِهَذَا الْمَعْنَى، أَيْ لَوْلَا هَذَا الدَّفْعُ لَهُدِّمَ فِي زَمَنِ مُوسَى الْكَنَائِسُ، وَفِي

زَمَنِ عِيسَى الصَّوَامِعُ وَالْبِيَعُ، وَفِي زَمَنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَسَاجِدُ. (لَهُدِّمَتْ) مِنْ هَدَّمْتُ الْبِنَاءَ أَيْ نَقَضْتُهُ فَانْهَدَمَ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: هَذَا أَصْوَبُ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ.

এরপর তিনি বলেন-

الْخَامِسَةُ- قال بن خُوَيْزِ مَنْدَادَ: تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْمَنْعَ مِنْ هَدْمِ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبِيَعِهِمْ وَبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ، وَلَا يُتْرَكُونَ أَنْ يُحْدِثُوا مَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَزِيدُونَ فِي الْبُنْيَانِ لَا سَعَةً وَلَا ارْتِفَاعًا، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَلَا يُصَلُّوا فِيهَا، وَمَتَى أَحْدَثُوا زِيَادَةً وَجَبَ نَقْضُهَا. وَيُنْقَضُ مَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ مِنَ البيع والكنائس. وإنما لم ينقض مَا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّهَا جَرَتْ مَجْرَى بُيُوتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمُ الَّتِي عَاهَدُوا عَلَيْهَا فِي الصِّيَانَةِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنُوا مِنَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِظْهَارَ أَسْبَابِ الْكُفْرِ.

কুরতুবী রহ. এর এ বিস্তারিত আলোচনার পর পাঠকের কি এখনো বুঝতে বাকি রয়ে গেছে যে, এ বিধান শুধুমাত্র দারুল ইসলামের জন্য, যেখানে শতভাগ ইসলামী আইনের অধীনে দেশ পরিচালিত হয়? কিন্তু দারুল হরব, যেখানে অমুসলিমরা মুসলমানদের মসজিদের মিনারার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মঠ ও গীর্জার মাথা উঁচু করে চলেছে এবং মুসলমানদের এ বিষয়ে কোন কিছু বলার অধিকার নেই, সেখানে অমুসলিমদের উপাসনালয় ভাঙ্গার ব্যাপারে কুরতুবী রহ. কি বলেছেন?

তিনি যে বলেছেন

وَمَتَى أَحْدَثُوا زِيَادَةً وَجَبَ نَقْضُهَا. وَيُنْقَضُ مَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ مِنَ البيع والكنائس.

এর প্রয়োগ কোথায় হবে?

যে দেশে একাত্তর (৭১) ফুট উঁচু মূর্তি মুসলমানদের মাথার উপর তৈরি করা হয় সে দেশে এ বিধান প্রয়োগের পদ্ধতি কী? কুরতুবী রহ. এমন দেশের ব্যাপারেই এ বিধান বলেছেন? যে দেশে হিন্দুরা প্রধান বিচারপতি সে দেশে হিন্দুরা যিম্মী -এর একটা উদ্ধৃতি বের করা দরকার। যে দেশের অমুসলিমরা দেশের ভাগ্যনির্ধারণকারী সে দেশের অমুসলিমরা যিম্মী এর একটি উদ্ধৃতি দরকার। যে দেশে অমুসলিমরা আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে, বিচারপতি হওয়ার অধিকার রাখে, রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিকার রাখে সে দেশের অমুসলিমরা যিম্মী -এর একটি একটি উদাহরণ দরকার।

পাঠক একটু ভাবুন, একটু দেখুন। একটু পরে দারুল হরব, দারুল ইসলাম, যিম্মী ইত্যাদি নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ একটু বিস্তরিত আলোচনা করব।

১১৬. لهدمها الآن المشركون لولا دفع الله بالمؤمنين

মাওয়ারদী রহ. এ কথাইতো বলেছেন যে, মুসলমানদের দ্বারা যদি মুশরিকদেরকে প্রতিহত না করা হত তাহলে মুশরিকরা মুসলমানদের মসজিদগুলো ধ্বংস করে ফেলত। সামনে গিয়ে তিনি বলেছেন, এভাবে প্রত্যেক যামানায় যদি মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে প্রতিহত না করত তাহলে অমুসলিমরা সেসব ঘর ধ্বংস করে ফেলত যেসব ঘরে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হত। এখানে মাওয়ারদী রহ. এর বক্তব্যের কোন অংশটি একলক্ষ সাহেবের পক্ষে দলিল?

মাওয়ারদী রহ. এর বক্তব্যটি এই-

{وَمَسَاجِدُ} المسلمين، ثم فيه قولان: أحدهما: لهدمها الآن المشركون لولا دفع الله بالمسلمين، وهو معنى قول الضحاك. والثاني: لهدمت صوامع في أيام شريعة موسى، وبيع في أيام شريعة عيسى ومساجد في أيام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الزجاج، فكان المراد بهدم كل شريعة، الموضع الذي يعبد الله فيه.

যার দ্বারা কখনো ঐ ঘর উদ্দেশ্য নয় যে ঘরে আল্লাহর দুশমনরা বদমাশী করে এবং আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মাওয়ারদী রহ. তাঁর বক্তব্যে একথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যুগে যুগে আমুসলিমদের হাত থেকে মুসলমানের ইবাদতখানা রক্ষা করার যিম্মাদারী আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে দিয়েছেন। নাস্তিকদের মদের আড্ডাখানা, পতিতালয় রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলমানদেরকে দেয়া হয়নি।

১১৭. 'কেননা এগুলো মুসলমানদের নিরাপত্তাধীন'

একটি খুব সহজ সরল স্বাভাবিক প্রশ্ন। যে পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে এবং মুসলমানদের মসজিদ মাদরাসাকে নিরাপত্তার দায়িত্ব কারো উপর নেই, সে পৃথিবীতে অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলো রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর কেন এসে পড়ল? যখন অমুসলিমদের উপসনালয় ভেঙ্গে ফেলার হুকুমও রয়েছে তখন কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়া মুসলমানদের উপর অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলো রক্ষা করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

১১৮. ‘বিজীতদের উপাসনালয়’

এ বিষয়ে কুরতুবী রহ. এর পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যটি ১১৫ নম্বর টীকায় আমরা বিস্তারিত দেখেছি, যার দ্বারা তাঁর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য আমাদের সামনে আশা করি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপরও এখানে যে কথাটি আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি তা হচ্ছে ‘বিজীতদের উপাসনালয়’ বাক্যটি। বিজীত কাকে বলে? মুসলমানরা কাফেরদের উপর হামলা করবে, কাফেররা বিজীত হবে, মুসলমানরা জয়ী হবে, এরপর বিজীত কাফেরদের উপাসনালয়কে কী করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা।

কিন্তু একলক্ষ সাহেবের ফাতওয়ায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফেরদে উপর হামলা করা হারাম, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। কাফেরদেরকে বিজীত করা সন্ত্রাসী কাজ। হামলা করে মুসলমানরা জয়ী হওয়া সন্ত্রাসী কাজ। সকল অমুসলিমের সঙ্গে সহাবস্থান, সৌহার্দ্য, ভালোবাসা রাখার পরিপন্থী কাজ। কিন্তু এতগুলো নাজায়েয কাজের পর বিজীতদের উপাসনালয় রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর আসার পদ্ধতি কী? অমুসলিমদের যেসব উপসনালয় রক্ষার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর চাপানো হচ্ছে, সেগুলোর কোনটি কোনটি বিজীত অমুসলিমদের উপাসনালয়?
মুসলমানদের কি এখনো বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার সময় হয়নি?

১১৯. ‘মুশরিকরা তা ধ্বংস করত’

তাহলে কী বোঝা গেল? কোন ঘরকে অমুসলিমরা ধ্বংস করতে চাইবে? আর এরই বিপরীত তাদের হাত থেকে মুসলমানরা কোন ঘরকে রক্ষা করবে? অমুসলিমদের ঘরগুলো অমুসলিমদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়ীত্ব শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মাথায় আসল? মাওয়ারদী রহ. কি এ কথাই বলতে চেয়েছেন? বিষয়গুলো গভীরভাবে গবেষণা করার মত। অপব্যাখ্যার দরজাগুলো বন্ধ করার জন্য সবাই সচেতন হওয়া দরকার।

১২০. لو ظهر في أرضهم وجعلهم ذمة

পাঠক একটু দেখুন, কোন অমুসলিমকে যিম্মী বানানোর আগেও কিছু কথা শরহুস সিয়ারের এ বক্তব্যটিতে আছে কি না? শরহুস সিয়ারের যতটুকু ইবারত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্বাপর না দেখেও শুধু এতটুকু ইবারতের দিকে লক্ষ করলে আমরা বুঝতে পারি কি না যে, কোন অমুসলিম যিম্মী

হওয়ার আগের পর্বটি হচ্ছে অমুসলিমের উপর মুসলমানের বিজয় অর্জিত হওয়া। এখন আমরা যাদের ক্ষেত্রে যিম্মী শব্দ ব্যবহার করছি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুসলমানরা কবে কোথায় বিজয় লাভ করেছে? এবং বিজয় লাভ করে তাদেরকে যিম্মী বানিয়েছে। জ্ঞানপাপীদের এ দাজ্জালীগুলো কি এতই অস্পষ্ট যে, কোন আলেমকে বা কোন মুফতীকে বিষয়গুলো খুলে খুলে বোঝাতে হবে? এ কথাগুলো বোঝার জন্য কত পরিমাণ অধ্যয়ন দরকার এবং কত বড় আল্লামা হওয়া দরকার?!

১২১. 'তাদেরকে যিম্মীরূপে গ্রহণ করে'

কোন অমুসলিমকে যিম্মীরূপে গ্রহণ করার পদ্ধতি কী? একজন অমুসলিম কখন যিম্মী হয়? একজন অমুসলিমকে যিম্মী হিসাবে গ্রহণ করার যে পদ্ধতি কুরআন, হাদীস, ফিকহ থেকে আমরা পাই এবং যে বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই তা হচ্ছে, মুজাহিদদের কোন কাফেলা যখন কাফেরদের উপর হামলা করতে যাবে তখন তাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেয়া। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তাহলে দাওয়াত দানকারী মুজাহিদদের যে মাকাম ও মর্যাদা দাওয়াত গ্রহণকারী এ নতুন মুসলমানদেরও একই মাকাম ও মর্যাদা। আর যদি তারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ না করে তাহলে তারা অমুসলিম থাকার অপরাধে মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট হারে কর দিয়ে নিজের ভিটা বাড়িতে থাকার অধিকার পাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে যিম্মী। আর যদি তারা কর দিতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের উপর হামলা করা হবে। এর পরিণতিতে কেউ নিহত হবে, কেউ গোলাম-বাঁদী হবে। মুসলমান না হয়ে নিহত হওয়া বা গোলাম-বাঁদী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে কর দিয়ে যিম্মী হওয়া।

এ পর্যায়ে একটু চিন্তা করুন। অমুসলিমদের সঙ্গে সহাবস্থান এবং তাদের সঙ্গে যেভাবে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে যিম্মীর কী সম্পর্ক? যিম্মী বানানোর পদ্ধতিতো হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণ না করলে হাতে তরবারী নিয়ে অমুসলিমদেরকে কর দিতে বাধ্য করা। কিন্তু একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতেতো এসবই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলা হচ্ছে তাকে উপেক্ষা করে অমুসলিমদেরকে যিম্মীরূপে গ্রহণ করার পদ্ধতি কী?

আরেকটি প্রশ্ন, আমরা যাদেরকে যিম্মী বলে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি এবং শরীয়তের বিচারেও তাদেরকে যিম্মী বলার চেষ্টা করছি তারা কি এ কথা মানতে রাযি আছে? কোন অমুসলিম কি এ কথা মানতে রাযি আছে যে, এ দেশে সে যিম্মী হিসাবে বসবাস করে? তাহলে আমাদের এসব কথার মানে কী?

১২২. ومن مقتضيات عقد الذمة

আকদে যিম্মা বা যিম্মা চুক্তির দাবি কী কী তার ফিরিস্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু যিম্মী কাকে বলে? এ পৃথিবীতে কারা যিম্মী? এসব বিষয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

যিম্মীরা কীভাবে থাকতে হবে সে বিষয়েও কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই মিলে দেশ স্বাধীন করেছে, আইন শুধু মুসলমানদের কুরআন অনুযায়ী হবে কেন -এমন প্রশ্ন যাদের তারা কিভাবে অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের কাছে যিম্মী বলে দাবি করতে পারে? যিম্মী যদি শরীয়তের কোন পরিভাষা হয়ে থাকে তাহলে শরীয়তের বিচারেই তার সংজ্ঞা দিতে হবে। শরীয়তের বিচারে তার দাবি পূরণ করতে হলে শরীয়তের বিচারে যে যিম্মী তাকেই যিম্মী বলতে হবে। পিঠে বোঝা দিতে গেলে আমি পাখি, আর উড়তে বললে আমি উট -এভাবে আর কত কাল চলবে? কত কাল চালানো যাবে?

১২৩. 'যিম্মিচুক্তির দাবি হল'

যিম্মীচুক্তির দাবি পুরা করার আগে যিম্মীচুক্তি হতে হবে কি না? চুক্তি ছাড়াই দাবিগুলো পুরা করার পদ্ধতি কী? কেউ যদি বিয়ে করা ব্যতীতই বিয়ের পরবর্তী আমলগুলো শুরু করে তাহলে তার জন্য শরীয়তে কী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আগে দিতে হবে; যিম্মীচুক্তি হয়েছে কি না? কারা কাদের সঙ্গে যিম্মীচুক্তি করেছে? সে চুক্তির ভিত্তিতে কর আদায় করা হচ্ছে কি না? ফিকহের কিতাবাদির আলোকে যিম্মীদেরকে সীমারেখা তৈরি করে দেয়া হয়েছে কি না? যিম্মীরা সে সীমারেখা মেনে চলছে কি না?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রয়োজনবোধ না করে যিম্মীদের দাবি পূরণের জন্য এত তোড়জোড়ের মানেটা কী? লক্ষণ কী? কোন দিকে উঁকি দেয়?

১২৪. الأصل لأي أهل الذمة

বড় আক্ষেপের বিষয়, যিম্মীচুক্তির দাবি ও ফলাফল এতভাবে এতবার বুঝে আসে, কিন্তু যিম্মীচুক্তিটা কেন বুঝে আসে না। যিম্মীর অধিকার প্রমাণিত করার জন্য এতগুলো কালি ও পৃষ্ঠা ব্যয় করা হল, কিন্তু যিম্মী কাকে বলে তার জন্য দু'টি শব্দ ব্যয় হলে এমন কি বেশি খরচ হয়ে যেত। তাহলে এ বিষয়ে কি আমরা সামান্য কথা বলব?

১২৫.'যিম্মীকে মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিককে'

এভাবেই সুবিধাজনক দাজ্জালী শব্দ দিয়ে শরীয়তের পরিভাষাকে বিকৃত করে ফেলা হয়। যিম্মী ফিকহে ইসলামীর একটি পরিভাষা যার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, নিজস্ব পরিচয় আছে। কিন্তু 'মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক' বলে যিম্মীর অর্থ করে সাধারণ পাঠকদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেয়া হয়েছে যে, যিম্মী পরিভাষাটি সম্পর্কে আর কোন খোঁজ খবর নেয়ার দরকার নেই।

আরো দেখুন, যে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে এ ইবারতটি উল্লেখ করা হয়েছে সে কিতাবে শুধু 'আহলে যিম্মা' শব্দটি আছে। এর কোন ব্যাখ্যা সেখানে নেই। এ অনুবাদক নিজের মত করে এর ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং নিজের কথাটিকে বন্ধনি দিয়ে চিহ্নিত করারও প্রয়োজনবোধ করেনি। কারণ তার ধারণামতে পাঠকরা সবাই হচ্ছে গণ্ডমূর্খ। যা চালিয়ে দেয়া হবে তাই চলবে।

যিম্মাচুক্তি

বিষয়টি যখন এতদূর গড়িয়েই গেছে তখন এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলা দরকার। প্রয়োজনে একটু বিস্তারিতই বলা যেতে পারে। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক। শুরুতে যিম্মা শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ দেখা যেতে পারে।

أَهْل الذِّمَّةِ، التَّعْرِيفُ:- الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ: الأَمَانُ وَالْعَهْدُ، فَأَهْل الذِّمَّةِ أَهْل الْعَهْدِ، وَالذِّمِّيُّ: هُوَ الْمُعَاهَدُ. (المصباح المنير ولسان العرب والقاموس مادة: "ذمم").

-وَالْمُرَادُ بِأَهْل الذِّمَّةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ الذِّمِّيُّونَ، وَالذِّمِّيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الذِّمَّةِ، أَيِ الْعَهْدِ مِنَ الإِمَامِ -أَوْ مِمَّنْ يَنُوبُ عَنْهُ- بِالأَمْنِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَظِيرَ الْتِزَامِهِ الْجِزْيَةَ وَنُفُوذَ

أَحْكَامِ الإِسْلاَمِ. **جواهر الإكليل ١/ ١٠٥، وكشاف القناع ٣/ ١١٦، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/ ٤٧٥).**

وَتَحْصُل الذِّمَّةُ لِأَهْل الْكِتَابِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ بِالْعَقْدِ أَوِ الْقَرَائِنِ أَوِ التَّبَعِيَّةِ، فَيَقَرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ فِي مُقَابِل الْجِزْيَةِ،

ج - أَهْل الْحَرْبِ:

- الْمُرَادُ بِأَهْل الْحَرْبِ: الْكُفَّارُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ امْتَنَعُوا عَنْ قَبُول دَعْوَةِ الإِسْلاَمِ، وَلَمْ يُعْقَدْ لَهُمْ عَقْدُ ذِمَّةٍ وَلاَ أَمَانٍ، وَيَقْطُنُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لاَ تُطَبَّقُ فِيهَا أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ. فَهُمْ أَعْدَاءُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُعْلَنُ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كُل عَامٍ. **(فتح القدير ٥/ ١٩٥، والبدائع ٧/ ١٠٠، والشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٦٧، ٢٧٢، والمهذب ٢/ ١٨٨، والمغني ٨/ ٣٥٢).** وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِهِ.

مَا يَكُونُ بِهِ غَيْرُ الْمُسْلِمِ ذِمِّيًّا:

- يَصِيرُ غَيْرُ الْمُسْلِمِ ذِمِّيًّا بِالْعَقْدِ، أَوْ بِقَرَائِنَ مُعَيَّنَةٍ تَدُل عَلَى رِضَاهُ بِالذِّمَّةِ، أَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ لِغَيْرِهِ، أَوْ بِالْغَلَبَةِ وَالْفَتْحِ.

وَفِيمَا يَأْتِي تَفْصِيل هَذِهِ الْحَالاَتِ:

أَوَّلاً - عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- عَقْدُ الذِّمَّةِ: إِقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِ بِشَرْطِ بَذْل الْجِزْيَةِ وَالْتِزَام أَحْكَامِ الإِسْلاَمِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ: أَنْ يَتْرُكَ الذِّمِّيُّ الْقِتَال، مَعَ احْتِمَال دُخُولِهِ الإِسْلاَمَ عَنْ طَرِيقِ مُخَالَطَتِهِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَوُقُوفِهِ عَلَى مَحَاسِنِ الدِّينِ. فَكَانَ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الإِسْلاَمِ، لاَ لِلرَّغْبَةِ أَوِ الطَّمَعِ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ. **(البدائع ٧/ ١١١، وابن عابدين ٣/ ٢٧٥، وكشاف القناع ٣/ ١١٦، والخرشي ٣/ ١٤٣، والحطاب ٣/ ٢٨١، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٢).**

وَيَنْعَقِدُ هَذَا الْعَقْدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِاللَّفْظِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَلاَ تُشْتَرَطُ كِتَابَتُهُ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ، وَمَعَ هَذَا فَكِتَابَةُ الْعَقْدِ أَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ لِأَجْلِ الإِثْبَاتِ، وَدَفْعًا لِمَضَرَّةِ الإِنْكَارِ وَالْجُحُودِ. **مغني المحتاج ٣٥٤٠٥، والمغني ٦٤٥٠٩، وتاريخ الطبري ٣٣٩٠٦، والأموال لأبي عبيد ٩٨، والمهذب ٣٦٥٠٣، والأحكام السلطانية للماوردي ٢٥٦، والبدائع ٢٢١٠٨).**

উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে যে কয়েকটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে যথাক্রমে: ১. যিম্মাচুক্তি হবে মুসলিম খলিফা ও কাফেরদের মাঝে। ২. অমুসলিমরা অমুসলিম হওয়ার করণে মুসলিম খলিফাকে কর দিতে বাধ্য থাকবে। ৩. আইন কানুন ইসলাম অনুযায়ী চলবে। ৪. ইসলামী আইনের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকবে। ৫. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কোন হাত থাকবে না। ৬. যিম্মীর ধারণা একমাত্র দারুল ইসলামে সম্ভব যা শত ভাগ ইসলামী আইনের আওতাধীন থাকবে। ৭. যে অমুসলিমদের সঙ্গে যিম্মাচুক্তি হবে না তারা হরবী, তারা মুসলমানদের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।

দারুল ইসলাম

যিম্মাচুক্তির উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যিম্মীর অস্তিত্ব ধারণা করা যায় শুধুমাত্র দারুল ইসলামে। দারুল হরবে কখনো অমুসলিমরা যিম্মী হয় না। এ কারণে যেসব দেশের অমুসলিমদেরকে আমরা যিম্মী বলে তাদের ক্ষেত্রে যিম্মীর জন্য সুবিধাজনক বিধিগুলো কার্যকর করার চেষ্টা করছি, সে দেশগুলো আসলে দারুল ইসলাম কি না তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার।

দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের সংজ্ঞা নিয়ে আমাদের ভারত উপমহাদেশে যে সমস্যাটি চলছে তা খুব বেশি পুরাতন নয়। কিন্তু বৃটিশ কাফেরদের আধিপত্য এবং তৎপরবর্তী ধারাবাহিক কুফরী শক্তি ও কুফরী আইনের আধিপত্যের কারণে আমরা স্বাধীন মনোভাব নিয়ে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের সংজ্ঞা দিতে পারিনি। এর মাঝে আরেক মাত্রা যোগ করেছে কুফরের দাজ্জালী পদ্ধতি। যার গোলক ধাঁধাঁয় আমরা হাবুডুবু খেয়েই চলেছি।

এরই বিপরীত আমাদের আকাবিরে উম্মতের মধ্যে যাঁরা কুফরী শক্তি ও কুফরী আইনের প্রভাবমুক্ত ছিলেন, কুফরী শক্তি ও কুফরী আইনকে ভয় করেননি, কুফরী শক্তিকে উপেক্ষা করে গেছেন, কুফরী বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং যাঁরা ইসলামী হুকুমত, ইসলামী খেলাফত, ইসলামী আদালত দেখেছেন তাঁরা দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের সংজ্ঞা করতে গিয়ে কোন প্রকার দ্বিধায় পড়েননি। **এ পর্যায়ে দারুল ইসলাম ও দারুল হরব বিষয়ক ছোট্ট একটি রিসালা আমাদের কাছে রয়েছে। এখানে তুলে দিচ্ছি। রিসালাটি আরবী ভাষায়। আহলে ইলমগণ রিসালাটির উপর একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাওয়ার কথা। এরপরও সাধারণ পাঠকদের জন্য এর সারকথাটুকুও আমরা বাংলায় তুলে দেব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে রিসালাটি উল্লেখ করছি।**

دار الإسلام ودار الحرب

بسم الله الرحمن الرحيم

المبسوط للسرخسي:

والحاصل أن عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط: أحدها: أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني: أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه، ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث: أن يظهروا أحكام الشرك فيها.

وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب؛ لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين، ولكن أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – يعتبر تمام القهر والقوة؛ لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث؛ لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن فذلك دليل عدم تمام القهر منهم. **(كتاب السير باب حكم المرتدين)**.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

[فَصْلٌ فِي بَيَان مَعْنَى الدارين دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْكُفْرِ]

وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فنقول لا بد أولا من معرفة معنى الدارين دار الإسلام ودار الكفر لتعرف الأحكام التي تختلف باختلافهما ومعرفة ذلك مبنية على معرفة ما به تصير الدار دار إسلام أو دار كفر فنقول لا خلاف بين أصحابنا في أن دار

الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، واختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير دار الكفر قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها، وجه قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها والله أعلم

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار الأمان والخوف أولى فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي إلا من الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر، وكذا إلا من الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما مع ما إن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما قلنا وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئمان.

فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر بما قلتم وإن كانت الإضافة لما قلنا لا تصير دار الكفر إلا بما قلنا فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل المعهود إن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله عليه

الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى فزال الشك على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما والله سبحانه وتعالى أعلم

وقياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون وأظهروا فيها أحكام الكفر أو كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة وأظهروا أحكام الشرك هل تصير دار الحرب فهو على ما ذكرنا من الاختلاف فإذا صارت دار الحرب فحكمها إذا ظهرنا عليها وحكم سائر دور الحرب سواء وقد ذكرناه. (**كتاب السير**).

رد المحتار

مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس

(قوله لا تصير دار الإسلام دار حرب إلخ) أي بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد، وتغلبوا على دارهم، ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب، إلا بهذه الشروط الثلاثة. وقالا: بشرط واحد لا غير، وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس. هندية.

...وفي شرح درر البحار، قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام، فمن ظفر من الملاك الأقدمين بشيء من ماله بعينه، فهو له بلا شيء. ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو كافر من مسلم، أو ذمي أخذه بالثمن إن شاء. ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم، أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه إليه أخذه بالقيمة إن شاء. اهـ.
قلت: حاصله أنه لما صار دار حرب صار في حكم ما استولوا عليه في دارهم.

(قوله بإجراء أحكام أهل الشرك) أي على الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام. هندية. وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب ط (قوله وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام. هندية ط.

وظاهره أن البحر ليس فاصلا، بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب، خلافا لما في فتاوى قارئ الهداية.

قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم، وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا. وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها. (قوله بالأمان الأول) أي الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة. هندية ط. (**رد المحتار، كتاب الجهاد، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس**).

جامع الرموز:

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين وكانوا فيه آمنين. (جامع الرموز ٤/ ٥٥٦ نقلا من كتاب الشيخ تقي العثماني حفظه الله ص:٣٢٤).

فهذه نصوص استفاد منها المشايخ تعريف دار الإسلام ودار الحرب كما يلي:

الموسوعة الفقهية الكويتية في حرف الدال:

دَارُ الإْسْلاَمِ، التَّعْرِيفُ:

- دَارُ الإْسْلاَمِ هِيَ: كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الإْسْلاَمِ ظَاهِرَةً (١).

(٢) بدائع الصنائع ٢٤١٠٨-٢٤٢، ابن عابدين ٣٦٤٠٤، المبسوط ٢٢٥٠٢١، كشاف القناع ٥٤٠٤، الإنصاف ٢٣٢٠٥، المدونة ٣٣٠٣.

دَارُ الْحَرْبِ، التَّعْرِيفُ:

- دَارُ الْحَرْبِ: هِيَ كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً (١).

(٢) بدائع الصنائع ٤١٠٨-٤٢، كشاف القناع ٥٤٠٤، الإنصاف ٢٣٢٠٥، المدونة ٣٣٠٣.

المجلد الثاني عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع –الرياض، كتاب الجهاد والحسبة، كتاب الجهاد وما يتعلق به، فصل الهجرة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٧٤٦)

س١: ماالشروط الواجب توفرها في بلدحتى تكون دارحرب أوداركفر؟

ج١: كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونا لهم على إقامة شؤون الدولة، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها، وألا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية، تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح؛ فإنها صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن كانت دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها.

وكل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن يهاجروا منها، فرارا بدينهم من الفتن، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شرح السير الكبير للسرخسي

﴿بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الْخَشَبِ وَمَا يُصَابُ مِنَ الْمِلْحِ وَغَيْرِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ﴾

٢٣٥٧- وَإِذَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِقَطْعِ الشَّجَرِ فَوَصَلُوا إِلَى مَكَانٍ يَخَافُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ قَطَعُوا الْخَشَبَ وَجَاءُوا بِهِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يُخَمَّسُ. لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنْ يَأْمَنَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ.

فَإِنْ قِيلَ: كَمَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْمَنُونَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَكَذَلِكَ أَهْلُ الْحَرْبِ لَا يَأْمَنُونَ فِيهِ. قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْبِقَاعَ كَانَتْ فِي يَدِ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَلَا تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِانْقِطَاعِ يَدِ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ مَا كَانَ ثَابِتًا فَإِنَّهُ يَبْقَى بِبَقَاءِ بَعْضِ آثَارِهِ، وَلَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِاعْتِرَاضِ مَعْنًى هُوَ مِثْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْخَشَبِ يَكُونُ فِي يَدِ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَهَذَا مَالٌ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ، وَهُوَ الْغَنِيمَةُ بِعَيْنِهِ. (أبواب الأنفال).

وهذا نص استفاد منه الشيخ المفتي تقي العثماني تعريف دار الإسلام ودار الحرب كما يلي:

فَإِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِينَ،

فعندنا فيه ملاحظات نقدمها إليكم:

١. السرخسي رحمه الله لم يعرف دار الإسلام ولا دار الحرب في هذا الموضع من كتابه "شرح السير الكبير" الذي أخذ منه الشيخ تقي العثماني تعريف دار الإسلام وتعريف دار الحرب، بل ذكره كوصف من أوصاف دار الإسلام ودار الحرب.

وبالعكس إنه عرف دار الإسلام ودار الحرب في كتابه "المبسوط" في ذلك الموضع الذي أخذ منه المشايخ تعريف دار الإسلام ودار الحرب. والسرخسي قد أطال البحث في تعريفهما وذكر اختلاف الأئمة فيه، وأشار إلى علة كون الدار للإسلام أو الحرب، وذكر

التوفيق بين قولي أبي حنيفة والصاحبين. ولكن الشيخ تقي العثماني حفظه الله لم يلتفت إليه ولم يشر إليه أيضا. وليس هذا من عادته الشريفة كما نعرفه.

٢. ما المراد بقوله "تحت يد المسلمين"؟ تحت يد حاكم مسلم، أو تحت يد قانون الإسلام، أو أفراد البلاد مسلمون؟

إن كان المراد تحت حاكم مسلم، فمراده هذا يرده ما قاله الشيخ بعد صفحات من نفس الكتاب أن الحاكم لو ظهر منه الكفر بواحا لا يكون دار الإسلام دار حرب. **هو يقول:**

مثلا یہ غالب گمان ہو کہ اس کو ہٹانے کے بعد بھی طالبان اقتدار کے درمیان جنگ جاری رہے گی، اور کسی ایک شخص پر متفق نہیں ہو سکیں گی، اور تمام تر جد جھد کے بعد عوام کو مسلسل خونریزی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، یا اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی دشمن ملک چڑھائی کر کے ملک پر قبضہ کر لے گا، اور ابھی تک تو صرف امیر ہی کافر تھا، اب پورا ملک (معاذاللہ) دار الاسلام کی حیثیت کھو بیٹھے گا، اور دشمن ملک کے تسلط سے دار الکفر میں تبدیل ہو جائے گا. (اسلام اور سیاسی نظریات ص :٣٦٥-٣٦٦)

قلت: ونستفيد من قوله هذا أن الحاكم كافر والقانون كفري ولكن الدار دار إسلام، ولا يجوز الخروج عليه للمسلمين مخافة الفتنة، فالحالة مستمرة، ولابد، فما هو المخلص، وما هي الفتنة؟ القتل أشد فتنة أم الكفر والشرك أشد فتنة؟

هذا أمر. وأمر آخر أن القانون كفري، القانون مجموعة من شرائع شتى ومن والآراء المحضة، والمقنن هو الحاكم وأطرافه، ولا يلتفت عضو واحد من أعضاء المقننين إلى أن القانون المقترح يخالف الشريعة أم لا، ولو يعلم أن القانون المقترح يخالف الشريعة فعلمه هذا لا يؤثر في وضع القانون المخالف للشريعة. فإذا كان الأمر هذا فكيف يمكن أن يكون القانون غير شرعي والحاكم عليه مسلم؟

وهنا أمر آخر أيضا: أن البلاد التي استقر القانون في دستورها على أن المسلم والكافر يستحق على حد سواء أن يكون رئيسا، و قاضي قضاة، ووزير أعظم، وقضاة، ووزراء،

ومقننا، فما الفرق في مثل هذه البلاد بين كون البلاد تحت يد المسلمين وبين كونها تحت يد الكفار؟

وإن كان المراد بـ"تحت يد المسلمين" تحت يد قانون الإسلام، فلا خلاف فيه.

وإن كان المراد بـ"تحت يد المسلمين" أفراد البلاد مسلمون. فكل بقعة افرادها الكفار لا يمكن أن تكون دار إسلام وإن كان تحت قانون الإسلام، وكذا كل بقعة أفراده مسلمون لا يمكن أن تكون دار حرب وإن كان تحت يد الكفار وقانون الكفر والشرك. ونعلم أن أهل بقعة لو أقروا الجزية ولم يسلموا، فبقعتهم هذه دار إسلام وإن كان السكان كفار مأة في مأة. وكذا لو أسلم قوم في قعر دار الحرب، ثم لم يهاجروا، ولم يقاتلوا، ولم يخالفوا الحكومة الحربية، وأطاعوا الحكومة كل إطاعة فلا يقول أحد أن هذ البقعة دار إسلام، والمسلمون فيها مأة في مأة.

٣. الشيخ المفتي تقي العثماني –حفظه الله– ذكر هذا التعريف "دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين وكانوا فيه آمنين". (جامع الرموز ٤/٥٥٦) من جامع الرموز واستنتج منه أن الحد الفاصل بين دار الإسلام وبين دار الحرب كون الحاكم مسلما أو كافرا، لا حكم الإسلام أو حكم الكفر.

نقول: "يجري فيه حكم إمام المسلمين" لا يمكن أن يكون حكم إمام المسلمين على غير الشريعة الإسلامية، كلمة إمام المسلمين لا تتحمل هذا. من يحكم بغير ما أنزل الله فهو لا يوصف بإمام المسلمين، وإمام المسلمين كلمة اصطلاحية في الشريعة لا يجري في من يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يكمن أن يجري في من اختار العلمانية والديمقراطية والشيوعية والعصبية مصدرا للقانون.كماصرح به الفقهاء والمحدثون سلفا وخلفا، بل صرحوا بوجوب الحكم بالخروج عليه.

وهاهو بعض ماقالوا في هذا الشان:

الخروج على الإمام الذي ظهر منه الكفر البواح وآراء الأئمة فيه :

قال القاضى عياض :"لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة ..... فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عدل أو والي مكانه إن أمكنهم ذلك. وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب فيجب القيام بذلك على الكافر. ولا يجب على المبتدع إذا لم يتخيلوا القدرة عليه، ويجب فى المبتدع إذا تخيلوا القدرة عليه، فإن حققوا العجز عنه فلا يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه". (إكمال المعلم ٦/ ٢٤٧:٢٤٦، دار الوفاء).

قال العلامة المازري في كتابه المعلم شرح صحيح مسلم

"والإمام إذا فسق وجار، فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع واحتجوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة". (المعلم شرح صحيح مسلم ٣/ ٥٣، تحقيق الشاذلي النيفر).

وفي الفتح قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من

السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. (فتح الباري: كتاب الفتن ١٣/ ٩).

قال الإمام القرطبيؒ في كتابه المفهم: "فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا: وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ". (المفهم كتاب الإمارة ٤/ ٣٩، دار إبن كثير).

وفي الفتح "ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه". (فتح الباري: كتاب الفتن ١٣/ ١١، عمدة القاري: كتاب الفتن ٢٤/ ٢٦٧).

قال الإمام القاضي أبو يعلىؒ: "إن حدث منه ما يقدح في دينه نظرت فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة وهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن الملة ووجب قتله". (المعتمد في أصول الدين).

قال الامام النوويؒ: لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام (باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، شرح مسلم للنووي)

وقال العلامة ابن تيميةؒ عن قتال حكومة التتار:

"فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء". (مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٠٣).

قال العلامة الطيبي رح في كتابه الكاشف عن حقائق السنن:

"وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق؛ لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، ولا تنعقد إمامة الفاسق ابتداء. وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذا البدعة. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير في الشرع أو بدعة سقطت طاعته، ووجب على المسلمين خلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، وإلا فيهاجر المسلم عن أرضه إلي غيرها ويفر بدينه". (الكاشف. ص:٢٥٦٠ مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة).

وقال أيضا: قوله: ((ما أقاموا فيكم الصلاة)) فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وأن تركها موجب لنزع اليد من الطاعة، كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن الصامت في قوله: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً)) (الكاشف:٢٥٦٢ مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة).

قال الحافظ ابن كثيرؒ في تفسير قوله تعالى (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (سورة المائدة رقم الآية ٥٠): "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله .... فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكِّم سواه في قليل ولا كثير". (تفسير ابن كثير. ٢/ ٩١٨ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع).

قال الحافظ ابن حجرؒ في شرحه فتح الباري "وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا" فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض". (فتح الباري: ١٣/ ١١٣).

العلامة بدر الدين العيني:

قوله (فليصبر) يعني: فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته، لأن في ذلك حقن الدماء، وتسكين الفتنة. إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه".عمدة القاري.كتاب الفتن.٢٤\ -٢٦٥

قال العلامة الملا علي القاريؒ في المرقاة: "قال (قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم) أي أفلا نعزلهم ولا نطرح عهدهم ولا نحاربهم عند ذلك، أي إذا حصل ما ذكر. قال لا، أي لا تنابذوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، أي مدة إقامتهم الصلاة فيما بينكم، لأنها علامة اجتماع الكلمة في الأمة. قال الطيبي: فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وأن تركها موجب لنزع اليد عن الطاعة، كالكفر على ما سبق في حديث عبادة "إلا أن تروا كفرا بواحا" الحديث". (المرقاة : كتاب الإمارة ٧/ ٢٥٢).

وقال أيضا : والمعنى أنه حينئذ تجوز المنازعة بل يجب عدم المطاوعة. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة ٧/ ٢٢٧).

فيض الباري للكشميري، كتاب الفتن، ٢ باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»

نعم إذا رَأَوْا منه كفرًا بَوَاحًا لا يبقى فيه تأويلٌ، فحينئذٍ يَجِبُ عليهم أن يَخْلَعُوا رِبْقَتَهُ عن أعناقهم، فإنَّ حقَّ اللهَّ أَوْكَدُ. ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلَّا حقًّا في جميع الأبواب، فإذا تعذَّر أخذ الحقِّ في جميع الأبواب -وإن أَمْكَنَ ذهنًا- لا بُدَّ أن يُحَدَّ له حَدٌّ، وهو الإغماضُ في الفروع، فإذا وَصَلَ الأمرُ إلى الأصول حَرُمَ السكوتُ، ووجب الخَلْعُ. وهو معنى قوله: «وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ»، فافهم.

وقال ايضا: وجملةُ الأمر فيه: أن الإِمامَ لو أَمَرَ بالكفر البَوَاحِ، يَجِبُ الخروجُ عليه وخَلْعُه عن الإِمارة. فيض الباري، كتاب الأحكام.

نص العلامة ظفر أحمد العثماني رح

وان كانوا عدولا في الابتداء ثم طرئ عليهم الفسق فقد عرفت من وجوب عزله على المسلمين ان امكنهم فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر دون الفاسق والمبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. اعلاء السنن، ١٢\٦٥٨ ادارة القرآن، كراتشي

اگر امام اور اس کی جماعت سے کفر صریح کا صدور ہو، تو اس کا مقابلہ کرنا اور اس کی جمعیت کو منتشر کرنا بھی جائز ہے؛ بلکہ بقدر استطاعت واجب ہے ۔ (امداد الاحکام. مکتبہ دار العلوم کراتشی ٤/ ٤٨٣).

এ রিসালাটির সারকথা হিসাবে যে কয়েকটি কথা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে এই-

ক. কোন একটি ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার মূল মাপকাঠি হচ্ছে সে ভূখণ্ডটি হুকমে ইলাহী অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া বা না হওয়া। ইসলামী শরীয়তের আইনের অধীনে চললে দেশটি দারুল ইসলাম, আর কুফরী আইনের অধীনে চললে দেশটি দারুল হরব।
খ. এ মতের পক্ষে এখানে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন ইমাম সারাখসী রহ., ইমাম ইবনে নুজাইম রহ., আল্লামা শামী রহ., জামেউর রুমূযের রচয়িতা আল্লামা কুহুসতানী রহ., কুয়েতের আলমাউসূয়াতুল ফিকহিইয়াহ এর পুরো কাফেলা, আললাজনাতুত দাইমাহ এর পুরা কাফেলা।

গ. মুফতী তকী ওসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এ সংজ্ঞার সঙ্গে দ্বিমত করেছেন।

ঘ. মুফতী তকী ওসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম যে উদ্ধৃতির ভিত্তিতে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা করেছেন সে সংজ্ঞায় দেশের আইন ইসলামী হবে না কুফরী হবে তার কোন উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের আয়ত্বাধীন থাকার স্বাভাবিক অর্থই হচ্ছে আইন ইসলামী হবে। তিনি যে, বলেছেন, 'আইন ইসলামী হোক বা কুফরী হোক তা বিবেচ্য বিষয় নয়' এটা একান্তই তাঁর নিজস্ব বুঝ। কিতাবের ইবারতে এমন কথা নেই।

ঙ. সারাখসী রহ. মূলত শরহুস সিয়ারিল কাবীরের এ ইবারত দিয়ে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা করেননি। অন্য একটি মাসআলার প্রসঙ্গে দারুল ইসলামের একটি গুণ বা ওয়াসফ উল্লেখ করেছেন। তিনি মূলত দারুল ইসলামের সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর মাবসূত গ্রন্থে, যার উদ্ধৃতি উপরোক্ত রিসালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

চ. মুফতী তকী ওসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের মতে রাষ্ট্রপ্রধান কাফের হলেও দেশ দারুল ইসলাম থাকবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের আয়ত্বে থাকার দ্বারা তিনি কী উদ্দেশ্য করেছেন?

ছ. মুফতী তকী ওসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় আইন কুফরী, রাষ্ট্রপ্রধান কাফের, এরপরও দেশটি দারুল ইসলাম এবং এ কাফের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র বিদ্রোহের অনুমতিও তিনি দেন না।

এমতাবস্থায় কোন একটি দেশ কখন দারুল হরবে পরিণত হবে? আকাবিরে উম্মতের কৃত সংজ্ঞাগুলো প্রয়োগের কি শেষ পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রই খুঁজে পাওয়া যাবে না? ইসলামের ইতিহাসে এমন দারুল ইসলামের ধারণাই কি আমরা পেয়েছি?

জ. শাহ আব্দুল আযীয রহ. ভারত উপমহাদেশকে দারুল হরব হিসাবে ফাতওয়া দেয়ার পর কবে এ দেশ দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছে?

ঝ. শাহ আব্দুল আযীয রহ. যখন এ দেশকে দারুল হরব ঘোষণা দেন তখনও এ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান ছিল। এরপরও কীভাবে এ দেশ দারুল হরব হয়েছিল?

ঞ. যারা মুফতী তকী ওসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের ফাতওয়ার ভিত্তিতে সারা বিশ্বে দারুল হরবের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছেন না, তারা কি কখনো প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরীণ সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর নিয়েছেন? কাদের সংবিধানের মূলনীতি কী তা কি খতিয়ে দেখা হয়েছে?

ট. যে দেশের সংবিধানের মূল ভিত্তি রাখা হয়েছে চার জন আত্মস্বীকৃত নাস্তিক এবং তাদের কুফরী আইনের উপর সে রাষ্ট্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে, এবং সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে কি আরেকটু ভাবার দরকার ছিল না।

সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে আমাদের নিবেদন, আমরা মাসআলার পর মাসআলা বলে চলেছি। কিন্তু কোন মাসআলার জন্য কোন পর্যায়ের ভিত্তি দরকার তা বিবেচনায় আনার প্রয়োজনবোধ করছি না। ইলমের আমানত কখনো এটাকে সমর্থন করে না। আমরা কখনো নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মাসআলা বলে চলেছি, ইলমের উসূলের তোয়াক্কা করছি না, আবার কেউ অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাবের সামনে ইলমের উসূলকে উপেক্ষা করে চলেছি।

প্রায়ই বলতে শোনা যায়, 'কথা ঠিক আছে, কিন্তু এত বড় কথা উনি বলবেন কেন?'। উনি বলেছেন না তিনি বলেছেন -এটা কি কোন বিবেচনার বিষয় হল? উনি আর তিনি হিসাবে কথা মানতে বলা হয়নি। একটি সঠিক কথার প্রতি যদি কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেয় তাহলে বিষয়টি সঠিক হয়ে থাকলে সে হিসাবে তার বিবেচনা হবে। বেঠিক হয়ে থাকলে যেই বলুক তা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। দলিলের আলোকে বলে থাকলে দলিল বিবেচনায় আনতে

হবে। কোন ছোট ব্যক্তি যদি দলিলের আলোকে সঠিক কথা বলে তাহলে এটা ছোট ব্যক্তির অপরাধ নয় এবং কথাটিও ভুল নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের সঙ্গে মুমিনের উদাহরণ দিয়েছিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলতো সে গাছটি কোনটি? বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। কেউ বলতে পারেননি। কারো মনে আসেনি। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন ছোট বালক। তাঁর মনে সঠিক উত্তরটি এসেছিল। তিনি বড়দের সামনে উত্তরটি দিতে সাহস করেননি। ওমর রাযিয়াল্লাহ আনহু পরে জানতে পেরে বলেছিলেন, তুমি বললে ভালো হত। এ যে সঠিক উত্তরটি বড়দের মনে না এসে একজন ছোট বালকের মনে আসল, এ মনে আসাটা কোন অপরাধ নয় এবং ছোট হওয়ার কারণে যা মনে এসেছে তা ভুল নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়েছেন। বড় বড় অনেক সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। কেউ কিছু বলেননি। যুলইয়াদাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে বসলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে? না কি আপনি ভুলে গেছেন? শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয়েছিল যে, ভুল হয়েছে। বড় বড়দের উপস্থিতিতে যে যুলইয়াদাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভুলে যাওয়াকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এ কাজটি কোন অপরাধ ছিল না। আর ভুলটাও ভুলই ছিল। স্মরণ করিয়ে দেয়াটাই সঠিক ছিল, স্মরণ করিয়ে না দেয়াটা ভুল ছিল। অন্তত রাসূলুল্লাল্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ থেকে এটাই বোঝা গেছে। ছোট ও নগন্য হওয়ার কারণে বিষয়গুলো উল্টে যায়নি। কিন্তু আজ কাল যেন সব উল্টে যাচ্ছে।

আমার মনে হয়, এসব বিষয়ে আমরা কোন বড়কে মেনে চলেছি -বিষয়টি আসলে এমন নয়। আমরা আকাবিরকে মেনে চলেছি -বিষয়টি আমার কাছে এমনও মনে হয় না। আমরা অনেকেই আকাবিরে দেওবন্দের নাম ব্যবহার করে অনেক কথা চালিয়ে দেই। কিন্তু সময় মত আকাবিরে দেওবন্দকে ছুড়ে ফেলে দিতে আমরা একটুও দ্বিধাবোধ করি না। সময়মত আকাবিরে দেওবন্দের বিপরীতে শাওকানী ও আলাবানী রাহিমাহুমাল্লাহকে প্রধান্য দিতে

আমাদের দ্বিধা হয় না, যাঁদেরকে ছোট খাট অনেক মাসআলা নিয়ে বিতর্ক করতে গিয়েও বহু গালাগালি করেছি।

দলিলের বিপরীতে আমরা অন্য কাউকেই প্রধান্য দিচ্ছি না। সে মানসিকতাও আমাদের নেই। কারো প্রতি এত শ্রদ্ধা ভক্তিও আমাদের মনে নেই যে, দলিলের বিপরীতে আমরা তাঁর কথাকে প্রাধান্য দেব। বড়দের উদ্ধৃতি, আকাবিরের হাওয়ালা সবই আমার কাছে কপটতায় মোড়ানো মনে হয়।

আমার মনে হয়, প্রত্যেকে শুধু তার নিজের মনেরই অনুসরণ করে। পরিবেশ পরিস্থিতি হিসাবে যা নিজের জন্য বেশি উপযোগী মনে হয় তাই গ্রহণ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে যাকে পক্ষে পাওয়া যায় তার আড়ালেই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকে। এখানে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা লম্বা করতে চাই না। তবে এমন ঘটনা এখন প্রতি দিনের। বহু ক্ষেত্রে মুফতী তকী ওসমানী সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে জবাব পেয়েছি, তিনি দেওবন্দী আলেম নন, তাই তাঁর কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু যখন তাঁর কথাই নিজের মনের পক্ষে এসেছে, তখন এর উপর আর কারো কলম ধরার অধিকার নেই।

আমরা সবাই যদি এ কথার উপর আসতে পারি যে, কথা দলিলের আলোকেই হবে, তবে দলিল বোঝার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বড়দের সাহায্য নেব। দলিলের বিপরীতে দলিলই আসবে। দলিলের বিপরীতে বড়দেরকে দাঁড় করাব না। এমন করতে পারলে বিতর্কগুলো একটা সহনশীল অবস্থানে এসে যেত। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

১২৬. 'সন্ত্রাসী ও আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ'

এতে কি আইন হাতে তুলে নেয়া হবে না? না কি শুধু ইসলাম বিরোধী কিছু করলে সামাজিকভাবে তার প্রতিরোধ করতে গেলে আইন হাতে তুলে নেয়া হয়? একটি তালিকা দরকার যার মধ্যে উল্লেখ থাকবে, সরকারের বাইরে সামাজিকভাবে কোন কাজ করলে আইন হাতে তুলে নেয়া হবে, আর কোন কাজ করলে আইন হাতে তুলে নেয়া হবে না। সরকারী বাহিনীর বাইরে কোন দলের ছেলেদের হাতে অস্ত্র থাকলে বৈধ হবে, আর কোন দলের ছেলেদের হাতে অস্ত্র থাকলে অবৈধ হবে।

ইসলামের পক্ষ নিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করতে গেলে তা আইন হাতে তুলে নেয়ার দণ্ডে দণ্ডিত হবে। আর ইসলামের বিপক্ষ নিয়ে ইসলামকে

প্রতিরোধ করতে গেলে আইন হাতে তুলে নেয়া হবে না। কাফের ও নাস্তিকদের বিচারেতো এমনই হওয়ার কথা। কিন্তু কোন মুসলমান তাও আবার দ্বীনের ধারক-বাহক হওয়ার দাবিদারদের মুখে এমন কথা কেমন শোনা যায়? মুখোশটা খুলে ফেললেইতো সহজ হত।

১২৭. 'সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ'

সন্ত্রাসী যখন অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাস করে তখন তার প্রতিরোধ নিশ্চয় অস্ত্র দিয়েই করতে হবে। সে ক্ষেত্রে এ অস্ত্র হাতে নেয়া এবং অস্ত্র চালনা করে সন্ত্রাসীকে হত্যা করা এসব কিছুর দ্বারা আইন হাতে তুলে নেয়া হবে কি না? মুরতাদের সর্ব নিম্ন শাস্তি হত্যা। ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃত কোন মুরতাদকে কেউ হত্যা করলে এক লক্ষ সাহেবদের মতে এটা আইন হাতে তুলে নেয়া হয়। আর সন্ত্রাসীর সর্বোচ্চ শাস্তি হত্যা। কিন্তু কাল্পনিক সন্ত্রাসীকে হত্যা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিলে কেন আইন হাতে তুলে নেয়া হবে না? সংশ্লিষ্ট পক্ষ আবার একটু ভেবে দেখবেন।

১২৮. إذا عمل فيهم بالمعاصي ولم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه

তার মানে এখন সারা বিশ্বে ও সারা দেশে একমাত্র গুনাহের কাজ হচ্ছে ইসলামের পক্ষ নিয়ে যারা জিহাদের কাজ করে যাচ্ছে তাদের সকল কর্মকাণ্ড। তাই সবাই মিল সামাজিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে এদের প্রতিরোধে নামতে হবে। এরই বিপরীতে কুরআন হাদীসসহ শরীয়তের সকল কিতাবের উপর তালা লাগিয়ে দিয়ে, শয়তানের কিতাব খুলে দেশ ও বিশ্ব পরিচালনা চলছে। কুকুর-শুয়োরের মত এবং কুকুর বিড়ালের সঙ্গে প্রকাশ্যে অপকর্মের পর্যন্ত বৈধতা দেয়া হয়ে গেছে এবং তা প্রকাশ্যে চলছে। একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে এগুলো গুনাহ নয়, তাই এগুলোর বিরুদ্ধে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ গড়ে তোলার দরকার নেই।

সমকামীতার বৈধতার জন্য যে আন্দোলন করে তার এ আন্দোলন গুনাহ নয়, তাই তার বিরুদ্ধে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধের প্রয়োজন নেই। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, যে এই বদমাশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে তার বিরুদ্ধে!

এক লক্ষ সাহেব যখন খানকাহ থেকে বের হন তখন খানকাহ থেকে শাহবাগ পর্যন্ত এবং শাহবাগ থেকে ট্রাম্পের দস্তরখান পর্যন্ত একটিমাত্র গুনাহ তার

চোখে পড়ে। আর তা হচ্ছে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জিহাদের শিরোনামে বিভিন্ন কার্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এর বিরুদ্ধে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরী মনে করেছেন। এরই বিপরীত তার খানকাহের ভিতরের কথা যদি হিসাবে নাও আনা হয় তবু খানকাহের গেইটের মুখের বিউটি পার্লার ও মেসেজ সেন্টার নামে যে পতিতালয়গুলো রয়েছে সেখানকার অপকর্ম থেকে শুরু করে থার্টিফাস্ট নাইটের যিনার বাজার পর্যন্ত, ঘরের দরজার সামনের বিকাশ কাউন্টার থেকে শুরু করে মতিঝিলের সুদের অট্টালিকা পর্যন্ত, খানকাহের গলির টোকাই লীগ ও টোকাই দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজী থেকে শুরু করে বাদশাহ লীগ ও বাদশাহ দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজী পর্যন্ত, ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কুরআন বিরোধী বিচার থেকে শুরু করে প্রধান হিন্দু বিচারপতির শতভাগ শরীয়ত বিরোধী বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত, খানকাহের পাশের ফ্লাটে বোরকা খোলা থেকে শুরু করে রাজ পথে প্রকাশ্যে জাঙ্গিয়া খোলা পর্যন্ত পশুত্বের সর্বচূড়ান্ত পর্ব -এগুলোর কোনটাই একলক্ষ সাহেবের দৃষ্টিতে গুনাহ নয়!

তাই এগুলোর প্রতিরোধে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যারা এ সকল অপকর্মের প্রতিকারের কথা ভাবছে তাদের বিরুদ্ধে। যারা প্রতিকারের কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে। যারা বদর ওহুদের তরবারী হাতে তোলার কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যারা শতভাগ শরীয়তের আইনের কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে।

ইহুদী-খ্রিস্টানদের আহবার ও রুহবানের পদ্ধতিতে হাদীসের অনুসরণের এ এক নতুন দিগন্ত।

১২৯. 'লোকদের মাঝে যখন গুনাহের কাজ হয় অথচ তারা বাধা দেয় না'

যেহেতু হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী গুনাহের কাজে বাধা না দিলে শাস্তি ব্যাপক করে দেয়া হবে অর্থাৎ যারা গুনাহ করেনি তারাও শাস্তির মধ্যে পড়ে যাবে সে কারণে একলক্ষ সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গুনাহের কাজে বাধা না দিয়ে যারা গুনাহের কাজে বাধা দেয় তাদেরকে বাধা দেবেন, তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। গুনাহের কাজে যারা বাধা দেবে

তাদেরক বিশ্বের সকল বদমাশদের সামনে সন্ত্রাসী হিসাবে তুলে ধরবেন। এ মহৎ কাজের (?) আয়োজন সম্পন্ন।

একজন মুসলমান এ কথাগুলো বুঝবে সে সময় কি এখনো হয়নি? এ হাদীসের উপর আমলের পদ্ধতি আমরা আকাবিরে উম্মতের কাছে কেমন পেয়েছি? আর নাদান উম্মতকে দাজ্জাল এখন কোন দিকে নিয়ে চলেছে? আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

১৩০. 'যত বেশি সংখ্যক হোক, যত শক্তিশালীই হোক'

গুনাহের কাজে বাধা না দিলে, কুফরী কাজে বাধা না দিলে যখন সবার ধ্বংস অনিবার্য তখন কুফরী সংবিধান, কুফরী আইন, শিরক, কুফর, বিদআত, বদমাশী, বাঁদরামী, লাম্পট্য, দালালি, যিন্দিকী, মুনাফিকী, নাস্তিকতা, নাস্তিকদের পক্ষে একাত্বতা, নাস্তিকদের প্রতি ভালোবাসা-সৌহার্দ্য-সহমর্মিতা, নাস্তিকদেরকে কোলে নেয়া এবং তাদের কোলে বসাসহ সকল কুফর ও গুনাহের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। চাই তারা যত শক্তিশালীই হোক। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

১৩১. 'হাত দিয়ে প্রতিহত করা বিচারক এবং দায়িত্বশীলদের'

আর যখন বিচারক, দায়িত্বশীল, আইনশৃংখলা বাহিনী তথা সরকার কুফরের পক্ষ অবলম্বন করে, কুফরী আইন বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে, গুনাহের আদেশ করে, যিনার বৈধতা দেয়, মদের বৈধতা দেয়, বালেগ সন্তানকে বিয়ে দিলে বিচারের সম্মুখীন করে শাস্তির ব্যবস্থা করে, বাল্য বিবাহকে অবৈধ বলে, বাল্য যিনা ও প্রেমকে বৈধ বলে, সম্মতির ভিত্তিতে পরকিয়া যিনাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে না, কিন্তু স্ত্রীর অমতে তার সঙ্গে সঙ্গম করাকে অবৈধ বলে, প্রধান বিচারপতিসহ অসংখ্য বিচারপতি ঘোষিত অমুসিলম ও মুরতাদ হয়, প্রায় অধিকাংশ বিচারপতি অঘোষিত মুরতাদ হয়, যখন আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মানুষের আনুগত্যে বাধ্য করে গুনাহ কুফরীর সকল রাস্তা খুলে দেয়া হয় -তখন এর প্রতিরোধ করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে এর প্রতিরোধের সকল রাস্তা অবলম্ভন করা ফরয।

কিন্তু এ কাজটি করতে গেলেই শয়তান ও শয়তানের সহযোগীরা তাকে সন্ত্রাস বলে প্রচার করে ও ফাতওয়া দেয়।

১৩২. 'হাত দিয়ে প্রতিহত করা বিচারক ও সরকারের কাজ'

যখন বিচারক ও সরকার কাফের হবে বা কুফর ও গুনাহের এজেন্ট হবে তখন আলেম ও মুসলমানরাই বিচারক ও সরকার হবে। আর সরকার থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে সে আর মুসলমানদের সরকার থাকে না। সে জোরপূর্বক থাকতে চাইলে তার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ওয়াজিব।

১৩৩. 'কুরআন হাদীসের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা বই কিছুই নয়'

জঙ্গীরা কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয বিধান হিসাবে প্রমাণ করেছে। এত বড় জঘন্য অপকর্মের দালিলিক প্রতিরোধের জন্য একলক্ষ সাহেব মাত্র দু'তিনটি অনুচ্ছেদ ব্যয় করেছেন। এ কৃপণতা কোনভাবে ক্ষমাযোগ্য হতে পারে না। আচ্ছা, যে আয়াত ও হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা করলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয প্রমাণিত হয় সে আয়াত ও হাদিসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা করলে কী প্রমাণিত হবে?

কিছু আয়াত ও হাদিস এখানে আমরা তুলে দিচ্ছি, আশা করি সঠিক ব্যাখ্যা পাঠকই খুঁজে নেবেন। এ দায়িত্বে আমরা হাত দেয়ার আর হিম্মত করছি না। তবে আয়াত ও হাদিস উল্লেখের পর ফুকাহা মুহাদ্দিসীন কতৃক হাদিসের কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

আয়াত

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (سورة البقرة ٢١٦-٢١٨).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (سورة التوبة ٢٩).

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (سورة الأنفال ٣٩).

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. (سورة البقرة ١٩١-١٩٣).

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. (سورة محمد ٤).

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. (سورة الأنفال ١٢-١٦).

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. (سورة الأنفال ٦٠).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. (سورة التوبة ٢٣-٢٤).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ

أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (سورة الممتحنة ١-٤).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (سورة المائدة ٥١-٥٧).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. (سورة النساء ١٤٤-١٤٥).

হাদীস

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله». (صحيح البخاري).

عُقْبَة بْن عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: "[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ] ﴿الأنفال: ٦٠﴾، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ". (صحيح مسلم).

عن جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. صحيح مسلم. النسخة الهندية ١/ ٨٧

عن يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبى سفيان ذكر حديثا رواه عن النبى - صلى الله عليه وسلم- لم أسمعه روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة ».٢/ ١٤٤،١٤٣

عن جابر بن سمرة رض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ».صحيح مسلم. ١/ ٨٧

عن عقبة بن عامر رض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لايضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك". صحيح مسلم. النسخة الهندية ٢/ ١٤٤

عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله عز وجل هذه الأمة". مسندأحمد بن حنبل. رقم الحديث:١٥١٢٧ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

عن معاوية رض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة"مسند أحمد بن حنبل.٢٨/ ٦٢ رقم الحديث:١٦٨٤٩ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

عن سلمة بن نفيل الكندي قال : "كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال رجل يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح، وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم بوجهه وقال :كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله". سنن النسائي. النسخة الهندية ٢/ ١٠٤

أقوال العلماء في شرح هذه الأحاديث

قال العلامة الخطابي رح المتوفى٣٨٨ ه في كتابه معالم السنن "قلت فيه بيان أن الجهاد لا تنقطع أبدا "معالم السنن. كتاب الجهاد ٢/ ٢٣٦ باب دوام الجهاد . طبعة راغب الطباخ ٣/ ١٠ دار إبن حزم

قال العلامة الطيبي رح المتوفى ٧٤٣ ه في كتابه الكاشف عن حقائق السنن : "((يقاتل عليه)) جملة مستأنفة بيانا للجملة الأولي، وعداه بـ ((على)) لتضمينه معنى يظاهر، أي يظاهرون بالمقاتلة على أعداء الدين، يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة. وما أظن هذه العصابة إلا الفئة المنصورة بالشام والمغرب. ((مح)): ورد في الحديث: ((لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)) قيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك، وفيه معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله تعالى".الكاشف عن حقائق السنن. كتاب الجهاد.ص: ٢٦٣٢ مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة.

وقال أيضا قوله: "((يقاتل آخرهم المسيح الدجال)) أي لا تنقطع تلك الطائفة المنصورة، بل تبقى إلي أن يقاتل آخرهم الدجال. أي إلي قيام الساعة؛ فإن خروج الدجال من أشراط الساعة. ويمكن أن يراد بالآخر عيسى بن مريم ومن تابعه؛ فإنه عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهزودتين، ((فيطلبه)) أي الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله". الكاشف عن حقائق السنن . كتاب الجهاد. ص: ٢٦٤٤ مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة.

(باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود إلخ) قال الحافظ ابن حجر رح المتوفى ٨٥٢ ه في شرح هذا الحديث "وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون وهو مثل الحديث الآخر " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق " الحديث.فتح الباري ٦/ ٥٦ المكتبة السلفية و دار المعرفة بيروت لبنان

قال العلامة عبد الرؤف المناوي رح المتوفى١٠٣١ ه في شرح حديث لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ "(يقاتل عليه) جملة مستأنفة بيانا للجملة الأولى وعداه بعلى لتضمنه معنى يظاهر (عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة) يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة وفيه بشارة بظهور أمر هذه الأمة على سائر الأمم إلى قيام الساعة". فيض القدير. ٥/ ٣٠١ دار المعرفة بيروت لبنان

قال العلامة الملا علي القاري المتوفى١٠١٤ ه في شرح هذا الحديث "لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه بفتح فضم قال قال رسول الله لن يبرح أي لا يزال هذا الدين قائما يقاتل بالتذكير ويجوز تأنيثه أي يجاهد عليه أي على الدين عصابة بكسر أوله أي جماعة من المسلمين والمعنى لا يخلو وجه الأرض من الجهاد إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى حتى تقوم الساعة أي يقرب قيامها". مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. كتاب الجهاد٧/ ٣٣٤ رقم الحديث: ٣٨٠١

قال العلامة أنور شاه الكشميري رح المتوفى ١٣٥٢ ه في شرح حديث البخاري "لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق"

"(ولن تزال ... إلخ) واختلف في تعيين مصداقه، وكلٌّ ادّعى بما بدا له.

قلت: كيف مع أنه منصوصٌ في الحديث، وهم المجاهدون في سبيل الله؟ وقال أيضا بعد سطور ومعنى قوله: (ولن تزال): أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق لا أنهم يكثرون في كل زمان". فيض الباري/١ ١٧٢،١٧١ المكتبة الأشرفية بديوبند.

وقال أيضا: وقد مرَّ في العِلْم: أن الطائفةَ التي تبقى ظاهرةً على الحقِّ إلى يوم القيامة، هي طائفةُ المجاهدين، حتى يَنْزِلَ المسيحُ ابنُ مريم، فيجاهد في سبيلِ الله.فيض الباري/٣ ٤٣٠ المكتبة الأشرفية بديوبند.

أخرج الإمام البخاري في باب" الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" الخ

حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم". ص: ٧٠٥ دار إبن كثير بيروت لبنان. رقم الحديث: ٢٨٥٢

وأخرج أيضا الإمام النسائي في سننه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. سنن النسائي ٢/ ١٠٤ النسخة الهندية

قال العلامة الطيبي رح المتوفى ٧٤٣ ه في كتابه الكاشف عن حقائق السنن : "فيه الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد، وأن الجهاد لا ينقطع أبدا".كتاب الجهاد . باب إعداد آلة الجهاد ٢٦٦٧

قال الحافظ ابن حجر رح المتوفى٨٥٢ ه في شرح هذا الحديث " وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون وهو مثل الحديث الآخر " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق " الحديث ". فتح الباري كتاب الجهاد ٦/ ٥٦ المكتبة السلفية ودار المعرفة بيروت لبنان.

قال العلامة المناوي رح المتوفى ١٠٣١ ه في شرح حديث "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"

" (الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن) أي البركة (إلى يوم القيامة) قال في المطامح : هذا من جملة معجزاته لدلالته على بقاء الجهاد، وإعلاء كلمة الإسلام إلى يوم القيامة".فيض القدير ٣/ ٥١٢دار المعرفة بيروت لبنان.

وقال العلامة الزرقاني رح المتوفى١١٢٢ ه في شرحه"(الخير إلى يوم القيامة) أي إلى قربه، أعلم به أن الجهاد قائم إلى ذلك الوقت.٣/ ٦١ رقم الحديث:١٠٣١

قال إمام العصر العلامة أنور شاه الكشميري رح المتوفى ١٣٥٢ ه:"باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة":وهذا لكونه آلةً للجهاد، فهو إشارةٌ إلى أن الجهادَ ماضٍ إلى يومِ القيامة". فيض الباري ٣/ ٤٣٠ المكتبة الأشرفية بديوبند.

সব শেষে একটি ইস্তিফতা

কিছু দিন আগে আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটি ইস্তিফতা এসেছে। মুস্তাফতী একটি মাদরসার সাথে আছেন। তাঁর ইস্তিফতাটি সংক্ষিপ্ত হলেও আমার কাছে মোটামুটি গোছালো মনে হয়েছে। তাই এ বইয়ের শেষে সে ইস্তিফতাটিও সংযোগ করে দেয়া হল। যাতে ধারক বাহক ব্যক্তিবর্গ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারেন। আমরাও এর একটি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি। কিন্তু সর্বাবস্থায় মূল দায়িত্ব দারুল ইফতার যিম্মাদারদের উপর।

প্রশ্ন: বর্তমান বিশ্বে জিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন রকমের; বরং বিপরীত রকমের মতামত পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ বলছেন, জিহাদ ফরয নয়। কেউ বলছেন, ফরয; তবে ফরযে কেফায়া। কেউ বলছেন, শর্তসাপেক্ষে তা ফরয, তবে শর্তগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলছেন, শর্তগুলো পাওয়া যাচ্ছে এবং সে হিসাবে তাদের কেউ কেউ জিহাদ করে যাচ্ছেন। আবার কেউ বলছেন, জিহাদের নামে পৃথিবীতে যা চলছে সব সন্ত্রাস, ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, জিহাদ মানসূখ হুকুম না মুহকাম হুকুম?। যদি মানসূখ হয় তাহলে কোন দলিলে, আর যদি মুহকাম হয় তাহলে তার আমলী রূপরেখা কি? উসূলে শরীয়তের আলোকে এমন হওয়া কি সম্ভব যে, একটি মুহকাম হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্র পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না? আর যদি শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীর কোথাও এর সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না? যদি হয়ে থাকে তা হলে তারা কারা এবং তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব কি না? আর যদি বাস্তবায়ন না হয়ে থাকে তাহলে তা বাস্তবায়নে আমাদের কোনো দায়িত্ব আছে কি না?

সম্প্রতিকালে একটি ফতোয়ায় বিশ্বের সকল জিহাদী কাফেলাকে সন্ত্রাসী ও ইসলামবিরোধী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচ্য ফতোয়ার আলোকে আমরা কি এ কথা মনে করব যে, পৃথিবীতে ইসলামী জিহাদের কোন অস্তিত্ব নেই, ফলে পৃথিবীর সকল মুসলমান একটি ফরয দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার গুনাহে লিপ্ত রয়েছে? নাকি মনে করব, ফতোয়াদাতাগণ ইসলামী জিহাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ বা কুফরের গুনাহে পতিত হয়েছেন? না এর অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে? প্রসঙ্গত, ইহুদী-খৃস্টান গোষ্ঠী বিশ্বের যে কাফেলাগুলোকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়ে চলেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, আলোচ্য ফতোয়ায় তাদেরকেই সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি?

উল্লেখ্য, বিষয়টি নিয়ে এত দিন কিছু না বলে থাকার কোন ওযর থাকলেও একটি বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিকর ফতোয়া এসে যাওয়ার পর সম্ভবত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের যিম্মাদার হিসাবে এবিষয়ে উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে ইজামের সুচিন্তিত মতামত জনসম্মুখে আসা সময়ের দাবী। আমরা আপনাদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

আল্লাহ আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বিনীত

হাফেয আতাউল্লাহ বেলালী

মাদরাসা বাইতুল কুরআন

হাতিখোলা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

এ ফাতওয়ায় যে কাজগুলো করা হয়েছে তা কয়েক ভাগে বিভক্ত। এর একটি সারসংক্ষেপ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

এক. এ ফাতওয়ার কুফরী বিষয়সমূহ

১. বর্তমান বিশ্বে চলমান জিহাদের সকল কার্যক্রমকে অস্বীকার করার মাধ্যমে জিহাদের মুত্তাফাক আলইহি-সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২. ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দাওয়াত ও মুহাব্বত ছাড়া নবী-রাসূলগণ অন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে, যার অনিবার্য ফলাফল হল, দাওয়াত ও মুহাব্বতের পরবর্তী জিহাদ, কিতাল ও স্বশস্ত্র যুদ্ধ এ কাজগুলোকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা আখ্যা দেয়া।

৩. ইসলামের চলমান দুশমন কাফেরদের সঙ্গে ভালোবাসা, সৌহার্দ্যকে অপরিহার্য বলা হয়েছে।

৪. বর্তমান বিশ্বে ইহুদী-খ্রিস্টান ও নাস্তিক-মুরতাদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং দিচ্ছে তাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং তাদেরকে জাহান্নামী বলা হয়েছে।

৫. যারা আল্লাহর আইনকে অকার্যকর ঘোষণা দিয়ে জাহেলী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াকে অবৈধ-হারাম বলা হয়েছে।

৬. অতীত কালের কাফেরদের কুফর, শিরক ও ফাসাদের নিন্দায় অবতীর্ণ আয়াতগুলোকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৭. জিহাদ ফরয হওয়ার আগে অবতীর্ণ মুত্তাফাক আলাইহি মানসূখ (সর্বস্বীকৃত রহিত) আয়াতগুলোকে জিহাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
৮. ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিশ্বকে শান্তির পৃথিবী এবং তার বিপরীতে মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডকে অশান্তি ও বিশৃংখলা বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।
৯. কাফের মুরতাদদেরকে মাহামান্য বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
১০. বিশ্বের আইম্মাতুল কুফর-শীর্ষ পর্যায়ের কাফেরদের কাছ থেকে ফাতওয়ার স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আদায় করাও হয়েছে।
১১. জিহাদের বিকৃত সংজ্ঞা প্রদান।
১২. নববী জীবনের জিহাদ ফরয হওয়ার আগের মানসূখ-রহিত পর্বগুলো দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে দলিল দেয়া হয়েছে।
১৩. বিশ্বের সকল জিহাদী কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাস, বর্বরতা, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দুই. এ ফাতওয়ার প্রতারণাসমূহ

১. যে দেশে মহিলাদের জন্য ফাতওয়ার অনুশীলনের কোন ব্যবস্থা নেই সে দেশে দশ হাজার মহিলা মুফতির স্বাক্ষর গ্রহণ।
২. কাফিয়া তথা নিম্ন মাধ্যমিকের ছাত্ররাও স্বাক্ষর করতে পারবে -কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এমন ঘোষণার পরও এক লাখ অভিজ্ঞ মুফতীর স্বাক্ষর গ্রহণের দাবি।
৩. অস্পষ্ট প্রশ্ন দিয়ে অন্ধকার গলি-পথ দিয়ে মতলব উদ্ধার করে দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ফাতওয়া গ্রহণের দাবি।
৪. কারা স্বাক্ষর করছে আর কারা করছে না তা চিহ্নিত করার প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে এক লক্ষ স্বাক্ষর গ্রহণের দাবি।
৫. একটি প্রশ্নের উপর স্বাক্ষর নিয়ে দশটি প্রশ্নের উত্তরের উপর স্বাক্ষর প্রচার করা।
৬. একটি ঘটনাকে পুঁজি করে সকল জিহাদী কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে স্বাক্ষর গ্রহণ।
৭. স্বাক্ষরকারীদের পরিচয় পাওয়ার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

তিন. এ ফাতওয়া দাজ্জাল চক্রের পক্ষ থেকে হওয়ার আলামতসমূহ

১. ভ্যাটিকান সিটির পোপ কর্তৃক এ ফাতওয়ার প্রতি সমর্থন। দেখুন, মাসিক পাথেয় পৃঃ ১৬, সেপ্টম্বর ২০১৬ খৃ.

২. এ ফাতওয়া উপলক্ষে দালাইলামা ও ভ্যাটিকান সিটির পোপকে দাওয়াত করা বিষয়ে ফাতওয়া কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা। মাসিক পাথেয় পৃ:১৬, সেপ্টম্বর ২০১৬ খৃ.

৩. জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে এর পক্ষে সমর্থন আদায়ের আশাবাদ। মাসিক পাথেয় পৃঃ ১৭, সেপ্টম্বর ২০১৬ খৃ.

৪. আমেরিকান কংগ্রেস ও হাউস অব কমেন্সের মাধ্যমে এ ফাতওয়া সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে বরেক্ষম হয়েছে বলে স্বীকারোক্তি। মাসিক পাথেয় পৃঃ ৩৬, আগস্ট ২০১৬ খৃ.

৫. এ ফাতওয়া আয়োজনের প্রথম বৈঠক যেখানে এর সিদ্ধান্ত হয়েছে সে বৈঠক ছিল কুফরী আইনের প্রধান প্রহরী ও সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে। দেখুন পৃঃ ৭২

৬. এ ফাতওয়ার প্রথম হাদিয়া তুলে দেয়া হয়েছে কুফরী আইনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকের হাতে। দেখুন, মাসিক পাথেয় পৃঃ ২৭, সেপ্টম্বর ২০১৬ খৃ.

৭. এ ফাতওয়ার স্বতস্ফূর্ত প্রচার করেছে বিশ্বের সেরা সেরা কুফরী গণমাধ্যমগুলো। দেখুন পৃঃ ১০৬

৮. কোন কোন তথ্য অনুযায়ী এর প্রথম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে রাশিয়ায় যেখানে 'একলক্ষ সাহেব' উপস্থিত ছিলেন। দেখুন পৃঃ ৮৩

৯. একলক্ষ সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ছেলে মাকতূম লন্ডনে কুফরী আইনের উপর ব্যারিস্টার করেছে, আমেরিকার বিশ্বের সেরা প্রাচ্যবিদদের একজন রেন্ড কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর ব্রুস হোফম্যানের (মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর ক্ষেত্রে যার বিশেষ অবদান রয়েছে) অধীনে কাউন্টার টেররিজমের (সন্ত্রাস প্রতিরোধ) উপর বিশেষ কোর্স করেছে। মাসিক পাথেয় পৃঃ ১৮, সেপ্টম্বর ২০১৬ খৃ.

১০. এ ফাতওয়া ছাপানোর ক্ষেত্রে অর্থায়ন করেছে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ও এম পি।

১১. স্বাক্ষর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার দলীয় কর্মীরা সহযোগিতা করেছে।

চার. এ ফাতওয়ায় কুরআন হাদিসের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগসমূহের কয়েকটি

১. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً এর অনুবাদে 'শান্তির পথ' শব্দটি বাড়িয়ে স্বশস্ত্র জিহাদকে অশান্তির পথ ও আতঙ্কের পথ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই বিপরীত তাফসীরবিদগণ এখানে আত্মসমর্পণের পথ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতে উল্লিখিত 'দারুসসালাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাত। এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, স্বশস্ত্র জিহাদ শান্তির পৃথিবীর বিপরীত একটি বিষয়।

৩. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ আয়াতে 'দারুসসালাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাত। এখানে স্বশস্ত্র জঙ্গের ও লড়াইয়ের বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. 'একটি হাদীসে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেম ও ভালোবাসাপরায়ণতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে ব্যক্ত করেছেন।' এ কথা বলে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, যে হাদীসে শুধু ভালোবাসার কথা বলা হয়নি, আল্লাহর জন্য ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহর জন্য ঘৃণার কথাও বলা হয়েছে।

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ

বাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে باب الحب في الله আর আমরা সুনানে আবু দাউদে বাবের নাম পেয়েছি بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

৫. আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে বাধাদানকারীদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

وَلَاتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে মুসলমানদের একটি কাফেলার ক্ষেত্রে, যারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য লড়ে যাচ্ছে।

৬. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده হাদীসটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে যারা স্বশস্ত্র জিহাদে রত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

৭. যারা স্বশস্ত্র জিহাদে রত রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি وَمَاعَلَيْنَاإِلَّاالْبَلَاغُ الْمُبِينُ প্রয়োগ করা হয়েছে।

৮. যারা স্বশস্ত্র জিহাদে রত রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) প্রয়োগ করা হয়েছে।

৯. যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّينِ প্রয়োগ করা হয়েছে।

১০. হুকুম মানসূখ-রহিত এ আয়াতটিকে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) মুহকাম জিহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে।

১১.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا» فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: «أين السائل؟» قال: أنا -قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك- قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. (**صحيح البخاري**، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها).

হাদীসটি উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। কারণ অস্ত্রের ব্যবহার একটি খারাপ বিষয়। অথচ এ হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, ভালো মন্দকে নিয়ে আসেনা; বরং ভালো ভালোকেই নিয়ে আসে। মন্দের আবির্ভাব ঘটে বহিরাগত কারণে।

১২. জিহাদ হলো নিজের এবং পরিবেশ ও সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সর্বকালীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। -এ সংজ্ঞার মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ফিকহে ইসলামীর জিহাদকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৩. ইবনে ওমর রা. মুসলমানদের পরস্পরের যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করা সম্পর্কিত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর হাদীসকে প্রয়োগ করা হয়েছে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে তাদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে।

১৫. একটি দুর্বল (যা কারো কারো মতে জাল) হাদীসকে পুঁজি করে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৬. জিহাদের ওয়াজিব হুকুম থাকা সত্ত্বেও বারবার জিহাদের অনুমোদন আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাও আবার এমন কিছু শর্তে যা না কুরআন হাদিসে এসেছে, না ফিকহ হাদিসের কোন কিতাবে এসেছে এবং যা কখনো পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

১৭.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

আয়াত দ্বারা সেসব ইবাদতখানাকে বোঝানো হয়েছে যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর যিকর হয়, আয়াতে যার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আয়াতটিকে ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর দুশমনরা দুশমনির জন্য যেসব ইবাদতখানা তৈরি করে সে ক্ষেত্রে।

১৮. আয়াতের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি দুই জায়গায় এসেছে। এক জায়গায় পূর্ণাঙ্গ আয়াত

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ এই।

অপর জায়গায় এই–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَا

প্রথম আয়াতে পুরা আয়াত উল্লেখ করা হয়নি জিহাদ করার ভয়ে। দ্বিতীয় আয়াত পুরা উল্লেখ করা হয়নি বৈধ ও ওয়াজিবকে হারাম বলার অপরাধ ধরা পড়ার ভয়ে।

১৯. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ আয়াতটি দ্বারা কারূনকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ ফতোয়ায় তা প্রয়োগ করা হয়েছে ইসলামের পক্ষে যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে।

২০. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে মুমিনদের ক্ষেত্রে। কুরআনে ফাসাদ বলা হয়েছে কুফর শিরককে, ফতোয়ায় ফাসাদ বলা হচ্ছে কুফর শিরকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাকে।

২১. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ফেরাউনের বাহিনীর ব্যাপারে। আর এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে মুমিনদের ক্ষেত্রে। কুরআনে ফাসাদ বলা হয়েছে কুফর শিরককে, ফতোয়ায় ফাসাদ বলা হচ্ছে কুফর শিরকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাকে।

২২.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

আয়াতটি ইসতেশহাদি হামলার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে যার সঙ্গে আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

২৩. সাহাল ইবনে সাদ সায়েদী রা. এর হাদীসটি আত্মহত্যা সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের উপর আত্মত্যাগমূলক হামলার ক্ষেত্রে।

২৪. আবু হুরায়রা রা. এর হাদীসটি আত্মহত্যা সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের উপর আত্মত্যাগমূলক হামলার ক্ষেত্রে।

২৫. আয়েশা রা. এর হাদীসটি হুদূদ-কিসাস তথা দন্ডবিধি সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে হামলা করার ক্ষেত্রে।

২৬. রাদ্দুল মুহতারের ইবারতটি দন্ডবিধি সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে হামলা করার ক্ষেত্রে।

২৭. ওমর রা. এর কথাটি দন্ডবিধি সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে হামলা করার ক্ষেত্রে।

২৮. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا আয়াতটি নিরপরাধ মুসলামানকে হত্যা করার ব্যাপারে। প্রয়োগ করা হয়েছে শিরক কুফরে লিপ্ত কাফের মুশরিকদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে।

২৯. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا আয়াতটি হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে হত্যা করা হারাম করা হয়েছে। প্রয়োগ করা হয়েছে ঐ ব্যাক্তির ব্যাপারে যাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

৩০. ফিকহের কিতাবাদি থেকে যিম্মীর মাসআলা সম্পর্কিত ইবারতসমূহকে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে, যাদের অধীনে মুসলমানরা বসবাস করছে অথবা যারা কমপক্ষে মুসলিমদের সম অধিকার নিয়ে বসবাস করছে। এমন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে, যারা নিজেদেরকে কখনো যিম্মী বলতে রাজি নয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে তাদেরকে যিম্মী বলা হয়নি। এমন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে যারা এ দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, আইন প্রণেতা, আইন উপদেষ্টা ও সংবিধান রচয়িতা হতে পারে।

৩১. অন্যায় প্রতিরোধ বিষয়ক হাদীসকে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার অন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩২. হাদীসের এমন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যার আলোকে শাসকবর্গ থাকবে সব সময় এক নম্বর ঈমানদার, আর ওলামায়ে কেরাম থাকবেন সব সময় দুই নম্বর ঈমানদার, আর সাধারণ মানুষ আজীবন দুর্বল ঈমানদার। সাধারণ মানুষ ও ওলামায়ে কেরাম কখনো এক নম্বর ঈমানদার হতে পারবেনা। ওলামায়ে কেরাম পূর্ণ ঈমানদার হতে হলে তারা অবশ্যই শাসক হতে হবে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

৩৩. কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের শত শত আয়াতকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলা হয়েছে ইবনে আরাবীর এক বক্তব্য দিয়ে। এরপরও তা তাহরীফ হয়নি।

৩৪. তাহরীফ ও বিকৃতির সংজ্ঞায় ভয়ংকর রকমের তাহরীফ ও বিকৃতি করা হয়েছে।

এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষরকারীদের হুকুম

এ ফাতওয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং এ৫ ত স্বাক্ষরকারীরা কয়েক ভাগে বিভক্ত। তাই তাদের ব্যাপারে শরয়ী বিধানও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

এক. কুফরী কাজগুলো যারা জেনে বুঝে করেছে এবং এ কুফরীগুলো ছড়ানোর জন্যই করেছে এবং এখনো তা করে চলেছে তারা মুরতাদ। মুরতাদ হওয়ার পরও যদি তারা নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে এবং ইসলামের খায়েরখাহ হিসাবে দাবি করে তাহলে তারা যিন্দিক।

দুই. কুফরী কাজগুলোকে যারা কুফরী মনে করেনি, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেনি তাদের সামনে বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি তারা তাদের এ মত থেকে ফিরে না আসে তাহলে তারাও মুরতাদ। মুরতাদ হওয়ার পরও যদি তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং প্রচার করে তাহলে তারা যিন্দিক।

তিন. যারা প্রতারিত হয়েছে এবং ফাতওয়াতে কি আছে তা না জেনেই স্বাক্ষর করে দিয়েছে, তারা একটি জঘন্য রকমের কবীরা গুনাহ করেছে। একজন মুফতীর জন্য কখনো ফাতওয়ার বিষয়বস্তু শত ভাগ না বুঝে স্বাক্ষর করার অনুমতি নেই।

চার. যারা ফাতওয়া বিস্তারিত দেখে স্বাক্ষর করলেও ফাতওয়ার হাকিকত বুঝতে পারত না, তারাও এ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে জঘন্য রকমের একটি কবীরা গুনাহ করেছে। ফাতওয়া বোঝার যোগ্যতা যার মধ্যে নেই তার জন্য ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করা কবীরা গুনাহ। কারণ ফাতওয়ায় স্বাক্ষরকারীও ফাতওয়াদাতাদের একজন।

পাঁচ. যারা বড় কারো অনুসরণে স্বাক্ষর করেছে, তারা একটি বড় ধরনের কবীরা গুনাহ করেছে। কারণ, কোন ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করার মত বিষয় নয়। ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করার অর্থ হচ্ছে, এ ফাতওয়া সঠিক হওয়ার পক্ষে স্বাক্ষরকারীও একজন সাক্ষি। আর সাক্ষ্য কখনো আরেক জনের অনুসরণে হয় না।

ছয়. প্রাপ্ত বয়স্ক যে সকল তালিবুল ইলম উস্তাযের আদেশ পালনার্থে স্বাক্ষর করেছে, তারাও একটি কবীরা গুনাহ করেছে। **কারণ তারা উস্তাযের আদব রক্ষা করতে গিয়ে শরীয়তের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে।**

সাত. যে সকল ইমাম মুয়াযযিন কমিটির সদস্যদের ভয়ে স্বাক্ষর করেছে তারাও একটি জঘন্য রকমের কবীরা গুনাহ করেছে।

আট. অপ্রাপ্ত বয়স্ক যে সকল তালিবুল ইলম উস্তাযের ভয়ে স্বাক্ষর করেছে তাদের কোন গুনাহ হবে না। তবে এ গুনাহের দায়দায়িত্ব বর্তাবে আদেশদাতার উপর।

স্বাক্ষরকারীদের উল্লিখিত আট প্রকারের মধ্য থেকে প্রথম দুই প্রকারের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে শরয়ী আদালতের কাছে। শরয়ী আদালতে তাদের বিধান হচ্ছে প্রকাশ্যে শিরোচ্ছেদ। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো মাসআলাগুলো হচ্ছে, যাদের স্ত্রীরা তাদের সঙ্গে মুরতাদ হয়ে যায়নি তাদের এ স্ত্রীর সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সকল সম্পর্ক অবৈধ। খালিস তওবা করে শুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা মুরতাদ। খালিস তওবা করার পর সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে নতুনভাবে বিবাহে আবদ্ধ হওয়া জরুরী। এ সকল কুফরী থেকে তওবা করে খালিস ঈমান গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত মুসলমানরা তাকে একজন মুরতাদ হিসাবে বিবেচনা করবে।

তিন থেকে সাত পর্যন্ত স্বাক্ষরকারীদের যে প্রকারগুলো রয়েছে তারা যে ওযরের কারণে কুফরী বিষয়গুলোর উপর স্বাক্ষর করেছে সে ওযর দূর হওয়ার সাথে সাথে এ স্বাক্ষর ও সমর্থন তুলে নেয়া জরুরী। এবং এর এলান জরুরী। যাতে একজন মুফতী স্বাক্ষরকারীদের ব্যাপারে ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে আলাদা করতে পারেন। আর এ অলাদা করার ব্যবস্থা স্বাক্ষরকারীকেই করতে হবে। তাই এ প্রকারের স্বাক্ষরকারীদের স্বাক্ষর ও সমর্থন তুলে নেয়ার এলান কমপক্ষে মুফতীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।

নচেৎ মুফতী যদি স্বাক্ষরের তালিকার ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়ে দেন তাহলে এ জন্য মুফতীকে দায়ী করা যাবে না।

তবে এখানে দু'টি কথা আলাদা করে বুঝে নিতে হবে। কেউ যদি বাস্তবেই খালিসভাবে তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সে অবশ্যই আল্লার দরবারে মাফ পেয়ে যাবে এবং একজন মুমিন হিসাবেই পরিগণিত হবে। চাই তার এ তাওবার কথা পৃথিবীর কেউ জানুক বা না জানুক।

কিন্তু মুফতী ফাতওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তার বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনা করেই ফাতওয়া দেবে। বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী ফাতওয়ার মূলনীতির আলোকে ফাতওয়া দেবে। এ ক্ষেত্রে এমন হতেই পারে যে একজন মানুষ আল্লাহর দরবারে মুমিন, কিন্তু মুফতীর কাছে সে কাফের। এমন হওয়ার ক্ষেত্রে কখনো বলা যাবে না যে, মুফতী ফাতওয়া দেয়ার কারণে ঐ মুমিন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে, আবার এ কথাও বলা যাবে না যে, যেহেতু সে আল্লাহর কাছে মুমিন হিসাবে গৃহীত হয়েছে অতএব মুফতীর ফাতওয়া ভুল। কারণ মুফতীর ফাতওয়ার দ্বারাও কেউ কাফের হয় না, আবার বাহ্যিকভাবে কাফের হলেও মুফতী তাকে কাফের না বলার কোন সুযোগ নেই।

তবে এ প্রকারগুলোর ক্ষেত্রে সতর্কতার দাবি হচ্ছে, ওযর কেটে যাওয়ার সাথে সাথে তাজদীদে ঈমান করা এবং সতর্কতামূলক বিবাহও নতুন করে করে নেয়া। আর ওযরগুলো নিজের কাছে ওযর মনে হলেই চলবে না। আমরা সবাই কম-বেশি ফিকহের কিতাবাদি পড়েছি। শরীয়ত কোন ওযরটিকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করেছে তাও আমরা দেখেছি। তাই কাল্পনিক ওযর দাঁড় করিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে গেলে মূলত আমরা ধরা পড়ে যাব। এ ধরা আল্লাহর কাছেই পড়ব। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

অষ্টম প্রকারের স্বাক্ষরকারীদের হুকুম হচ্ছে তারা এখনই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবে এবং এ স্বাক্ষর ও সমর্থন তুলে নেয়ার এলান করবে। তবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এ বিষয়ে এক মুহূর্ত দ্বিধা করার কোন সুযোগ নেই। ফিকহের কিতাবাদিতে অজ্ঞতার ওজরকে এভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।